ফারিস
সংবিৎ
জাকারিয়া মাসুদ
বস্তুবাদ
যুক্তিবাদ
নিরীশ্বরবাদ
ফেমিনিজম
মানবধর্ম
পুঁজিবাদ
সাম্যবাদ

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ফারিস সিরিজ – ১

সংবিৎ

জাকারিয়া মাসুদ

শার'ঈ সম্পাদনা
শাইখ হারুন ইযহার

সম্পাদনা
আশিক আরমান নিলয়

সমর্পণ প্রকাশন

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ

"

অবশ্যই এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার (বোধশক্তিসম্পন্ন) অন্তর রয়েছে। কিংবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে।

"

[আল-কোরআন, সূরা কাফ, ৫০ : ৩৭ আয়াত]

দ্বিতীয় সংস্করণের উপক্রমণিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে। যিনি সত্যকে বিজয় দানের ওয়াদা করেছেন, যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে। আসলে মিথ্যে যতই বিশাল হোক না কেন, তার স্থিতি নেই। মিথ্যে তো ভাসমান ফেনার মতো। 'অতঃপর ফেনা তো শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।'[১]

সংবিৎ বইটি অবিশ্বাসের মেরুদণ্ডে কিছুটা হলেও আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। স্বল্প সময়েই বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। যারা বইটি পড়েছেন, রিভিউ লিখেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন; সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বানান, ফন্ট, বাক্য ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্যাগুলো ছিল, আমাদের সাধ্যমত সেগুলো সংশোধন করে নিয়েছি। সীমিত সময় এবং তার চেয়েও সীমিত যোগ্যতা নিয়ে লিখা বইতে ভুলত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। সকল ভুলত্রুটির জন্যে আমরা মহামহিম আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তীব্র ইচ্ছে ছিল আমার কওমের জন্যে কিছু করার। অবিশ্বাসের ভাইরাস থেকে কওমকে সচেতন করার। সে ইচ্ছে থেকেই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা—*সংবিৎ*। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন দয়া করে এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। যেদিন ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো কাজে আসবে না, সেদিন যেন একে আমার নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন। আমীন।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সত্যের বার্তাবাহক নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর সাহাবা, পরিবার-পরিজন, ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা সত্যের অনুসরণ করবেন, তাঁদের সকলের প্রতি।

দো'আর মুহতাজ

জাকারিয়া মাসুদ

১৫ জুমাদিউস সানি, ১৪৩৯ হিজরি।
jakariamasud2016@gmail.com

শার‘ঈ সম্পাদকের অভিমত

বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সংস্কৃতির মুখোশে অন্তঃসারশূন্য কিছু মিথকে মুক্তমনস্কতার ট্যাগ লাগিয়ে একটা বুদ্ধিবৃত্তিক অস্থিরতার পাঁয়তারা শুরু করেছিল সংশয়বাদীরা। এ প্রবণতা চলতি দশকে আমাদের কিছু শিক্ষালয়ে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। সংশয়বাদ, নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি উপসর্গ নতুন কোনো বিষয় নয়। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় যা নতুন তা হলো, ‘ইসলাম বিদ্বেষ’-কে ‘মুক্ত-চেতনা’র মোড়কে উপস্থাপনের ভণ্ডামি প্রদর্শন।

লড়াইয়ে জেতার কৌশল হলো আত্মরক্ষার স্থলে পাল্টা প্রশ্ন উৎক্ষেপণ। এ কাউন্টার মুক্তমনস্কতায় যারা প্রজ্ঞাপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে লেখক অন্যতম। বইটিতে লেখক নাস্তিক্যবাদী সংশয়বাদের (Skepticism) জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হানার চেষ্টা করেছেন। বইটি আমি শার‘ঈ সম্পাদনা করেছি। এখানে বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপক বিশিষ্ট দার্শনিক মরহুম ড. দেওয়ান আজরাফের বইসমূহের শার‘ঈ সম্পাদনা করতেন ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা মহিউদ্দীন খান ﷺ। শার‘ঈ সম্পাদনা একটি মৌলিক কাজ এবং তার নজিরগুলো আমাদের আগের প্রজন্মের পূর্বসূরিদের মধ্যেও লক্ষণীয়।

এ বইটি আস্তিকদের জন্য একটি চমৎকার উপহার। আরিফ আজাদ, শামসুল আরেফিন এবং অন্যান্যদের ধারাবাহিকতায় জাকারিয়া মাসুদের এ প্রয়াস আপনার যুক্তির ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করবে। আপনার চিন্তার দিগন্তকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করবে, যেখানে সংশয়বাদের আঁধার আর উঁকি মারবে না।

নাস্তিকরা আস্তিকদের বিরুদ্ধে চাপাতির অভিযোগ এনেছিল। *সংবিৎ* চাপাতি নয়, কলম। কলমের ব্যাপারে আল্লাহর কসম প্রমাণ করে—এটা আস্তিকতার এমন এক হাতিয়ার, যে হাতিয়ারকে পরাজিত করা যায় না। মজার ব্যাপার হলো, যেখানে ফির‘আউন সেখানেই মূসা ﷺ! মানে নাস্তিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রবল বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক প্রতিরোধটা খাড়া করছেন মাদ্রাসার ছাত্ররা নন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমানদার তরুণরা।

বইটি কিনুন এবং আপনার প্রগতিশীল আপনজনকে উপহার দিন। এ বইগুলো আসলে কাউন্টার Enlightenment, যা চিন্তার প্রচলিত ও ভ্রান্ত Value গুলোকে চ্যালেঞ্জ করে। যুক্তি আর বিজ্ঞানের ফাঁকা বুলি ছুঁড়ে, ধর্মকে সীমাবদ্ধতা আর পরাধীনতার সমার্থক করা হয়েছিল। *সংবিৎ*-এর কাউন্টার অ্যাটাক একই অস্ত্র নিয়ে গর্জে উঠেছে। দেখা যাক ধর্মবিদ্বেষীরা এবার কতটা লিবারেল আর ফ্রিডমপন্থী!

শাইখ হারুন ইযহার

মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়া

লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

বিষয়সূচী

অবতরণিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أمّا بعد:

একটা সময় জাহেলিয়াতের মধ্যে ছিলাম। আল্লাহ ﷻ সেখান থেকে তুলে এনেছেন। তাঁর দ্বীনের বুঝ দান করেছেন। সত্যকে চিনতে শিখিয়েছেন। সত্যকে যখন চিনতে শিখলাম, তখন তা প্রচার করার তীব্র আগ্রহ জন্মাল। এ আগ্রহ থেকেই দাওয়ার কাজ শুরু হলো। আল্লাহ ﷻ বারাকাহ দিলেন। অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ এক দমকা হাওয়া এসে সবকিছু তছনছ করে দিলো। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অনেক দিন লেগে গেল। বুঝতে পারছিলাম না কী করব, কীভাবে আবার নতুন করে শুরু করব?

একবার এক বন্ধুর সাথে বাসে করে কোথাও যাচ্ছিলাম। বন্ধু আমার আইটির ছাত্র, ফেসবুক চালায় অনেক দিন হলো। আমি তখনো ফেসবুক এতটা বুঝি না। কোনও ফেসবুক আইডিও ছিল না। বন্ধুটি জোর করেই একটি আইডি খুলে দিলো, বাসের মধ্যেই। এখান থেকেই ফেসবুক-জীবন শুরু। অবশ্যি তখনো ফেসবুকের প্রতি এতটা আকৃষ্ট ছিলাম না। হঠাৎ হঠাৎ ফেসবুকে ঢুকতাম।

দেখতে দেখতে একটি বছর পেরিয়ে গেল। ফেসবুকে অনেক বন্ধু হলো। একদিন একজনের লেখায় চোখ আটকে গেল। মনোযোগ দিয়ে লেখাটি পড়লাম। লেখাটি অবশ্যি অনেক ছোট ছিল, কিন্তু তথ্য ছিল অনেক বেশি। এরপর থেকে ভালো লেখকের সন্ধানে লেগে গেলাম। মহামহিম আল্লাহর অনুগ্রহে, ফেসবুকের ভালো লেখকদের সাথে পরিচয় হলো। তাঁদের লেখাগুলো পড়ে অভিভূত হতে লাগলাম। নিজের মধ্যেও লেখার আগ্রহ জন্মাল। টুকটাক লেখালিখি শুরু হলো।

মূলধন নিতান্তই সামান্য বলে বেশি দূর আগানো গেল না। যে জানেই না, সে লিখবে কী? তাই লেখালিখি ছেড়ে পড়াশোনার দিকে মনোযোগ দিলাম। আলিমদের থেকে শুরু করে সেক্যুলারদের লেখনী, কোনওটিই বাদ গেল না। পড়তে পড়তে এক নিরীশ্বরবাদী লেখকের বই হাতে এল। জনৈক সহপাঠী বইটা আমায় পড়তে দিয়েছিল। লেখকের অনেক প্রশংসা শুনেছিলাম তার মুখে। বইটি পড়তে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খেলাম। ক্ষুদ্র জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও লেখকের মিথ্যাচার আমার সামনে স্পষ্ট হলো।

পণ করলাম, নিরীশ্বরবাদীদের নিয়ে কিছু লিখব। এক ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করলাম। তিনি উৎসাহ দিলেন। মহামহিম আল্লাহর নাম নিয়ে লেখা শুরু করলাম। প্রতিপালকের কাছে সাহায্য চাইলাম। তিনি তাঁর গোলামকে সাহায্য করলেন। শুরু হলো ফেসবুকে লেখালিখি। দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহে লেখাগুলো অনেকের কাছে পৌঁছে গেল। কাঁচা হাতের লেখাকেও তাঁরা পছন্দ করলেন।

এরই মধ্যে আরববিশ্বের একজন বিখ্যাত লেখকের অনূদিত বই হাতে এল। অবশ্যি তাঁর কিছু লেখা আগেও পড়েছিলাম। কিন্তু এ বইটা ছিল ব্যতিক্রম—গল্পাকারে লেখা। লিখার ধরনটা বেশ ভালো লাগল। গল্পের মাধ্যমেও যে বিষয়বস্তু খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা যায়, তা বোধগম্য হলো। আমিও গল্পাকারে লেখার মনস্থ করলাম। গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম নিয়ে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলাম। কেন জানি 'ফারিস' নামটাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আসলে নামটার প্রতি আমি ভীষণ দুর্বল। অবশ্যি তারও একটা কারণ আছে। 'ফারিস' শব্দের অর্থ 'অশ্বারোহী যোদ্ধা'। সাহাবাদের ব্যাপারে প্রায়ই বলা হয়, তাঁরা ছিলেন দিনের বেলার 'যোদ্ধা', আর রাতের বেলার 'রাহিব' (সন্ন্যাসী)। তাঁদের দিন কাটতো জিহাদে, রাত কাটতো তাহাজ্জুদে। তাই 'ফারিস' নামটাই নির্ধারণ করলাম।

লিখতে গিয়ে কিছু কথা মনে হলো। নিরীশ্বরবাদীরা প্রশ্ন করে যাবে, আমরা কেবল উত্তর দিয়ে যাব, তা তো হয় না। ক্রমাগত রক্ষণাত্মক মনোভাব হৃদয়ের ওপর প্রভাব ফেলে। ঈমানী চেতনাকে ব্যাহত করে। পরাজিত মানসিকতার সৃষ্টি করে। প্রতিপক্ষের সাজানো প্রশ্নে নিজের ধর্মকে পাশ করানোর চেষ্টা—বোকামো ছাড়া কিছুই নয়। তাই চিন্তা করলাম, নিরীশ্বরবাদীদের অসার দাবিগুলোরও ব্যবচ্ছেদ করা উচিত। তাদের বিকৃত চেতনাগুলো স্পষ্ট করা উচিত। তাদের দ্বিমুখিতা ফুটিয়ে তোলা উচিত। পর্দার আড়ালের কালো চেহারাটা উন্মোচন করা উচিত। পাশাপাশি খ্রিষ্টান মিশনারিদের কথাও মাথায় এল। বঙ্গীয় নিরীশ্বরবাদীদের বেশির ভাগ প্রশ্নই মিশনারিদের থেকে ধার করা। তাই বইটাতে নাস্তিক ও মিশনারি দুদিকেই নজর দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

অনেক ভাষাতেই বানান-সমস্যা আছে। তবে ইংরেজি ভাষার বানানের সংস্কারপ্রক্রিয়া একটা জায়গায় স্থির হয়েছে। কিন্তু বাংলা বানানরীতির ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। ভাষাবিদদের হাতে বাংলা ভাষা প্রতিনিয়ত নাস্তানাবুদ হয়ে চলছে। আজ তাঁরা এক কথা বলছেন, তো কাল তার বিপরীত। ছোটবেলা থেকে যে বানানগুলো দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়েছি, আজ সেগুলো বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি 'বাংলা একাডেমি', তার 'একাডেমি' বানানটাও এই সেদিন পরিবর্তন করেছে। সে যাই হোক, বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করেছি। কিন্তু বিদেশি বানানে সেটা করতে পারিনি। বিদেশি শব্দে সব সময় ই-কারের ব্যবহার প্র্যাক্টিক্যাল না। তা ছাড়া ই-কার কিংবা ঈ-কারের পার্থক্যের জন্যে শব্দের অর্থ পাল্টে যায়। আরবি ও ইংরেজি দু-ভাষাতেই। তাই বিদেশি বানানে একাডেমির নিয়ম অনুসৃত হয়নি।

আমার লেখা যে বই আকারে প্রকাশ হবে, এ কথা কোনও দিন ভাবিনি। মহামহিম

আল্লাহর দয়ায় তা সম্ভব হয়েছে। তবে দু-কলম লিখে কারও দাঁত ভেঙে ফেলেছি কিংবা অনেক কিছু করে ফেলেছি, এমনটা কখনোই মনে করিনি। সত্যের আলো থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, তা-ই ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা, ব্যক্তিগত পড়াশোনা, আর লেখালেখি; এসবের সমন্বয় করতে গিয়ে কত নির্ঘুম রাত্রি যে অতিক্রান্ত হয়েছে, তা কেবল আমার রবই জানেন। তিনি যদি দয়া করে এ পরিশ্রমটুক কবুল করেন, তাহলেই আমি সার্থক।

অনেক ভাই চেয়েছেন 'ফারিস সিরিজ' মলাটবদ্ধ হোক। অনেকে না দেখেও ফারিসকে হৃদয়ে ঠাঁই দিয়েছেন। অনেকেই হয়তো নিভৃতে দো'আও করেছেন। আল্লাহ ﷻ আপনাদের সে দো'আকে কবুল করেছেন। যার বদলৌতে 'ফারিস সিরিজ' আজ এ পর্যায়ে। অন্তর থেকে ভালোবাসা রইল আপনাদের সকলের প্রতি। আল্লাহ ﷻ আমাদের জান্নাতে একত্র করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

যেহেতু আমি আলেম না, তাই বইটার শার'ঈ সম্পাদনা করানো আবশ্যক ছিল। শার'ঈ সম্পাদনার জন্যে মুফতি হারুন ইযহার হাফিযাহুল্লাহ সম্মত হলেন। লিখালিখির লাইনে আমি একেবারেই নবীন, তাই মৌলিক কিছু দিকনির্দেশনার দরকার ছিল। আল্লাহ ﷻ আশিক আরমান ভাইকে মিলিয়ে দিলেন। আমি আল্লাহর এ দুজন বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বইটার প্রকাশক ইসমাইল ভাই ও রোকন ভাইয়ের প্রতি। আল্লাহ ﷻ তাঁদের সকলের ওপর রহম করুন। আমীন।

আমি সাহিত্যিক নই। ভাষা-সাহিত্যের ছাত্রও নই। নই কোনও কবি কিংবা গল্পকার। মানবিক দুর্বলতা থেকেও মুক্ত নই। আর জ্ঞানের পরিধি নিতান্তই সামান্য। তাই বইটার মধ্যে ভাবের স্বল্পতা, ভাষাচ্যুতি কিংবা ছন্দপতন হতে পারে। ভুলত্রুটিও থেকে যেতে পারে। আপনাদের নজরে যদি কোনও ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে অবশ্যই জানাবেন। আমরা শুধরে নিতে কার্পণ্য করব না, ইনশাআল্লাহ।

'হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা। সবকিছুর রব ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আপনি ছাড়া কোনও ইলাহ নেই। আমি আমার নফসের ক্ষতি থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি, শয়তান ও তার সাথিদের অনিষ্ট থেকে।'[১] 'হে আমাদের রব, আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি, সে জন্যে আমাদের অপরাধী করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন, আমাদের ওপর তদ্রূপ ভার অর্পণ করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের শক্তির বাইরে ওইরূপ ভারবহনে আমাদের বাধ্য করবেন না। আমাদের পাপ মোচন করুন ও আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের দয়া করুন। আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা। অতএব অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের জয়ী করুন।'[২]

[১] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং : ৪৯৮৩।
[২] সূরা বাকারাহ (০২) : ২৮৬ আয়াত।

এখানেই শেষ করে দিলে ভালো হতো। কিন্তু কিছু কথা মনে পড়ছে, না বলে থাকতে পারছি না। ইদানীংকালে কেউ কেউ আমরা জোর করে ইসলামকে বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে ফেলতে চাই। কিংবা যুক্তি দিয়ে সবকিছু বুঝিয়ে ফেলতে চাই। অথবা সালাফদের বিপরীত পথে হেঁটে, মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চাই। হয়তো আমাদের উদ্দেশ্য সৎ, কিন্তু পুরো পদ্ধতিটাই গলদ। ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে এগুলোর কোনওটারই দরকার নেই।

আমাদের মনে রাখা উচিত—ইসলামের একজন রব আছেন, যিনি এ দীনকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। যিনি অপরাজেয়, সর্বশক্তিমান ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আর তিনি বলেছেন, 'তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে; সকল দীনের ওপর তা বিজয়ী করার জন্যে। যদিও মুশরিকরা সেটা অপছন্দ করে।'[৩]

তাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো—তাঁর নির্দেশিত পন্থায় কাজ করে যাওয়া। সালাফদের দেখানো পথে ইসলামবিদ্বেষীদের মোকাবিলা করা। সর্বাবস্থায় আমাদের দীনকে অবিকৃত রাখা। সফলতা তো একমাত্র তাঁরই হাতে। আর আমরা সেই সৌভাগ্যবান উম্মাহর অংশ, যাদের সাথে আল্লাহ ﷻ সফলতার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন, 'আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ কোরো না। বস্তুত তোমরাই হবে বিজয়ী, যদি তোমরা মু'মিন হও।'[৪]

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর সাহাবা, পরিবার-পরিজন ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁকে অনুসরণ করবেন, তাঁদের সকলের প্রতি। আমাদের সর্বশেষ কথা এটাই—'সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু ও বিচার-দিবসের মালিক।'[৫] 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যেই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।'[৬]

আপনাদের ভাই

জাকারিয়া মাসুদ

২৮ রবিউল আওয়াল, ১৪৩৯ হিজরি

---

[৩] সূরা আস-সফ (৬১) : ৮-৯ আয়াত।
[৪] সূরা আলি 'ইমরান (০৩) : ১৩৯ আয়াত।
[৫] সূরা ফাতিহা (০১) : ২-৪ আয়াত।
[৬] সূরা বাকারাহ (০২) : ১৫৬ আয়াত।

দ্যা স্ট্যান্ডার্ড

ভোর থেকেই আকাশে মেঘ জমে আছে। ভেবেছিলাম মেঘ কেটে যাবে। সূর্য উঠবে। তা আর হলো না। সকাল না গড়াতেই বৃষ্টি শুরু হলো। মুষলধারে। জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দটা উপভোগ করছিলাম। আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, সে সময়ের কথা। বৃদ্ধ এক স্যার আমাদের ইংরেজি ক্লাস নিতেন। তিনি মাঝে মাঝে গর গর করে ইংরেজি বলতেন। ক্লাসের কেউ বুঝল কি না-বুঝল, তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। মাঝেমধ্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করতেন। একদিন আমাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বল তো Cats and dogs অর্থ কী?'

আমি বললাম, 'এটা তো খুব সহজ স্যার। Cat শব্দের অর্থ বিড়াল, যেহেতু এখানে বহুবচন, তাই হবে বিড়ালগুলো। আর and শব্দের অর্থ এবং। dogs শব্দের অর্থ কুকুরগুলো। উত্তরটা হবে বিড়ালগুলো এবং কুকুরগুলো।'

আমার উত্তর শুনে স্যারের হাসি যেন আর থামছেই না। ইংরেজি প্রবাদ-প্রবচন তখনো পড়িনি। তাই স্যারের হাসির কারণটা ধরতে পারিনি। অবশ্যি ক্লাস সেভেনে ওঠার পর সে কারণটা ধরতে পেরেছিলাম।

ছোটবেলার কথা চিন্তা করতে করতে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল। আমি দরজা খুলতে গেলাম। দরজা খুলতেই কানে ভেসে আসল, 'আসসালামু আলাইকুম।'

'ওয়ালাইকুম আসসালাম। ফারিস—তুই?'

'রাতে ফোন করে না আসতে বলেছিলি?'

'তাই বলে এত বৃষ্টিতে?'

ফারিস কোনও জবাব দিলো না। কেবল এক ফালি হাসি উপহার দিলো। শব্দবিহীন হাসি। ফারিস আমার ক্লাসমেট। ফার্স্ট ইয়ার থেকেই ছেলেটার সাথে আমার পরিচয়। মাঝারি গড়নের। বেশ ফর্সা। মাথার চুলগুলো পাতলা কিন্তু দাড়ি বেশ ঘন। দাঁতগুলো মুক্তার মতো। ফারিসের সবচেয়ে নজরকাড়া বৈশিষ্ট্য হলো তার হাসি। খুব সুন্দর মুচকি হাসতে পারে। কথা বলার সময় ঠোঁটের কোনায় একঝলক হাসি লেগে থাকে—সব

সময়।

বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। পারবে না কেন? ও জানে প্রচুর। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার থেকে, অন্যান্য বই-ই বেশি পড়ে। সময় পেলেই বই নিয়ে পড়ে থাকে। টানা অনেক ক্ষণ পড়তে পারে। বই পড়ার প্রতি ওর আগ্রহ দেখে আমরা বলতাম, 'ফারিস, তোকে আমরা বইয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবো।' প্রচণ্ড তাক্বওয়াবান ছেলে। নামাজ, রোজা, যিকির আর ব্যক্তিগত আমলের ব্যাপারে খুবই সচেতন। সময়ের প্রতি সচেতনতার মাত্রাটা, আমাদের সকলের থেকে বেশি। তাই তো তুমুল বৃষ্টিতেও সে সময়মতো চলে এসেছে।

ফারিসকে বসতে দিয়ে, ভেতর থেকে তোয়ালেটা এনে বললাম, 'ভিজে তো একেবারে চুপসে গেছিস। শরীরটা মুছে নে। নয়তো ঠান্ডা লাগবে।'

'ভিজব না—বাইরে যে বৃষ্টি!'

'কী খাবি?'

'কিছু না।'

'কিছু না মানে?'

'কিছু না মানে—কিছু না।'

'তুই বললেই হলো? মা খিচুড়ি রান্না করছেন, সরষের তেল দিয়ে। আজ আর তোকে ছাড়ছি না।'

'কী যেন বলবি বলেছিলি?'

'এত তাড়া কিসের?'

'রাহাতের সাথে দেখা করতে যেতে হবে।'

ফারিস কথা দিয়ে কথা রাখেনি এমন উদাহরণ নেই। অগত্যা চলে যাবে বিধায়, আসল ব্যাপারটা ওকে খুলে বললাম। আমার ফুফাতো ভাই—আসিফ। প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে বিবিএ করছে। কিছুদিন আগেও যে ছেলেটা নামাজে অবহেলা করত না, আজ সে সংশয়বাদীদের দলে নাম লেখাতে বসেছে। নাস্তিক লেখকের পাল্লায় পড়েছে। কোরআনকে তার কাছে আদিম বই মনে হয়। বিশ্বায়নের এই যুগে নাকি কোরআনের কোনও প্রয়োজন নেই। যে মানুষ রকেট বানাচ্ছে, কৃত্রিম উপগ্রহ বানাচ্ছে, সুপার কম্পিউটার বানাচ্ছে, সে মানুষ জীবনবিধানও নিজেই তৈরি করতে পারে। এ জন্যে কোরআনের ওপর নির্ভর করার দরকার নেই।

সব শোনার পর ফারিস বলল, 'আসিফ আছে বাসায়?'

'হ্যাঁ, আছে। কালই এসেছে।'

'ওর সাথে কথা বলা যাবে?'

'সে জন্যেই তো তোকে ডেকেছি। আমি ডাকছি। আসিফ! আসি—ফ! এই আসিফ! একটু শুনে যা তো।'

ভেতর থেকে আসিফ এল। ততক্ষণে চাও চলে এসেছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফারিস বলল, 'ভালো আছ, আসিফ?'

'জি, ভালো।'

'তুমি কোন ইয়ারে?'

'সেকেন্ড ইয়ার।'

'তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে?'

'এই তো, মোটামুটি।'

'বই পড়তে কেমন লাগে—আসিফ?'

'ভালো।'

'হুমায়ুন আজাদের বই পড়েছ—*আমার অবিশ্বাস?'*

'জি।'

'তোমার সংশয় এ বই থেকেই তৈরি হয়েছে, তাই না?'

'আপনি কী করে জানলেন?'

ফারিস উত্তর দিলো না। বইটা সে আসিফের অনেক আগেই পড়েছে। শুধু এটাই না, নাস্তিকদের অনেক বই-ই সে পড়েছে।

'আচ্ছা আসিফ, তুমি কি মাও সেতুং এর নাম শুনেছ?', ফারিস পাল্টা প্রশ্ন করল।

আমি বুঝতে পারছিলাম না—আলোচনার মধ্যে হঠাৎ মাও সেতুং আসলো কেন? চুপ থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই। তাই নীরব শ্রোতার মতো শুনে যেতে লাগলাম।

ফারিসের প্রশ্নের জবাবে আসিফ বলল, 'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'তুমি কি জানো, মাও সেতুং-এর কারণে গণচীনে কী পরিমাণ লোক নিহত হয়েছিল?'

'না ভাইয়া। আমার আইডিয়া নেই।'

'তার নির্দেশে প্রায় দশ মিলিয়ন লোককে হত্যা করা হয়।'

দশ মিলিয়ন! সংখ্যাটা সত্যিই আমাকে অবাক করল। মানুষ কী করে এতটা হিংস্র হতে পারে? হাজার নয়, শত নয়—একেবারে মিলিয়ন! তাও আবার নিজের দেশের নাগরিক! মস্তিষ্ক কতটা বিকৃত হলে এমনটা কেউ করতে পারে! অবশ্যি যারা স্রষ্টাকেই অস্বীকার করে, তাদের কাছে তো এগুলো পানি-ভাত। ক্ষমতার জন্যে এরা মিলিয়ন কেন, এর থেকেও বেশি মানুষকে হত্যা করতে পারে।

ফারিস আরও বলল, 'শুধু হত্যাই নয়, হত্যার পর তাদের দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করা হতো। টুকরোগুলোকে রান্না করা হতো। তারপর পরিবারের সদস্যদের তা খাওয়ানো হতো—জোর করে। কোটি কোটি লোককে সে জেল খাটতে বাধ্য করে। জেলে বন্দী অবস্থায় মারা যায় প্রায় বিশ মিলিয়ন লোক। পাশাপাশি দুর্ভিক্ষের কারণে প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন লোক মারা যায়।'

হা করে আসিফ ফারিসের দিকে তাকিয়ে আছে। চায়ের কাপটা অবশ্যি হাতেই, চুমুক দিচ্ছে না। ফারিস আরেক চুমুক দিয়ে বলল, 'বলতে পারবে আসিফ, জোসেফ স্ট্যালিনের নির্দেশে কী পরিমাণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল?'

আসিফ না-সূচক মাথা নাড়ল। উত্তরটা তার জানা নেই। উত্তরটা ফারিসই দিলো।

'স্ট্যালিন ছিলেন সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীর কুখ্যাত নেতা, যিনি বিশ মিলিয়ন লোককে হত্যা করেন।'

'বিশ মিলিয়ন!' আসিফ খানিকটা বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ ভাইয়া, বিশ মিলিয়ন। তুমি কি জানো, সমাজতন্ত্রীদের কারণে কী পরিমাণ লোক নিহত হয়েছিল?'

'অনেক।'

'অনেক নয়, ঠিকঠাক সংখ্যাটা বলো।'

'সরি ভাইয়া। জানা নেই।'

'*The Black Book of Communism* এর দেওয়া তথ্য অনুসারে, প্রায় এক শ মিলিয়ন লোক নিহত হয়—এদের কারণে।'

'এক শ মিলিয়ন!'

'হ্যাঁ ভাই, এক শ মিলিয়ন। আচ্ছা বলো তো আসিফ, তাদের এই কাজগুলো ঠিক ছিল, না ভুল?

'অবশ্যই ভুল।'

'কীভাবে বুঝলে?'

'নিজের বিবেক দিয়ে।'

'তাদের বিবেক অনুসারে?'

'ঠিকই ছিল মনে হয়।'

'তুমি তো অবশ্যই জানো—আমাদের দেশে মিনিস্কার্ট পরে বের হওয়াটা কী?'

'অসভ্যতা।'

'কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোতে?'

'স্বাভাবিক।'

'শুধু মিনিস্কার্ট নয়, ওদের কাছে বিকিনি পরে বের হওয়াটাও স্বাভাবিক। দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্র সৈকতে শরীরের ওপরের অংশ উলঙ্গ রাখাটাও স্বাভাবিক। আমেরিকার পশ্চিম সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যাওয়াটাও স্বাভাবিক।'

আসিফ চুপটি করে আছে। মাঝে মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা যেভাবে এক ধ্যানে কার্টুন দেখে থাকে, আসিফের তাকানোটাও ঠিক তেমন মনে হচ্ছে। ফারিস এবার তাকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা আসিফ, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে আমাদের যুদ্ধকে তুমি কীভাবে দেখো?'

'এটা মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের স্বাধীনতার লড়াই।'

'হ্যাঁ, এটা মুক্তিযুদ্ধ। জালিমের সাথে মজলুমের লড়াই। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে?'

আসিফ এবারও কিছু বলল না। তার মানে উত্তরটা তার জানা। ফারিস বলল, 'তাহলে বল তো আসিফ, বিবেক দিয়ে সবকিছু যাচাই করাটা কি ঠিক হবে?'

'কেন, ভুল হবে কেন?'

'বিবেক দিয়ে তো সব সময় ভালো-মন্দ নির্ধারণ করতে পারবে না।'

'কেন পারব না? না পারার কী আছে?'

'তোমার বিবেকের কাছে যেটা ঠিক মনে হবে, অন্যের কাছে সেটা ঠিক নাও হতে পারে। যেমন ধরো—সমকামিতা। তুমি এটাকে কীভাবে দেখো?'

'ইট'স এ ক্রাইম।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। এটা ক্রাইম। আমাদের বিবেকের কাছে এটা ক্রাইম। কিন্তু হুমায়ুন আজাদ কিংবা অভিজিৎ রায়দের কাছে? ওদের কাছে এটা ক্রাইম না। সাধারণ একটি কাজ। কেবল বিবেক দিয়ে তুমি ভালো মন্দের স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করতে পারবে না।'

'তাহলে কি, অন্য কিছুর মাধ্যমে ভালো মন্দের স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করতে হবে?'

'হ্যাঁ ভাই। ঠিক তা-ই। ভালো-মন্দ নির্ধারণের জন্যে শুধু বিবেকই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকের বিবেক কখনো একটি কাজকে স্বাভাবিক মনে করতে পারে না। একেক জনের বিবেক একেক রকম হয়ে থাকে। একেক জন একেক দিক থেকে চিন্তা করে। একেক জন একেক দিক থেকে বিচার করে।

তোমার বিবেকের কাছে মিনিস্কার্ট পরে বের হওয়াটা অন্যায়, কিন্তু জাপানীদের চোখে তা স্বাভাবিক। তোমার কাছে নগ্ন হয়ে স্নান করাটা অন্যায়, কিন্তু পশ্চিমাদের চোখে তা স্বাভাবিক। তোমার কাছে মাও সেতুং কিংবা স্ট্যালিনের কাজগুলো সন্ত্রাসবাদ, কিন্তু তাদের কাছে তা স্বাভাবিক। তাই বিবেককে যদি ভালো-মন্দের স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়, তাহলে অবশ্যই সমস্যার সৃষ্টি হবে।'

'আচ্ছা ভাই। এমন কিছু মানুষ যদি এ স্ট্যান্ডার্ড বানায়—যারা বিশ্বস্ত, সৎ, অধিক জ্ঞানী; তাহলে তো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

'তবুও এই সমস্যা রয়েই যাবে।'

'কেন?'

'কোনও বিশেষ দেশ যদি এ স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে, তাহলে অন্য দেশে তা চলবে না। কোনও বিশেষ সমাজ যদি এ স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে, তাহলে আরেক সমাজে সেটা চলবে না। কোনও বিশেষ শতাব্দীতে যদি এ স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হয়, তাহলে আরেক শতাব্দীতে তা চলবে না। তুমি যেমন পশ্চিমাদের তৈরি স্ট্যান্ডার্ড মানবে না, তারাও তোমারটা মানবে না। তুমি যেমন নগ্নবাদীদের স্ট্যান্ডার্ড ফলো করবে না, তারাও তোমারটা ফলো করবে না। তুমি যেমন সমকামীদের স্ট্যান্ডার্ড মেনে নেবে না, তারাও তোমারটা মানবে না।'

আসিফ চুপ। একেবারে চুপ। এক ধ্যানে ফারিসের কথা শুনে যাচ্ছে। ফারিস আবার বলল, 'স্ট্যান্ডার্ড বিধান কখনো বিবেক দিয়ে ঠিক করা যায় না। মানুষের বিবেক অনেক ক্ষেত্রেই প্রবৃত্তির কাছে নতি স্বীকার করে। ফলে মানুষ খারাপ কাজকেও ভালো মনে করতে থাকে। ভালোকেও খারাপ মনে করতে থাকে। আর মানুষকে যদি স্ট্যান্ডার্ড বিধান বানানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়, তো চিরকালই একদল মানুষের হাতে গোটা পৃথিবী জিম্মি থাকবে।'

আসিফের মাথায় হয়তো বিষয়টা ভালোভাবে ঢুকছে না। তাই আমি আসিফকে বললাম, 'কিরে শুনছিস তো, ফারিস কী বলছে?'

আসিফ বলল, 'লাস্টের পয়েন্টটা একটু ব্যাখ্যা করবেন প্লিজ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তোমাকে একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি, খেয়াল করো। মার্কিন সরকারের ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন Terrorism এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে—"কোনও সাধারণ নাগরিক বা সরকারকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা বা সহিংসতার বেআইনি ব্যবহার করা।" FBI এর সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে—ব্যক্তি বা ক্ষমতার বেআইনি ব্যবহার করলে তা সন্ত্রাসী কাজ। কিন্তু যদি তার আইনি ব্যবহার হয়, তাহলে তা সন্ত্রাস নয়। এখন সমস্যা হলো, এই আইন ও বেআইন নিয়ে।

মার্কিন সরকার সাম্রাজ্যবাদকে ছড়িয়ে দিতে অসহায়, নিরীহ, নিরপরাধ মানুষকে দিনের পর দিন হত্যা করে যাচ্ছে। এটা তাদের আইন অনুসারে বৈধ। কিন্তু ওই সমস্ত দেশগুলোর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনলে এসব সম্পূর্ণ অবৈধ। ইরাক যুদ্ধের কথাই ধরো। মার্কিন সরকারের আইন অনুসারে তা বৈধ। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটা সন্ত্রাসবাদ। মানবতাবিরোধী অপরাধ। তাহলে এই সংজ্ঞায় অপরাধী নির্ণয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই তুমি যদি মানুষকে স্ট্যান্ডার্ড বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দাও, তাহলে এ রকম সমস্যায় পড়তে হবে।'

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, স্ট্যান্ডার্ড বিধান একমাত্র স্রষ্টা তৈরি করবে?'

'হ্যাঁ ভাই। আমি সেটাই বলতে চাচ্ছি। স্ট্যান্ডার্ড বিধান আমাদের স্রষ্টা তৈরি করবে।'

'কেন?'

'কারণ তিনি সকল প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে। সমস্ত দোষত্রুটি হতে পবিত্র। মহান স্রষ্টার অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, আমাদের নেই। তিনি জানেন, কোন কোন বিধান আমাদের সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। কোন বিধান পালন করা সকলের জন্যে সহজ হবে। কোন বিধান বিশেষ শ্রেণিকে লাভবান হতে বাধা দেবে। আর মানুষ আমার কিংবা তোমার বিবেকপ্রসূত স্ট্যান্ডার্ড মানতে বাধ্য না হলেও, স্রষ্টার স্ট্যান্ডার্ড মানতে অবশ্যই বাধ্য। কেননা স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন।'

'স্রষ্টার স্ট্যান্ডার্ডের নাম কী?'

'আল-কোরআন। মহান স্রষ্টার সেই স্ট্যান্ডার্ডের নাম হলো আল-কোরআন। কোরআনের আরেক নাম হলো আল-ফুরকান। ইংরেজিতে যাকে বলে দ্যা স্ট্যান্ডার্ড। আমরা মুসলিমরা সকল কাজ, এই স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে মেপে থাকি। কোনটা ঠিক আর

কোনটা ভুল, তা এই স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে বিবেচনা করি। তাই দেখবে, ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই পাল্টায় না। সব সময় একই থাকে। সময়ের পরিবর্তনে খারাপ কাজগুলো মানুষ ভালো মনে করতে থাকলেও, ইসলাম কখনোই সেটাকে ভালো মনে করে না। আবার ভালো কাজও যদি খারাপ হয়ে যায়, তবুও ইসলাম সেটাকে খারাপ মনে করে না। কেননা, সত্য সব সময় ধ্রুব। আর মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তনশীল। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনশীল। বিবেক পরিবর্তনশীল। তাই ব্যক্তির বিবেক কখনো সবক্ষেত্রে ভালো-মন্দ নির্ণয়ের স্ট্যান্ডার্ড হতে পারে না।'

ফারিসের কথা শেষ হতেই, আসিফ কিছু না বলে—মাথা নিচু করে চলে গেল। ফারিস বিষয়টা এমনভাবে বোঝাল যে, আসিফের দ্বিমত করার সুযোগ রইল না। আমি ওকে আটকাতে যাব, ফারিস আমাকে বাধা দিলো।

আসিফ চলে যাওয়ার পর ফারিস বলল, 'নাস্তিকতার ভাইরাস আজ ঝড়ো হাওয়ার মতো বাহিত হচ্ছে। আমাদের স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিগুলোকে সংক্রমিত করছে। এ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন ব্লগ, পেইজ, ওয়েবসাইট, এনজিও প্রতিনিয়ত এ ভাইরাস ছড়িয়ে যাচ্ছে। জানি না শেষতক কী হয়।'

'আমাদের কিছু করা দরকার না?'

'হ্যাঁ দোস্ত। অবশ্যই দরকার। এই ভাইরাস থেকে কওমকে বাঁচানো দরকার।'

ফারিসের সাথে আরও কিছুক্ষণ কাটাতে পারলে ভালো হত। নাস্তিকতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যেত। তা আর সম্ভব হলো না। ফারিস ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'উঠতে হবে দোস্ত। আন্টির হাতের খিচুড়ি অন্যদিন খাব ইনশাআল্লাহ।'

তথ্যসূত্র :

♦ ১.) "The unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives." [*Code of Federal Regulations,* (28 C.F.R. Section: 0.85)]

♦ ২.) St.phane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Pann., Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, *The Black Book of Communism*, (Harvard University Press, 1999)

নিরীশ্বরবাদের অন্তরালে

[এক]

সোশিওলজি আমাদের ফ্যাকাল্টির সাবজেক্ট না। তবুও এক সেমিস্টার সকলকেই এর বোঝা বহন করতে হয়। সোশিওলজি যে স্যার পড়ান, তিনি বেশ দার্শনিক মাইন্ডের। স্যারের মুখে ইয়া লম্বা গোঁফ, মাথায় বিশাল টাক, নাকটা সরু, ঠোঁটগুলো বেশ মোটা। নাম মাহফুজ মুনির। সংক্ষেপে আমরা তাঁকে 'মামু' স্যার বলে ডাকতাম। মাহফুজের 'মা' আর মুনিরের 'মু'। দুয়ে মিলে 'মামু'। মামু স্যার।

স্যারের দার্শনিক গুরু ছিলেন লালন। লালন সাঁইজি। কুষ্টিয়ায় যার কবর রয়েছে। লালনের দর্শনকে তিনি মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। আর আমাদের সামনে তা প্রচার করে বেড়াতেন। পাঁচ ক্লাসেই স্যার কোর্স শেষ করে ফেলেছিলেন। বাদবাকি ক্লাসগুলোতে তিনি দর্শনের জ্ঞান দেওয়া শুরু করলেন। নিজেকে তিনি অনেক জ্ঞানী মনে করতেন।

তিনি এতটাই জ্ঞানী ছিলেন যে, পিএইচডি করতে গিয়ে ফেরত আসতে হয়েছিল! অধিক জ্ঞানের কারণে থিসিস পেপার কমপ্লিট করতে পারেননি। মাত্রাতিরিক্ত কথা বলতেন ক্লাসে। ক্লাসের বাইরেও যাকে তাকে জ্ঞান দেওয়া শুরু করতেন। কোনও প্র্যাক্টিসিং মুসলিম পেলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নাজেহাল করতেন।

তবে এটাই তাঁর প্রধান সমস্যা ছিল না। সমস্যা ছিল অন্য জায়গায়। তিনি ইসলামকে আক্রমণ করে কথা বলতেন। ইসলাম নিয়ে এমন-সব উদ্ভট তথ্য দিতেন যে, সহ্য করাটা কঠিন ছিল। নম্বর কম পাবার ভয়ে আমরা সবাই চুপচাপ থাকতাম। কোনও প্রতিবাদ করতাম না। মনে মনে ভাবতাম—কোনও রকমে এক ঘণ্টা পার হলেই বাঁচি।

কিন্তু ফারিস চুপ করে বসে থাকত না। স্যারের কথার প্রতিবাদ করত। স্যার যখনই ভুল ইনফরমেশন দিতেন, সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যেত। নম্বরের ভয় ফারিসকে কাবু করতে পারেনি। মাঝে মাঝে স্যার আর ফারিসের তুমুল তর্ক হতো। তবে শেষমেষ ফারিসই জয়ী হতো।

সেদিন সোমবার। সকালের প্রথম ক্লাসটাই ছিল সোশিওলজি। 'মামু' স্যারের ক্লাস। পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা কোনও ছাত্রের একটু দেরি হলেই, তিনি আর ক্লাসে ঢুকতে দিতেন না। তাই খুব তড়িঘড়ি করে ক্লাসে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পর স্যার আসলেন। তবে আজ আর রোল কল করলেন না। সরাসরি জ্ঞানদান শুরু করলেন।

এরপর বললেন, 'স্টুডেন্টস, আজ একটা ব্যতিক্রম বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। ব্যতিক্রম হলেও বিষয়টা বেশ সিরিয়াস। বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা উচিত। সম্প্রতি এর ভয়াবহতা আমরা নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি। বিষয়টা হলো—সন্ত্রাসবাদ। তোমরা কি কেউ জানো, সন্ত্রাসবাদ মানে কী?'

স্যারের প্রশ্ন শুনে আমরা চুপ করে রইলাম। অবশ্যি চুপ থাকারও একটা কারণ আছে। স্যারকে যে উত্তরই দেওয়া হোক না কেন, তিনি তা গ্রহণ করবেন না। স্যার মনে মনে যে উত্তরটা ভেবে রেখেছেন, এক্স্যাক্ট সেটাই হতে হবে। নয়তো উত্তর যতই যৌক্তিক হোক না কেন, উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। তাই ক্লাসের সবাই চুপ। কেউ টুঁ শব্দটিও করছে না।

কিছুক্ষণ পর স্যার আমাকে ইশারা করে বললেন, 'কী হুজুর? তুমি পারবে?'

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম। উত্তরটা পারিনি বলে তিনি বেশ খুশিই হলেন। এরপর বললেন, 'Terrorism এর সংজ্ঞা হলো—The use of violent action in order to achieve political aims or to force a government to act.আর সন্ত্রাসী বলা হয়—A person who takes a part in Terrorism. কী, বুঝতে পেরেছ তোমরা?'

আমরা বললাম, 'জি স্যার!'

এরপর স্যার বললেন, 'বিশ্বের চারিদিকে আজ সন্ত্রাসবাদের হাতছানি। সন্ত্রাসীদের কালো থাবায় ক্ষত-বিক্ষত আমাদের ধরণি। এ সন্ত্রাসবাদকে উসকে দিচ্ছে মৌলবাদীরা। ধার্মিকরা। নাস্তিকদের দিকে তাকিয়ে দেখো—সন্ত্রাসবাদের সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। নাস্তিকরা কোনও ধরনের হত্যা আর ধ্বংসের সাথে জড়িত নয়। নাস্তিকরা মানুষের চেতনাকে বদলে দিতে চায়। মানুষকে বিকশিত করতে চায়। কিন্তু ধার্মিকরা!

ধার্মিকরা চায় মানুষের চেতনাকে নষ্ট করতে। রুদ্ধ করতে। সন্ত্রাসবাদের সূচনা ধার্মিকরাই ঘটায়। ধার্মিকরা ইতিহাসের পাতাকে রক্তাক্ত করেছে যুগে যুগে। সব থেকে বেশি করেছে মুসলিমরা। তাই আমাদের ধর্ম নামক কুসংস্কার থেকে নিজেদের মুক্ত করা উচিত। সাম্যবাদের চর্চা করা উচিত। লালনের মতো সব ধর্মের ওপরে—মানবধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। তাহলেই হয়তো সন্ত্রাসবাদ কমানো সম্ভব হবে।'

স্যারের কথা শেষ হতেই কিছু ছাত্র হাততালি দিয়ে স্যারকে স্বাগত জানালো। এরা স্যারের ভক্ত। একনিষ্ঠ ভক্ত। সহজ কথায় বলা চলে স্যারের মুরিদ। নিজেদের বিবেককে এরা স্যারের কাছে বন্ধক রেখেছে। স্যার যা-ই বলেন, তা-ই তারা গসপেল বলে মনে করতে থাকে। ক্লাসে এদের সংখ্যাটা অবশ্যি নগণ্য। তবুও তাদের আজ বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বাগ্‌যুদ্ধে ধার্মিকদের একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলেছেন—তাদের স্যার।

হঠাৎ মনে হলো ফারিসের কথা। ফারিস কিছু বলছে না কেন? পেছনে তাকিয়ে দেখি ও নেই। মনে মনে ভাবলাম—সেরেছে। আজ ফারিস নেই, স্যার খালি মাঠে গোল দেবেন। স্যারের ভক্তরা তাঁর সাথে সাথে নাচতে থাকবে। ঠিক তা-ই হলো। ঘণ্টা খানেক স্যার সন্ত্রাসবাদ নিয়ে লেকচার দিলেন। ধর্মকে, বিশেষ করে ইসলামকে অবজ্ঞা করে কথা বললেন।

সেদিনকার মতো ক্লাস শেষ করে বাসায় ফিরলাম। এরপর খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম—ফারিস অসুস্থ। তাই ক্লাসে আসতে পারেনি। বৃষ্টিতে ভিজেছিল। জ্বর হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ফারিস খুব পছন্দ করে। সময় পেলেই বৃষ্টিতে ভেজে। সেদিন হয়তো একটু বেশিই ভিজেছিল। যার কারণে জ্বর বাসা বেঁধেছে। মন থেকে মামু স্যারের কথাগুলো মুছে ফেলতে পারছিলাম না।

স্যারের সেদিনকার লেকচার অনেকের মনেই সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। নিজেকে বেশ অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। আমি কেন ফারিসের মতো স্পষ্টভাষী হতে পারি না? আমি কেন নম্বরের ভয় করি? কেন সত্যকে সবার সামনে তুলে ধরতে পারি না? কেন? কে আমাকে বাধা দেয়?

মনে মনে ভাবছিলাম কী করা যায়। তবে কেবল একটাই সমাধান বেরিয়ে আসছিল—ফারিস। ফারিসই পারে স্যারের কথাগুলোর পাল্টা জবাব দিতে। চটজলদি খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম।

[দুই]

ফারিসের সাথে দেখা হলো মসজিদে। ওর মেসের পাশেই যে মসজিদ আছে সেটাতে। বায়তুল আমান জামে মসজিদ। শতাধিক কালের পুরোনো একটি মসজিদ। ফারিসকে দেখে তো আমি অবাক! জ্বর নিয়েও সে জামাতে সালাত পড়তে চলে এসেছে! আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, 'আসসালামু আলাইকুম।'

'ওয়ালাইকুম আসসালাম।'

'কিরে, জ্বর নিয়েও মসজিদে?'

ফারিস মুচকি হেসে বলল, 'মেসে কি আর মসজিদের স্বাদ পাওয়া যায়? আর এসব ছোটখাটো অসুখকে পাত্তা দিতে নেই। যত এভোয়েড করবি, নিজেকে ততই সুস্থ মনে হবে।'

ফারিসকে কিছু বলতে যাব এই মুহূর্তে ও বলল, 'তুই কেন এসেছিস, তা আমি জানি।'

'জানিস?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'কীভাবে?'

'কীভাবে, তা তো জানি না। তবে তুই যে সোশিওলজি ক্লাসের কথা বলতে এসেছিস, সেটা আমি জানি।'

ফারিস সত্যিই আগে থেকেই অনেক কিছু অনুধাবন করতে পারে। ওর অনুধাবনশক্তি আমাকে প্রতিনিয়ত বিস্মিত করে। চেষ্টা করেও ওর মতো হতে পারিনি। মসজিদের বারান্দায় বসে, ফারিসের সাথে ক্লাসের ঘটনাবলি শেয়ার করলাম। ফারিস কিছু বলল না। কেবল হাঁ, হুঁ, বুঝতে পেরেছি বলেই চালিয়ে দিলো।

[তিন]

প্রায় সপ্তাহ খানেক পর মামু স্যারের ক্লাস। এক ক্রেডিটের সাবজেক্ট। সপ্তাহে একটাই ক্লাস। যথারীতি স্যার ক্লাসে আসলেন। রোল কল শেষে খাতাটা বন্ধ করলেন। এরপর তাঁর জ্ঞানদান কার্যক্রম শুরু করলেন। স্যার কথা শুরু করতে যাবেন এই মুহূর্তে সুস্ময় বলে উঠল, 'এক্সকিউজ মি স্যার!'

স্যার চশমার ফাঁক দিয়ে সুস্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়েস!'

'আপনি গত ক্লাসে বলেছিলেন আজ মানবধর্ম নিয়ে আলোচনা করবেন। এটাও বলেছিলেন, যদি আপনি ভুলে যান, তাহলে যেন মনে করিয়ে দিই। তাই আরকি।'

সুস্ময় স্যারের প্রিয় ছাত্র। প্রিয় হওয়ার অবশ্যি কিছু কারণ আছে। স্যার যা-ই বলেন, সুস্ময় সেটাই নোট করে রাখে। আর সপ্তাহ খানেক ধরে তা প্রচার করতে থাকে। সে জন্যেই স্যার সুস্ময়কে আদর করেন। সুস্ময়ের কথা শুনে স্যার বললেন, 'আই'ম প্রাউড অফ ইউ। ইউ আর রিয়েলি এ সিন্সিয়ার স্টুডেন্ট। থ্যাংকয়্যু। থ্যাংকয়্যু মাই সান। সিট ডাউন।'

স্যারের কথা শুনে সুস্ময় বসে পড়ল। স্যার বলতে শুরু করলেন, 'প্রত্যেক ধর্মের ওপরে যার স্থান সেটা হলো—মানবধর্ম। মানবধর্ম আমাদের উদারতা শেখায়। মহানুভবতা শেখায়। এর বিপরীতে যত ধর্ম আছে—তা হানাহানি শেখায়, বিভাজন শেখায়। তাই মানবধর্মকে সবার ওপরে জায়গা দেওয়া উচিত। তাহলেই হানাহানিপূর্ণ এ বিশ্বে শান্তি ফিরে আসবে।'

এটুকু বলে থামতেই ফারিস দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'এক্সকিউস মি স্যার। একটা কোয়েশ্চেন করি?'

'হ্যাঁ, করো।'

'আচ্ছা স্যার, মানবধর্মের শুরুটা কবে? আই মিন এটার উৎপত্তি কোথায়?'

অনেক ক্ষণ ভেবেও স্যার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। ফারিস আবার প্রশ্ন করল, 'মানবধর্মের মধ্যে কি মানবতার সমাধান আছে স্যার?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। থাকবে না কেন?'

'আচ্ছা স্যার, মানবধর্মমতে বিশ্বের অর্থনীতি কেমন হওয়া উচিত?'

'শোষণমুক্ত।'

'তা না হয় বুঝলাম। এর জন্যে মানবধর্ম কী কী রূপরেখা দিয়েছে? আর যদি দিয়েও থাকে, তাহলে তা কোন বইয়ের মধ্যে আছে স্যার?'

'বোকা ছেলে, বলে কী? মানবধর্মের কি লিখিত কোনও বই আছে নাকি?'

'তাহলে মানবধর্ম মানুষের কর্মগুলোকে জাজ করে কীভাবে?'

'মানে?'

'ধরুন, কেউ তার মায়ের সাথে যৌনসম্পর্ক করল। এই কাজকে মানবধর্ম কীভাবে দেখবে?'

'অবশ্যই খারাপ।'

'এটা মানবধর্মের কোন নীতিমালায় লিখা আছে?'

'আমি বললাম তো, মানবধর্মের লিখিত কোনও নীতিমালা নেই। এর ওপর স্পেশাল কোনও বইও নেই।'

'আপনি যে ধর্মকে সবার ওপরে স্থান দিতে চাচ্ছেন, সে ধর্মের নির্দিষ্ট বিধিবিধান নেই। মূলনীতি নেই। সংবিধান নেই। যেটাকে বেইজ করে আমরা মানুষের কাজগুলোকে বিচার করতে পারি। ভালো কোনটা, আর খারাপ কোনটা তা নির্ণয় করতে পারি। এমন

ধর্মকে আমরা কীভাবে অনুসরণ করতে পারি স্যার, যে ধর্মের নির্দিষ্ট কোনও রুলস-রেগুলেশন নেই? যে ধর্মের ওপর লিখিত কোনও বই নেই। যে ধর্মের মূলনীতি কী, তাও আমাদের জানা নেই। ধর্ম হলে হলে তার জন্যে নির্দিষ্ট রুলস-রেগুলেশন থাকা আবশ্যক। সে ধর্মের ওপর লিখিত বই-পুস্তক থাকা আবশ্যক।'

ফারিসের কথা শুনে স্যার ক্ষণিকের জন্যে চুপসে গেলেন। স্যারের মুখে বিরক্তির ছাপ লক্ষ করা গেল। স্যার যে মানবধর্মের দাওয়াত দিয়ে বেড়ান, সে ধর্মের নির্দিষ্ট কোনও বিধি-বিধান নেই। মূলনীতি নেই। স্পেসিফিক কোনও বইও নেই। এটা আবার কেমন ধর্ম!

আসলে মানবধর্ম বলে কিছুই নেই। সবই ধর্মহীন শ্রেণির ফাঁকা বুলিমাত্র। যাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার প্রবৃত্তির কাছে নতি স্বীকার করানো। মনে মনে যখন এ কথাগুলো ভাবছিলাম, তখন ফারিস বলল, 'স্যার, যুগের পর যুগ আপনারা মানবধর্মের কথা বলে আসছেন, অথচ এখনো সে ধর্মের নির্দিষ্ট রূপরেখা ঠিক করতে পারেননি। সে ধর্মের অর্থনৈতিক বিধান, সামাজিক বিধান, রাষ্ট্রীয় বিধানের কোনও সুলিখিত নীতিমালা প্রস্তুত করতে পারেননি। যার ওপর ভিত্তি করে মানবধর্মকে অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনা করতে পারি। এটা কেমন হয়ে গেল না?'

স্যার বলেন, 'এটাই তো মানবধর্মের প্লাস পয়েন্ট। এ ধর্ম তোমাদের মতো ব্যাকডেইটেড নয়। এ ধর্ম প্রতিটি যুগে নতুন করে নিজেকে প্রকাশ করে। যে যুগে যে চাহিদা প্রয়োজন—তার সমাধান দেয়। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির জন্যে যখন যে নিয়ম দরকার, সেটা তৈরি করার স্বাধীনতা দেয়। হাজার বছর আগের কোনও বিধান আঁকড়ে ধরতে বলে না।'

ফারিস বলল, 'যুগের সাথে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তো ইসলামেও আছে। ফিকহশাস্ত্র তো এ জন্যেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু একদম মৌলিক লেভেলে অবশ্যই একটা অপরিবর্তনীয় কাঠামো দরকার। সেটা মানবধর্মে আছে কি স্যার? মায়ের সাথে যৌনসম্পর্কের যে উদাহরণটা দিলাম, সেটার ব্যাপারেই নাহয় বলুন।'

'ব্যাপারটা তোমাকে পরে ক্লিয়ারলি জানাব।' এই বলে স্যার আবার নতুন করে লেকচার শুরু করলেন।

তবে এবার তিনি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেলেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'ধর্ম মানুষকে সন্ত্রাসী বানায়, মানুষকে হানাহানি শেখায়। একটু লক্ষ করলেই দেখবে, ধর্মের কালোছায়া যেখানেই পড়েছে সেখানেই অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়েছে। তাই ধর্মহীন পৃথিবীই পারে মানুষকে সংঘাত, হানাহানি থেকে মুক্তি দিতে। সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।'

স্যারের কথা শেষ হতেই ফারিস আবার দাঁড়িয়ে বলল, 'আই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন স্যার।'

স্যার বললেন, 'ইয়েস।'

'যারা ধর্ম মানে না, আই মিন নাস্তিক; তারা কি হত্যা, হানাহানি আর ধ্বংসের সাথে জড়িত নয়?'

'না। মোটেই না। ইতিহাস তো আমাদের তেমন কথা বলে না।'

'স্যার আপনি মাও সেতুংকে তো অবশ্যই চেনেন?'

'হ্যাঁ চিনি। চিনব না কেন? আর শুধু আমি না, সবাই তাঁকে চেনে। এত বড় বিশাল ব্যক্তিত্বকে না চিনলে চলে?'

'আচ্ছা স্যার, মাও সেতুং এর কারণে কী পরিমাণ লোক নিহত হয়েছিল?'

'সামান্য কিছু লোক। যারা সে সময়ে অন্যায়ের সাথে জড়িত ছিল, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। নিরীহ মানুষকে তো আর মারা হয়নি।'

'সামান্য কিছু লোক! এটা কেমন কথা স্যার? তাঁর আদেশে দশ মিলিয়ন লোককে হত্যা করা হয়। তাঁর বিরোধিতা করার জন্যে কোটি কোটি লোককে জেল খাটতে বাধ্য করা হয়। জেলে বন্দী অবস্থায় মারা যায় প্রায় বিশ মিলিয়ন লোক। তাঁর The Great Leap Forward নামক চরম গোঁড়া নীতির কারণে—প্রায় এক হাজার লোক মারা যায়। পাশাপাশি দুর্ভিক্ষের কবলে মারা যায় চল্লিশ মিলিয়ন লোক। এটা সামান্য স্যার?'

ফারিসের কথা শুনে স্যার কোনও জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। ক্লাসের সবাইও চুপ। কেউ কোনও কথা বলছে না। কেবল হা করে স্যার আর ফারিসের কথোপকথন শুনছে। কিছুক্ষণ পর ফারিস বলল, 'আচ্ছা স্যার, মাও সেতুং আস্তিক ছিলেন, না নাস্তিক?'

চশমার ফাঁক দিয়ে চোখগুলো বড় বড় করে স্যার ফারিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাস্তিক।'

'১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত যিনি কম্বোডিয়া শাসন করেন, তাঁর নাম কী ছিল স্যার?

স্যার কিছুটা সময় নিলেন। এরপর বললেন, 'পল পট।'

ফারিস আবার জিজ্ঞেস করল, 'পল পটও তো নাস্তিক ছিলেন, তাই না স্যার?'

'হ্যাঁ, ছিলেন। তাতে তোমার সমস্যা কোথায়?'

'না, স্যার। আমার সমস্যা হবে কেন? সমস্যা তো অন্য জায়গায়।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন? স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড কথা বলো। এত পেঁচিয়ো না। প্যাঁচিয়ে কথা বলা আমার একদম পছন্দ না।'

'সরি স্যার। পল পট যখন কম্বোডিয়া শাসন শুরু করেন, তখন কম্বোডিয়ার জনসংখ্যা ছিল ৮০ লাখ। কিন্তু চার বছর পর যখন ভিয়েতনাম তাঁকে উৎখাত করে, তখন তা ৫০ লাখে নেমে যায়। এই ৩০ লাখ লোক কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যে মারা যায়নি। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়ে এরা মারা যায়।'

স্যার এবারও কিছু বললেন না। তবে ফারিসের একটা প্রশ্ন শুনে স্যারকে খানিকটা প্রসন্ন দেখালো। অবশ্যি তারও একটা কারণ আছে। ফারিস যার সম্পর্কে জানতে চেয়েছে, স্যারের কাছে তিনি মহান পুরুষ। রাষ্ট্রীয়ভাবে যিনি নাস্তিক্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। স্যারের কাছে এ মহান (!) পুরুষের নাম মুখে আনাটাও গৌরবের ব্যাপার বৈকি। ফারিস স্যারকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার আপনি কি লেনিন সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন?'

স্যার বললেন, 'নিশ্চয়, কেন নয়? কমিউনিস্ট বলশেভিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা তিনি। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে তাঁর অনুসারীরা রাশিয়া দখল করে। সেখানে তিনি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই সে ব্যক্তি, যিনি জারতন্ত্রের অবসান ঘটান। এরপর সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। হি ওয়াজ এ গ্রেট লিডার।'

'তিনি কেমন গ্রেট লিডার ছিলেন, আমি কি একটু বলব স্যার?'

স্যার আবারও চশমার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে গম্ভীর গলায় বললেন, 'বলো।'

'নাস্তিক লেনিনের অত্যাচার ও নিপীড়ন সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে Harrison E. Salisbury বলেছেন, "সমগ্র মহাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। এই বিপ্লবের লোকেরা হাজার হাজার হত্যাকাণ্ড ও লাখ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটায়। এই সোভিয়েত সমাজব্যবস্থাকে প্রকৃতপক্ষে একটি ত্রাসব্যবস্থা হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। এর তুলনায় জারতন্ত্র অনেক সহনীয় ও মানবিক বলে আখ্যায়িত হয়। আমরা বিচলিত হয়ে যাই যখন দেখা যায়, একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দৈনন্দিন নিয়মিত অপকর্ম তথা নিষ্ঠুর আচরণের মাধ্যমে প্রতিবছর ৩ থেকে ৪ মিলিয়ন লোককে কায়িক শ্রমে বাধ্য করা হয় ও চিরস্থায়ী দেশান্তরে প্রেরণ করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রমকে এমন স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা হয় যে, বন্দীরা জানতেও পারত না তাদের অপরাধই কী এবং

তাদের বিরুদ্ধে কী রায়ই-বা দেওয়া হয়েছে।"'[৭]

এই গ্রেট লিডারের কথা শুনে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, আর স্যারের মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে। কিন্তু ফারিস আগের মতোই রইল। এরপর স্যারকে আরও একটা প্রশ্ন করল, 'লেনিনের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসক কে ছিল স্যার?'

'কে আবার? স্ট্যালিন। জোসেফ স্ট্যালিন।'

'স্যার, জোসেফ স্ট্যালিন কি নাস্তিক ছিলেন?'

'হ্যাঁ, ছিলেন। কেন?'

'নাহ! এমনিই স্যার। আচ্ছা স্যার, স্ট্যালিনের সময়টা কি সংঘাতহীন ছিল? মানে সে সমাজে কি সাম্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল!'

'হ্যাঁ, হয়েছিল? হবে না কেন? নাস্তিকদের লক্ষ্যই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।'

'সত্যিই স্যার?'

'তুমি কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে চাচ্ছ?'

'না স্যার, তা হবে কেন? মিথ্যাবাদী বলতে যাব কেন? হয়তো কোথাও একটু ভুল হচ্ছে স্যার।'

'ভুল?'

'জি স্যার। ভুল।'

ফারিসের কথা শুনে স্যার রেগে গেলেন। স্যারের চোখ মুখ লাল বর্ণ ধারণ করল। চোখ থেকে চশমাটা সরিয়ে ফেললেন। কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি ভুল বলছি! আমি! তাহলে ঠিকটা কী?'

'প্লিজ স্যার, রাগ করবে না। এত অল্পতে রেগে গেলে চলে? আপনারাই তো বলেন, নাস্তিকরা আস্তিকদের থেকে বেশি সহনশীল! যদি চান, আমি আর প্রশ্ন করব না।'

ফারিস একেবারে ঠিক জায়গায় খোঁচা দিয়েছে। সহনশীল! তাও আবার নাস্তিকরা! যাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে ধর্মের বিরোধিতা। ধার্মিকদের বিরোধিতা। এরা সহনশীল হবে, এটা অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

[৭] "a whole continent of terror Compared with those who brought about the hundreds of thousands of executions and the millions of deaths in the Soviet terror system, the Czars seem almost benign Our minds boggle at the thought of a systematized, routine evil, under which three or four or more million men and women were sentenced each year to forced labour and eternal exile-and in a manner so casual that the prisoners often were not even told what their sentences were"

স্যার যদিও কিছুটা রেগে আছেন, তবুও কথা না থমিয়ে বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে। আমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না। কী বলতে চাও ক্লিয়ারলি বলো। এত ভণিতা করার দরকার নেই।'

ফারিস বলল, 'স্যার, স্ট্যালিনের সময়কাল সংঘাতহীন ছিল না। তাঁর সময়ে সাম্যও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।'

'কে বলেছে?'

'আমাকে শেষ করতে দিন স্যার।'

'ওকে, ক্যারি অন।'

'স্ট্যালিন ছিলেন সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীর এক কুখ্যাত নেতা। তিনি তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যে সন্ত্রাসের আশ্রয় নেন। অন্যান্য নাস্তিকদের মতো তিনিও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত মালিকানা নীতির অবসান ঘটান। ৮০% জমি রাষ্ট্রীয়করণ করেন। তাঁর এই অদূরদর্শী পদক্ষেপ ও প্রশাসনের দুর্নীতির কারণে, রাশিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লাখ লাখ মানুষ এই দুর্ভিক্ষে মারা যায়।

শুধু ককেশাস অঞ্চলেই মারা যায় দশ লাখ লোক। তিনি ক্রিমিয়াবাসী ও তুর্কিসহ লাখ লাখ ব্যক্তিকে দূরতম এলাকায় পাঠিয়ে দেন। বিরোধীদের পাঠান সাইবেরিয়ার ভয়াবহ শ্রমশিবিরে। সেখানকার কাজ ছিল বেশ নির্মম ধরনের। কাজ করতে করতেই অধিকাংশ বন্দী মারা যায়। তার সময়ে প্রায় ২০ মিলিয়ন লোককে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডে তিনি প্রচুর আনন্দ পেতেন।'

ফারিসের কথা শুনে স্যার কিছু বললেন না। স্যার জানেন—ফারিস যা বলছে তা বিন্দু-পরিমাণও মিথ্যে নয়। সবটাই ঐতিহাসিক সূত্রে প্রমাণিত। যারা ইতিহাস নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে অথবা উইকিপিডিয়া পড়ে, তারা বিষয়টি আরও ভালোভাবে জানে। তাই স্যার চুপ রইলেন। ফারিস আবার বলল, 'আরেকটা কথা বলব স্যার?'

স্যার ঘড়ির দিকে তাকালেন। ক্লাস শেষ হতে আরও পনেরো মিনিট বাকি। তাই তিনি ফারিসকে না বলতে পারলেন না। প্রশ্ন করার অনুমতি দিলেন।

ফারিস বলল, 'আপনার একটি পয়েন্টের সাথে আমার একটু দ্বিমত আছে স্যার। অবশ্য এটা আজকের কোনও পয়েন্ট না, বিগত ক্লাসের।'

'কোন পয়েন্ট?'

'আপনি বলেছিলেন, নাস্তিকরা মানুষের কাজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে—এই পয়েন্টটা স্যার।'

'কেন? আমি কি ভুল বলেছি? নাস্তিকরা অবশ্যই মানুষের কাজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। যা আস্তিকরা করে না।'

'না স্যার। নাস্তিকরা কখনোই ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। তারা শুধু মুখেই ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলে। কিন্তু ক্ষমতা পেলেই ওদের চেহারা পালটে যায়। ওরা আসলে জোরপূর্বক নাস্তিকতা চাপিয়ে দিতে চায়। ধর্ম পালনের পথকে রুদ্ধ করতে চায়।'

'কী সব আবোল-তাবোল বকছ? কোনও এভিডেন্স আছে? নাকি এমনিতেই ক্লাসের সময় নষ্ট করছ?'

'এভিডেন্স আছ স্যার। অবশ্যই আছে। থাকবে না কেন? এভিডেন্স দেওয়ার আগে, আমি আরেকটা প্রশ্ন করার অনুমতি চাই।'

'ওকে। ইউ মে আস্ক।'

'থ্যাংকয়্যু স্যার। আমার কোয়েশ্চেনটা হলো, আলবেনিয়াকে কোন শাসক—নাস্তিক রাষ্ট্র হিসেবে ডিকলেয়ার দেন?'

'Enver Hodja.'

'জি স্যার। Enver Hodja. তিনি ১৯৬৭ সালে আলবেনিয়ার ক্ষমতা দখল করেন। এরপর সেখানে নাস্তিকতাবাদের প্রসার ঘটান। তাই না স্যার?'

'হুঁ।'

'তাঁর সময়ে কারণ ছাড়াই—ধর্মে বিশ্বাসীদের জেলখানায় বন্দী করা হয়। অনেকে সেখানেই মারা যায়। ১৯৬৮ সালে দুজন পাদরিসহ প্রায় পাঁচ হাজার ধার্মিককে হত্যা করা হয়। একুশ হাজারের বেশি মসজিদ ও গির্জা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আর এতক্ষণ আমরা যাদের কথা বললাম—এরা সবাই ছিল নাস্তিক। এরা যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকেছে, তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। তাদের বিরোধীপক্ষের লোকদের ধরে ধরে হত্যা করেছে। পল পটের সময় তো অসংখ্য বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষকদের ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে ওই সব লোকদের, যারা তাঁর বিরোধিতা করেছে। ওই সব লোকদের লাশ ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, যারা বিরোধীপক্ষকে সমর্থন দিয়েছে।

মাও সেতুং এর সময়ে বিরোধী লোকদের কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। একই নীতি অনুসরণ করেছে মেনগিস্টো হেইলি মারিয়ামসহ সব নাস্তিক শাসকেরা। তারা তাদেরই হত্যা করেছে, যারা তাদের বিরোধিতা করেছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে।

এটাই কি সাম্য? এটাই কি কর্মের স্বাধীনতা? এটাই কি ধর্মীয় স্বাধীনতার নমুনা স্যার?'

ফারিসের কথা শুনে মনটা ভরে যাচ্ছিল। ছেলেটা একাই মামু স্যারকে কুপোকাত করে দিচ্ছে। এমন জবাব দিচ্ছে, যার প্রত্যুত্তর স্যার দিতে পারছেন না। পারছেনও না ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে। স্যারের মুখখানা শুকিয়ে যাচ্ছে। শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। স্যার এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিলেন। ফারিসের কথা শেষ হলে তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন। টিস্যু বের করে ঘাম মুছতে লাগলেন। ফারিস তখনো দাঁড়িয়ে আছে। স্যার ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো।'

'একটা মন্তব্য ছিল স্যার।'

'আবার কী?'

'স্যার, আমার কাছে মনে হয় নাস্তিকরা যে মতবাদকে আঁকড়ে ধরে ছিল, আই মিন কার্ল মার্কসের মতবাদ, সে মতবাদই তাদের সন্ত্রাসবাদে উদ্বুদ্ধ করেছে।'

'হাসালে ফারিস, হাসালে। এগুলো তো তাদের পার্সোনাল বিষয়। এ জন্যে কার্ল মার্কস এর মতবাদকে কীভাবে দোষারোপ করা যায়?'

'যায় কি যায় না, সেটা না হয় আপনিই বিবেচনা করবেন। কিন্তু তার আগে আমাদের জানা দরকার—কার্ল মার্কস এর তত্ত্ব সাম্যবাদের কথা বলে, না সন্ত্রাসবাদের?'

'অবশ্যই সাম্যবাদের কথা বলে।'

'না স্যার, এবারো আমি একমত হতে পারলাম না।'

'কেন?

'কারণটা স্যার আপনি নিজেই জানেন। Pope Pious-এর বক্তব্য আপনার অবশ্যই জানা আছে। সমাজতন্ত্রীদের নির্যাতন, অত্যাচার ও বর্বরতা সম্পর্কে Pope Pious XI বলেছিলেন, "সমাজতন্ত্র দুটি জিনিস প্রচার করে ও পেতে চায়; তা হলো—নিরবচ্ছিন্ন শ্রেণিসংগ্রাম এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ। এ ব্যাপারে তাদের কোনও গোপনীয়তা নেই বা কোনও গোপন পদ্ধতির কথাও বলা হয় না; বরং তা করা হয় জনসমক্ষে, খোলাখুলিভাবে এবং সম্ভাব্য যেকোনও পন্থায়। তা যত জঘন্য বা বর্বরোচিতই হোক না কেন। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে ভয়, শ্রদ্ধা, পছন্দের কোনও স্থান নেই। ক্ষমতায় আরোহণের পর এ মতবাদ বাস্তবায়নের জন্যে যেকোনও নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করতে দ্বিধা রাখে না। নিষ্ঠুরভাবে বাস্তবায়ন করে। পূর্ব ইউরোপ ও এশিয়ায় এদের দ্বারা যে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছে তা

এরই প্রমাণ বহন করে।"[৮] আপনি এও জানেন স্যার Samuel Francis-এর মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন।'[৯]

ফারিস এই পর্যন্ত বলে থামল। ফারিসের কথা শেষ হলে স্যার আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। ক্লাসের সময় যেন আজ শেষই হতে চাচ্ছে না। স্যার চাইলেও চলে যেতে পারছেন না। ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলে তাঁর অনুসারীরা কষ্ট পাবে, এই ভেবে হয়তো ফারিসের কথাগুলো হজম করে যাচ্ছেন। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—স্যারের অবস্থাটা এমনই মনে হচ্ছে। কিছু না বলেও তো চুপ থাকা যাচ্ছে না। তাই স্যার বলে উঠলেন, 'তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম তোমার কথা সঠিক। কিন্তু মানুষ হত্যা কি কেবল নাস্তিকরাই করেছে? তোমাদের নবী মুহম্মদ করেননি? তিনিও তো অমুসলিমদের ধরে ধরে হত্যা করেছেন।'

স্যারের কথা শুনে তাঁর অনুসারীরা যেন প্রাণ ফিরে পেল। তারা হয়তো ভাবছে—'যাক শেষমেষ আমাদের স্যারই জয়ী হবেন। ফারিস কি আর আমাদের স্যারের সাথে পারবে? স্যার একেবারে ঠিক জায়গায় খোঁচা দিয়েছে। এবার নিশ্চয় ফারিস হেরে যাবে।'

ওরা যা ভাবার ভাবুক। সত্যের জয় হবে। হতেই হবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সাথে ওয়াদা করেছেন—"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না ও বিষণ্ণ হোয়ো না এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।"[১০]

ফারিস স্যারের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'মুহাম্মাদ ﷺ কি নাস্তিকদের থেকেও বেশি মানুষ হত্যা করেছিলেন? মাও সেতুং, লেনিন, পল পট এদের থেকেও বেশি?'

স্যার কিছু বললেন না। তিনি অবশ্যই জানেন, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর নবুয়তী জীবনে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করেননি। ক্ষমতার লোভে কাউকে বন্দী করে রাখেননি। অহেতুক কাউকে হয়রানি করেননি। মানবতাকে মুক্তি দিতে তাঁকেও যুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছে। প্রায় সাতাশটির মতো যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন তিনি নারী, শিশু, অসহায়দের ওপর আঘাত করেননি। কাউকে পুড়িয়ে মারেননি। বিজিতদের ওপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাননি—নাস্তিকদের মতো।

---

[৮] "Communism teaches and seeks two objectives: unrelenting class warfare and the complete eradication of private ownership. Not secretly or by hidden methods does it do this, but publicly, openly, and by employing any means possible, even the most violent. To achieve these objectives there is nothing it is afraid to do, nothing for which it has respect or reverence. When comes to power, it is ferocious in its cruelty and inhumanity. The horrible slaughter and destruction through which it has laid waste vast regions of Eastern Europe and Asia give evidence of this."

[৯] 'Samuel Francis বলেন, "Marx and Engels were generally specific in insisting that revolution will always be violent and that revolutionaries must use violence against the rulers, and in some instances they did express support of terrorism."

[১০] সূরা আলি 'ইমরান (০৩) : ১৩৯ আয়াত।

মনে যখন এ চিন্তাগুলো খেলা করছিল তখন ফারিস বলল, 'মুহাম্মাদের ﷺ নবুয়তী-জীবনে যতজন মানুষ নিহত হয়েছে, তার থেকে অনেক অনেক বেশি লোক নিহত হয়েছে নাস্তিকদের একদিনের হত্যাযজ্ঞের দ্বারা। নাস্তিকদের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশ মিলিয়ন, চীনে পঁয়ষট্টি মিলিয়ন, ভিয়েতনামে এক মিলিয়ন, উত্তর কোরিয়াতে দুই মিলিয়ন, পূর্ব-ইউরোপে এক মিলিয়ন, কম্বোডিয়ায় দুই মিলিয়ন, ল্যাটিন আমেরিকায় দেড় লাখ, আফ্রিকায় ১.৭ মিলিয়ন, আফগানিস্তানে ১.৫ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। সব মিলিয়ে প্রায় এক শ মিলিয়ন মানুষ নিহত হয়—এদের কারণে। কিন্তু মুহাম্মাদের ﷺ অংশ নেওয়া সকল যুদ্ধে, মোট নিহতের সংখ্যাটা একেবারেই সামান্য।'

হঠাৎ করে স্যার বলে উঠলেন, 'তুমি কি মনে করো বিপ্লব এত সহজ জিনিস? বিপ্লব কি ছেলের হাতের মোয়া, যা চাইলেই পাওয়া যায়। বিপ্লব কোনও ছেলেখেলা নয়। একটি সমাজে বিপ্লব ঘটাতে হলে কিছু মানুষ নিহত হবে। এটাই নিয়ম। রক্তপাত ছাড়া কি সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করা যায়?'

'অনেক সুন্দর একটা পয়েন্ট। আমি আপনার সাথে একমত। বিপ্লব কীভাবে রক্তপাত ছাড়া হতে পারে? একটি শিশুও তো রক্তপাত ছাড়া জন্ম নেয় না। একদম ঠিক স্যার। মুহাম্মাদ ﷺ মক্কায় যে বিপ্লব সাধন করেছিলেন, তার জন্যেও রক্তপাত হয়েছিল। সেটা আমি অবশ্যই স্বীকার করি। তবে তিনিই বিশ্বের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সবচেয়ে কম রক্তপাতের মাধ্যমে একটি সফল বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন।

মুহাম্মাদের ﷺ অংশ নেওয়া প্রায় সাতাশটি যুদ্ধে, নিহত হয়েছিল মাত্র এক হাজার আঠারো জন। চিন্তা করতে পারেন স্যার—সংখ্যাটা কত নগণ্য! উভয়পক্ষের নিহতের সংখ্যা—মাত্র হাজার খানেক। অল্পসংখ্যক প্রাণের বিনিময়ে—সফল বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তিনি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, নাস্তিকদের মতো মুহাম্মাদের ﷺ বিপ্লবের মধ্যে কোনও জাগতিক উদ্দেশ্য ছিল না। ছিল না ক্ষমতার লোভ। এ বিপ্লবের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি।'

স্যার হয়তো মনে মনে ভেবেছিলেন—যে করেই হোক, ফারিসকে এবার পরাজিত করেই ছাড়বেন। তা আর হলো না। উল্টোটা হলো। লাস্ট পয়েন্টেও তিনি পরাজিত হলেন।

ক্লাসের সময় শেষ হলো। স্যার আর কিছু বললেন না। মুখটা কালো করে ক্লাস থেকে চলে গেলেন—চুপিচুপি। যাওয়ার সময় নাম ডাকার খাতা আর চশমাটা ফেলে গেলেন। সুস্ময় দৌড়ে গিয়ে খাতা আর চশমাটা দিয়ে এল।

তথ্যসূত্র :

♦ ১.) সূরা আলি 'ইমরান, (০৩) : ১৩৯ আয়াত।

♦ ২.) বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : কিতাবুল জিহাদ, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, একাদশ সংস্করণ, ২০১৩)।

♦ ৩) ইবনুল কায়্যিম, *যাদুল মা'আদ*, অধ্যাপক আখতার ফারুক অনূদিত, (বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন, ২য় সংস্করণ, ২০১৫)।

♦ ৪) আবুল হাসান আলী নদভী, *নবীয়ে রহমত*, (মজলিশ নাশিরাত-ই-ইসলাম, জুলাই, ১৯৯৭)।

♦ ৫) St.phane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Pann., Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, *The Black Book of Communism*, (Harvard University Press, 1999)

♦ ৬) Samuel T. Francis, *The Soviet Strategy of Terror*, (The Heritage Foundation, 1981)

♦ ৭) Harun Yahya, *The Disaster Darwinism Brought Humanity*, (Al-Attique Publishers Inc., Canada, 2001)

♦ ৮) A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*; (Oxford University Press, 7th edition).

♦ ৯) The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World by Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, (https://books.google.com/books?id=4eSR1rHg5_YC&pg=PA457)

♦ ১০) US admits helping Mengistu escape, BBC, 22 December,1999 ,(http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/575405.stm)

♦ ১১) Talk of the Devil : Encounters with Seven Dictators by Riccardo Orizio. "Ethiopian Dictator Sentenced to Prison" by Les Neuhaus, The Associated Press, 11 January 2007.

♦ ১২) Clayton, Jonathan. Guilty of genocide: the leader who unleashed a 'Red Terror' on Africa, *The Times*, (http://www.thetimes.co.uk/tto/law/article2216081.ece).

♦ ১৩) Heuveline, Patrick, "The Demographic Analysis of Mortality in Cambodia". In Forced Migration and Mortality, eds. Holly E. Reed and Charles B. Keely. (Washington, D.C.: National Academy Press).

♦ ১৪) Robert Templer, Pol Pot's Legacy of Horror, The Age, April ,18 1998, http://dithpran.org/PolPotegacy.htm

♦ ১৫) Harrison E. Salisbury, "Reading The Gulag Archipelago is like no other reading experience of our day", (Book-of-the- Month Club NEWS, Midsummer, 1974).

♦ ১৬) Gleason, Abbott (2009). A Companion to Russian History (https://books.google.com/books?id=JyN0hlKcfTcC&pg=PA373). Wiley-Blackwell. ISBN 3-3560-4051-1

♦ ১৭) Getty, Rittersporn, Zemskov (1993). "Victims of the Soviet Penal System in the Pre-War Years : A First Approach on the Basis of Archival Evidence" (http://home.ku.edu.tr/~mbaker/cshs522/GettyNumbers.pdf)

♦ ১৮) The American Historical Review. 1049–1017 : (4) 98. JSTOR 2166597 (https://www.jstor.org/stable/2166597).doi : 2166597/10.2307 (https://doi.org/2%10.2307F.(2166597

♦ 19) Marek Sliwinski, *Le Génocide Khmer Rouge : Une Analyse Démographique* (L'Harmattan, 1995).

♦ ২০) Banister, Judith, and Paige Johnson (1993). "After the Nightmare: The Population of Cambodia." In Genocide and Democracy in Cambodia : The

♦ ২১) Khmer Rouge, The United Nations and the International Community, ed. Ben Kiernan. (New Haven, Conn. : Yale University Southeast Asia Studies).

♦ ২২) https://web.archive.org/web/20150619112253/http://www.britannica.com/biography/Vladimir-Ilich-Lenin

♦ ২৩) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/335881/Vladimir-Ilich-Lenin.

♦ ২৪) (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007011/AR2007011100243.html)

ডারউইনিজম : সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর

[এক]

আন্তঃফ্যাকাল্টি ফুটবল প্রতিযোগিতা আজ। ফাইনাল খেলা। খেলা শুরু হবে হবে করে হচ্ছে না। বিকেল চারটায় শুরু হওয়ার কথা। এখন বাজে চারটা পঁয়তাল্লিশ। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেলেও কোনও সাড়াশব্দ নেই। আসরের সালাত পড়ে আসলাম। আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা। ইচ্ছে হচ্ছে চলে যাই, কিন্তু নাসির খেলবে বলে যেতে পারছি না। নাসির খুব ভালো খেলে। স্ট্রাইকার। পরপর দু-বার সেরা গোলদাতা নির্বাচিত হয়েছে। এবারের ট্রফিটাও হয়তো ওর হাতেই আসবে। আমাদের ফ্যাকাল্টির অধিনায়ক সে।

সময় পার করার জন্যে বাদাম কিনলাম। খেলাধুলা হলেই বাদামওয়ালাদের সমাগম দেখা যায়। অন্য সময় এদের খোঁজ পাওয়া না গেলেও, খেলায় এসে হাজির হবে ঠিকঠাক। দশ টাকার বাদাম যেন নিমেষেই শেষ হয়ে গেল। চিন্তা করলাম, আরও কিনব কি না?

হঠাৎ মাইকে ড. ফারুক স্যারের গলা শোনা গেল। স্যারের গলা শুনেই কিছুটা স্বস্তি লাগল। তিনি মাইকে খেলা শুরুর ঘোষণা দিলেন। দু-পক্ষের খেলোয়াড় এসে মাঠের মাঝখানে জড়ো হলো। অল্প সময়ের মধ্যেই খেলা শুরু হলো।

যথারীতি প্রথমার্ধের খেলা শেষ হলো। দু-পক্ষের কেউই গোল দিতে পারল না।

দশ মিনিট বিরতি দিয়ে খেলা আবার শুরু হলো। প্রায় তিরিশ মিনিট যাওয়ার পর নাসির গোল দিলো। খেলার মৃত ভাবটা যেন চলে গেল। ফারুক স্যার বেশ উত্তেজিত হয়ে গেলেন। এতটাই উত্তেজিত হলেন যে, স্পিকার ফেটে যাওয়ার উপক্রম। নাসির যখন দ্বিতীয় গোল দিলো তখন স্যার এত জোরে গো—ল বলে চিৎকার দিলেন যে, স্পিকারটা ফেটেই গেল। নিজের ফ্যাকাল্টি বলে কথা! ফ্যাকাল্টির প্রতি স্যারের যথেষ্ট টান। ছাত্রদের তিনি অনেক ভালোবাসেন। অন্যান্য স্যারদের থেকে তিনি অনেক ব্যতিক্রম। ফারিসের প্রিয় স্যারদের একজন। সমস্যায় পড়লে আমরা তাঁর কাছেই দৌড়াই। যথাসাধ্য সাহায্য করেন। ছাত্রদের ছেলের মতো স্নেহ করেন।

খেলার যখন পাঁচ মিনিট বাকি তখন ফারিস এল। আমার পাশে দাঁড়াল। বিপক্ষের লোকজন গোল দিতে মরিয়া। হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। নাসিরের সাথে রাশেদের হাতাহাতি। রাশেদ বিপক্ষের খেলোয়াড়। ডিফেন্ডার। অতিকায় দেহবিশিষ্ট প্রাণী। বদমেজাজি। অল্পতেই রেগে যায়। রাগ উঠে গেলে আর রক্ষে নেই। থাকেও এক বদমেজাজি লোকের সাথে। তাই দিন দিন মেজাজ আরও চড়া হয়ে যাচ্ছে। গায়েগতরে আমাদের সবাইকে হার মানিয়ে দেওয়ার মতো ছেলে। ডারউইনিজমের একান্ত ভক্ত। একান্ত ভক্ত না বলে অন্ধভক্ত বললে মনে হয় ঠিক হবে। ওর কাছে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতামত হলো ডারউইনিজম। অন্য কিছুর সমালোচনা সে মেনে নেবে, কিন্তু ডারউইনিজমের না।

রেফারি এসে দুজনকে হলুদ কার্ড দেখালেন। খেলার আর দু-মিনিট বাকি। এমন সময় নাসির আরেকটা গোল দিলো। নব্বই মিনিট পর আরও দু-মিনিট সময় বাড়িয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু কোনও গোল হলো না। খেলা শেষ হলো। আমাদের ফ্যাকাল্টি জয়ী হলো—তিন শূন্য তে। এবারও নাসির সেরা গোলদাতার ট্রফিটা অর্জন করল।

খেলা শেষ হলে যখন আমরা চলে যাচ্ছিলাম, তখন আবার নাসির ও রাশেদের মধ্যে হাতাহাতি। হাতাহাতি কেন হয়েছিল, সে কারণটা অবশ্যই জানা দরকার। তাই আমরা ওদের দিকে গেলাম।

দল হেরে যাওয়ায় রাশেদ কিছুটা উত্তেজিত ছিল। সম্পূর্ণ ক্ষোভটা ও নাসিরের ওপরে ঝেড়েছে। নাসির যখন ট্রফি হাতে আনন্দ প্রকাশ করছিল, রাশেদ তখন পেছন থেকে ওকে ব্যঙ্গ করছিল। নাসির রাশেদকে যতই এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে, ও ততই যেন গায়ের ওপর পড়ে ঝগড়া করতে চাচ্ছে। নাসির রেগে গিয়ে তাকে থামাতে চেষ্টা করল। সে তো থামলই না, আরও উত্তেজিত হয়ে গেল। নাসির বলল, 'আসলে ডারউইনবাদীরা এমনই হয়। দুর্বলের ওপর এগ্রেসিভনেস শো করে। বিশ্বের অশান্তির মূল হোতা—ডারউইনের অনুসারীরাই। তুইও এর ব্যতিক্রম হবি কেন?'

এ কথা শুনে রাশেদের মাথা চটে গেল। নাসিরের গালে থাপ্পড় বসিয়ে দিলো। নাসিরও খেপে গেল। কথা কাটাকাটি শুরু হলো। এরপর হাতাহাতি। আমরা ধরাধরি করে ওদের ছাড়িয়ে দিলাম। তৃপ্ত ভাই দৌড়ে এলেন। ঘটনা বিশ্লেষণ না করেই নাসিরের ওপর দোষ চাপিয়ে দিলেন। ফারিস বলল, 'নাসির তো মিথ্যা কিছু বলেনি ভাই।'

তৃপ্ত ভাই বললেন, 'যা, আর কথা বাড়াস না।'

মাগরীবের সালাতের সময় হয়েছিল বিধায়, আমরা তাঁর কথার ভালো জবাব দিতে পারিনি। নাসিরকে সাথে করে আমরা ফিরে এলাম।

[দুই]

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বিস্ময়কর জায়গা হলো হলগুলো। যেখানে বেশিরভাগ ছাত্র মানবেতর জীবনযাপন করে। আর কিছু ছাত্র রাজার হালে থাকে। কিছু কিছু হলের দিকে তাকালে আপনার কান্না চলে আসবে। ছাদ থেকে চুইয়ে পানি পড়া, দেওয়ালের প্লাস্টার উঠে যাওয়া, একই কক্ষে গাদাগাদি করে দশ জন বসবাস করা—সেখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ছারপোকা ও টয়লেটের সমস্যা তো আছেই।

আবার কিছু কিছু হলে একেবারে রাজকীয় ভাব। টাইলস, মোজাইক, লিফট ইত্যাদির কোনও কমতি নেই। ভালো হলে বরাদ্দ পাওয়ার পরও হলে থাকার সুযোগ হয়নি। তাই হল-লাইফ কেমন তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। শুনেছি হলে নাকি অল্প কিছুতেই মারামারি লেগে যায়। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। কেন লেগে যায়, তা আমরা সবাই জানি। আমি সে কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি না। অবশ্যি তার দরকারও নেই। আমাদের গল্পের সাথে তা সম্পর্কযুক্ত নয়।

আমি আর ফারিস কবি নজরুল হলে বসা। রুম নম্বর : ২০২। সব মিলিয়ে রুমে আমরা পাঁচ জন। আমি, ফারিস, নাসির, মিসবাহ, রাশেদ। আলোচনা অনেক আগেই শুরু হয়েছে। তবে মূল আলোচনায় যেতে একটু বিলম্ব হচ্ছে। আমরা তৃপ্ত ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছি। তিনি এলেই মূল পর্ব শুরু হবে। বৃহস্পতিবারের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নিয়েই আজকের আলোচনা। সে বিবাদ মীমাংসা করতেই আমরা জমায়েত হয়েছি।

নাসিরের পক্ষে আমি আর ফারিস। আর রাশেদের পক্ষে মিসবাহ আর তৃপ্ত ভাই। যার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি, মানে তৃপ্ত ভাই, তিনি এলেন আধঘণ্টা পর। আমরা যারা এখানে আছি, তারা সবাই বিষয়টা আগে থেকেই অবগত। তাই কী হয়েছিল সে বিষয়ে না গিয়ে, সরাসরি মূল পর্বে যাওয়াই ভালো।

তৃপ্ত ভাই বললেন, 'রাশেদ আর নাসির! তোদের কারও কিছু বলার আছে?'

দুজনেই চুপ থাকল। কিছু বলল না। এরপর তৃপ্ত ভাই বললেন, 'যা হয়েছে, আমরা ভুলে যাব। বন্ধু বন্ধুর মধ্যে এমন হয়েই থাকে। তবে নাসিরের ক্ষমা চাইতে হবে।'

তৃপ্ত ভাইয়ের কথা শুনে আশ্চর্য হওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই! যে ছেলেটা মিছেমিছি নাসিরকে আঘাত করল, তাকে কিছু করতে হবে না; উল্টো নাসিরকে ক্ষমা চাইতে হবে। এ কেমন বিচার! তাই ফারিস বলে উঠল, 'নাসিরের ক্ষমা চাইতে হবে, বিষয়টা বুঝলাম না ভাই!'

তৃপ্ত ভাই নাস্তিক টাইপের লোক, তা আমাদের অজানা নয়। তাই তিনি আরেক

নাস্তিকের পক্ষ নেবেন এটাই স্বাভাবিক। তবে নাস্তিকরা বরাবর দাবি করে থাকে, তারা নাকি আস্তিকদের থেকে অধিক সৎ! কিন্তু তৃপ্ত ভাই কিংবা রাশেদকে সততা অবলম্বন করতে খুব কমই দেখেছি। আজও তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

ফারিসের প্রশ্নের জবাবে তৃপ্ত ভাই বললেন, 'না বোঝার কী আছে? নাসির মিথ্যা বলে রাশেদকে রাগিয়েছে। রাশেদ তার প্রতিবাদ করেছে। নাসির যদি ওই কথা না বলত, তাহলে কি রাশেদ ওর ওপর হাত উঠাত? দোষটা নাসিরেরই।'

বাহ! কী সুন্দর ফয়সালা। শুনেই তো আমার জ্বালা করছিল। নাসির যদি মিথ্যে কিছু বলত, তাহলে তৃপ্ত ভাইয়ের কথা মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু সত্য বললে কারও যদি গায়ে লাগে—এর জন্যে কি সত্যবাদীকে ক্ষমা চাইতে হবে? কী আশ্চর্য!

ফারিস বলল, 'ভাই, আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'কী?'

'যদি নাসিরের বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে নাসির ক্ষমা চাইবে। আর যদি নাসিরের কথা সত্য প্রমাণিত হয়, তবে রাশেদ ক্ষমা চাইবে।'

তৃপ্ত ভাই অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'তুইও কি বলতে চাস—ডারউইনিজমের অনুসারীরা সন্ত্রাসী? অশান্তির মূল হোতা?'

ফারিস কিছু বলল না। তৃপ্ত ভাই বললেন, 'আচ্ছা, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুই কি নাসিরের কথা সত্য প্রমাণ করতে পারবি?'

তৃপ্ত ভাইয়ের কথা শুনে রাশেদের পক্ষের লোকেরা বেশ খুশি হলো। ওরা হয়তো ধরেই নিয়েছে—রাশেদের জয় হবে। নাসির পরাজিত হবে। এরপর ক্ষমা চাইবে। আর রণে ভঙ্গ দিয়ে ফারিস চলে যাবে। মাথা নিচু করে। ওরা জানেও না, সত্য কতটা শক্তিশালী হয়। আর যারা সত্যের পক্ষে লড়াই করে, তারা কতটা আত্মবিশ্বাসী হয়।

ফারিস বলল, 'ইনশাআল্লাহ পারব।'

'আচ্ছা, তো হয়ে যাক প্রমাণ।'

ফারিস শুরু করল, 'ডারউইনের মতবাদের অন্যতম একটি স্লোগান ছিল—জীবের অস্তিত্বের জন্যে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে শক্তিশালী বিজয়ী হবে এবং দুর্বল পরাজিত হবে। ডারউইনের মতবাদ এটিকে প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। প্রকৃতিতে অস্তিত্বের সংগ্রাম ডারউইনিজমের অন্যতম দিক। এর ফলে শক্তিশালীদের মনে দুর্বলদের বিনাশ করার মানসিকতার সৃষ্টি হয়। বিশ্বে শুরু হয় দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার। কেননা, বেঁচে থাকার সংগ্রামে তারই বিশ্বে টিকে

থাকার অধিকার রয়েছে, যে অপরের তুলনায় অধিক শক্তিশালী।'

পাশ থেকে রাশেদ বলে উঠল, 'তোর কথাগুলো ডারউইনের কোন বক্তব্য থেকে নেওয়া?'

ফারিস বলল, 'তুই তো নিশ্চয়ই ডারউইনের *The Origin of Species* বইটা পড়েছিস?'

কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে মানুষ মিথ্যে বলে তার ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতে চায়। রাশেদও এমন একটি পর্যায়ে আছে। মিথ্যে না বলে তার উপায়ও নেই। তাই সে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। অবশ্যি রাশেদ যে বইটা পড়েনি, তা আমি নিশ্চিত। এর আগেও বইটা নিয়ে তার সাথে কথা হয়েছিল। কিন্তু বইটা সম্পর্কে সে তেমন কিছুই বলতে পারেনি।

ফারিস বলল, '*The Origin of Species* বইটার একটি বক্তব্য এমন—The Origin of Species by means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Race in the Struggle for Life."[১১]

তৃপ্ত ভাই বললেন, 'এখানে সমস্যা তো কোথাও দেখছি না।'

ফারিস বলল, 'এখানেই তো বিরাট সমস্যা ভাই! ডারউইন বোঝাতে চেয়েছেন প্রকৃতিতে তারাই টিকে থাকবে—যারা অধিক শক্তিশালী। অপেক্ষাকৃত দুর্বলরা নিঃশেষ হয়ে যাবে। ডারউইন এটাকে প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম বলে প্রচার করেন। তাঁর এই আত্মঘাতী মতবাদ—সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী ও অন্যান্য বস্তুবাদী সমাজগুলো গ্রহণ করে। যে সমাজগুলো নীতিহীন শোষণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তক ছিল। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিরও দরকার ছিল। ডারউইনের বক্তব্যের মধ্যেই তারা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজে পেয়েছিল। এ মতবাদকেই সবল মানুষগুলো দুর্বলদের ওপর অত্যাচার চালানোর প্রাকৃতিক কারণ হিসেবে চালিয়ে দিত।'

'এটা কেবল তোর দাবি। এ দাবির কোনও যৌক্তিক ভিত্তি নেই।'

তৃপ্ত ভাইয়ের প্রশ্ন শুনে ফারিস মুচকি হেসে বলল, 'না ভাই! এটা আমার দাবি নয়। অনেক বিজ্ঞানীর বক্তব্য ঘেঁটেই আমি এ কথা বলছি।'

পাশ থেকে মিসবাহ ফারিসকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'তোর কথার প্রমাণ চাই। প্রমাণ ছাড়া আমরা কোনও কথাই বিশ্বাস করব না।'

তৃপ্ত ভাই মিসবাহর সাথে একাত্মতা পোষণ করলেন। ফারিস বলল, 'ঠিক আছে,

[১১] 'প্রাকৃতিক নির্বাচনপ্রক্রিয়ার মধ্যে প্রজাতিসমূহের উৎপত্তি অথবা জীবনসংগ্রামে আনুকূল্যপ্রাপ্ত প্রজাতিসমূহের সংরক্ষণ।'

আমি প্রমাণ দিচ্ছি। আমেরিকার প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী ও জীবাশ্মবিজ্ঞানী Stephen Jay Gould বলেছেন, "এর ফলে[১২] দাসপ্রথা, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ, শ্রেণিসংগ্রাম, লিঙ্গবৈষম্য প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচার বিজ্ঞানের নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।"'[১৩]

ইতিহাসের অধ্যাপক Jacques Barzun তাঁর লিখা *Darwin, Marx, Wagner* বইতে বর্তমান বিশ্বের নৈতিকতার অধঃপতনের কারণ আলোচনা করেছেন। তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ডারউইনিজমের প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "১৮৭০ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশের যুদ্ধবাজ রাজনৈতিক চাচ্ছিল অস্ত্র। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী দল চাচ্ছিল নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা। রাজতন্ত্রবাদীদের দাবি ছিল অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর ওপর প্রাধান্যবিস্তার। সমাজতন্ত্রীদের দাবি ছিল ক্ষমতা দখল করা। বর্ণবাদীদের দাবি ছিল বিরোধীদের অভ্যন্তরীণ বহিষ্কার। এ সকল মতাদর্শই কোনও না-কোনওভাবে তাদের চিন্তাধারার স্বপক্ষে ডারউইনিজমকে ব্যবহার করে। ডারউইন ও স্পেনসার বিষয়টি পূর্বেই উপস্থাপন করেছিলেন। এতে বলা হয়েছে—যেহেতু কোনও বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব জীববিজ্ঞানের একটি বিষয়, সেহেতু তা মানবসমাজ সম্পর্কিত। তাই এটা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, এটাই ডারউইনিজম।"'[১৪]

তৃপ্ত ভাই বললেন, 'দু-একজন বিচ্ছিন্ন লোকের বক্তব্য তোর কথাকে সত্য প্রমাণ করে না। ডারউইনিজম একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদ। এ মতবাদ গ্রহণ করলেই সে সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িয়ে পড়বে, আমার কাছে কখনোই এমনটা মনে হয় না। বিজ্ঞানের তো আরও অনেক মতবাদ আছে। সেগুলোর কোনওটাই মানুষকে সন্ত্রাসবাদের দিকে উদ্বুদ্ধ করল না, কেবল ডারউইনিজম করল? কথাটা কেমন একপেশে হয়ে গেল না? আমার মনে হয় কী ফারিস, তোরা ডারইনিজমের বিরোধিতা করিস অন্য কারণে। এই মতবাদ গ্রহণ করলে যে, ধর্ম নামক শেকলটা আর মানুষের পায়ে লাগাতে পারবি না!'

ফারিস অত্যন্ত মনযোগসহকারে তৃপ্ত ভাইয়ের কথা শুনল। এরপর বলল, 'ভাই, অন্য এমন কোনও বৈজ্ঞানিক মতামত নেই, যেখানে বলা আছে—প্রকৃতিতে কেবল তারাই টিকে থাকবে, যারা অধিকতর শক্তিধর। তবুও আপনি যেহেতু আরও প্রমাণ চাচ্ছেন, ঠিক আছে। আমি প্রমাণ দিচ্ছি।'

---

[১২] ডারউইনের বিবর্তনবাদ

[১৩] "subsequent arguments for slavery, colonialism, racial differences, class struggles, and sex roles would go forth primarily under the banner of science."

[১৪] " in every European country between 1870 and 1914 there was a war party demanding armaments, an individualist party demanding ruthless competition, an imperialist party demanding a free hand over backward peoples, a socialist party demanding the conquest of power, and a racialist party demanding internal purges against aliensall of them, when appeals to greed and glory failed, or even before, invoked Spencer and Darwin, which was to say, science incarnate Race was biological, it was sociological, it was Darwinian."

এ কথা বলে ফারিস ওর নোটবুক বের করল। দুনিয়ার শত ইনফরমেশন যেখানে নোট করা আছে। নোটবুকের ক-পাতা উল্টিয়ে ফারিস বলল, 'কলম্বাস তাঁর আমেরিকা যাত্রার সময় দাবি করেন—"কোনও কোনও জনগোষ্ঠী অর্ধ পশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।" তাঁর দৃষ্টিতে আমেরিকার অধিবাসীরা মানুষ ছিল না। তারা ছিল উন্নত প্রজাতির পশু। তিনি যে সব দেশগুলো আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলোকে এ ধারণা থেকেই উপনিবেশে পরিণত করেন। নেটিভ আমেরিকানদের কৃতদাস হিসেবে ব্যবহার করেন। দাস-ব্যবসা শুরুর কৃতিত্ব সম্পূর্ণটাই তাঁর প্রাপ্য। কলম্বাস যখন আইসল্যান্ডে প্রথম আসেন, তখন এর জনসংখ্যা ছিল দু-লক্ষ। বিশ বছর পর এ সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার। ১৫৪০ সালে তা এক হাজারে নেমে আসে।

ঐতিহাসিকগণের হিসাব অনুযায়ী—কলম্বাস এ মহাদেশে আসার পর, ১০০ বছরের কম সময়ের মধ্যে ৯৫ মিলিয়ন লোককে হত্যা করা হয়। কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন তখন নেটিভরা ছিল ৩০ মিলিয়ন। গণহত্যার কারণে তা দু-মিলিয়নে নেমে যায়। এই ব্যাপক ও নিষ্ঠুর গণহত্যার কারণ হচ্ছে, নেটিভ আমেরিকানদের তাঁরা মানুষ হিসেবে নয় পশু হিসেবে বিবেচনা করতেন।'

'তুই তো উপনিবেশবাদীদের চ্যাপ্টারে চলে গেলি। আমরা তো কথা বলছি ডারউইনিজম নিয়ে; উপনিবেশবাদ নিয়ে নয়।'

'আমি নতুন চ্যাপ্টার খুলিনি। সাম্রাজ্যবাদীদের নির্যাতনের সাথে ডারউইনিজম-এর সম্পর্ক আছে। তাই আমি কথাগুলো বলেছি।'

'কীভাবে?'

'উপনিবেশবাদ থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে গ্রেট ব্রিটেন। ব্রিটেন নিজের স্বার্থে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। শোষণপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ব্রিটেনের এই নিপীড়নমূলক নীতি সঠিক প্রমাণ করার দায়িত্ব ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকদের ওপর বর্তায়।

তাদের পক্ষে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দাঁড় করান ডারউইন। ডারউইন দাবি করেন—বিবর্তনবাদের বিভিন্ন স্তরে, একটি শ্রেষ্ঠ মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় আছে। এ সকল উন্নত প্রাণী হলো শ্বেতাঙ্গ প্রজাতি। তিনি এও যুক্তি দেন, অন্যান্যদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার, অবিচার ও নিষ্ঠুর আচরণ হলো একটি প্রাকৃতিক আইন। ভিক্টোরিয়ান যুগের গ্রেট ব্রিটেন, এ মতামতকে অত্যাচারের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক কারণ হিসেবে ব্যবহার করে।'

'দেখ ফারিস, এগুলো হলো তোর যুক্তি। যার কোনওটাই তেমন শক্তিশালী

নয়। ভিক্টোরিয়া যুগের ব্রিটেন ডারউনিজমকে নয়, তাদের সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করে—নিপীড়ন চালিয়েছে।'

'যদি আমার দাবির পক্ষে বিজ্ঞানীদের মতামত দেখাতে পারি, তাহলে কি মেনে নেবেন?'

'আগে শুনিই না, কোন সাইন্টিস্ট তোর পক্ষে কথা বলেছেন।'

'প্রখ্যাত চীনা বিজ্ঞানী Kenneth J. Hsu, যিনি Swiss Federal Institute of Technology-এর জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের প্রধান। তিনি বিষয়টি নিয়ে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এরপর বলেছেন, "আর এ সকল কর্মকাণ্ডই করা হয়েছে প্রতিযোগিতা (মুক্ত বাণিজ্য) এবং যোগ্যতমদের টিকে থাকার নীতি বাস্তবায়নের নামে।"'[১৫]

'তুই কি বিরোধীপক্ষের বক্তব্য দিয়ে নিজেকে জয়ী করতে চাচ্ছিস?'

'না, ভাই! তা হবে কেন?'

'তাহলে Kenneth J. Hsu-এর বক্তব্য না এনে অন্য কারও মতামত আনলি না কেন?'

'আমি তো এখনো শেষ করিনি ভাই।'

'আচ্ছা বল।'

ফারিস নোটবুকের ক-পাতা উল্টিয়ে বলল, 'বিখ্যাত ঐতিহাসিক James Joll তাঁর লেখা *Europe Since* নামক বইতে বিবর্তনবাদ, বর্ণবাদ, সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক বর্ণনা করে লিখেছেন, "সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান উৎসাহব্যঞ্জক মতবাদ হলো—সাধারণভাবে যাকে সামাজিক ডারউইনবাদ হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। এ মতাবাদে অস্তিত্বের জন্যে রাষ্ট্রসমূহ এক চিরস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত। কোনও মনুষ্য প্রজাতিকে অন্যদের চেয়ে বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত। এবং এ সংগ্রামে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রজাতি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সব সময় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে।"'[১৬]

তৃপ্ত ভাই যখন ফারিসের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন ফারিস জানালো—James Joll দীর্ঘদিন যাবৎ অক্সফোর্ড, স্ট্যানফোর্ড ও হ্যাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। এ কথা শোনার পর তৃপ্ত ভাই বলার মতো

[১৫] "all in the name of competition (in free trade) and survival of the fittest."
[১৬] "The most profound groups of ideas inspiring the concept ofimperialism were those which can be roughly classified as'social Darwinism', and which saw the relations betweenstates as a perpetual struggle for survival in which someraces were regarded as superior to others in an evolutionaryprocess in which the strongest had constantlyto assert themselves."

কিছু পেলেন না। ফারিস আরও বলল, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কিদের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের হত্যাযজ্ঞের পেছনেও ডারউইনিজম দায়ী।'

তৃপ্ত ভাই এবার নড়েচড়ে বসলেন। এরপর বললেন, 'জোড়াতালি দিয়ে কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করিস না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কেন হয়েছিল তা তুইও জানিস। ডারউইনিজমের সাথে সে যুদ্ধের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'আমি যদি সম্পর্ক দেখাতে পারি?'

'আচ্ছা, দেখা তোর সম্পর্ক!'

'ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইনবাদ সাম্রাজ্যবাদীদের বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারে পরিণত হয়। তারা তুর্কিদের অনুন্নত জাতি হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী William Gladstone প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন—"তুর্কি জনগোষ্ঠী মনুষ্য প্রজাতির সদস্যই নয় বা মনুষ্য পদবাচ্য নয়, এবং মানবসভ্যতার স্বার্থে, তাদের এশিয়ার Steppes অঞ্চলে বিতাড়িত এবং Anatolia থেকে অপনীত করা উচিত।"'[১৭]

'William Gladstone-এর বক্তব্যের সাথে ডারউইনিজমের কী সম্পর্ক? নাকি তুই বলতে চাচ্ছিস, ডারউইনের কোনও বক্তব্য থেকে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন?'

'হ্যাঁ ভাই! আপনি ঠিকই ধরেছেন। ডারউইনের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়েই William Gladstone এই মন্তব্য করেছেন।'

'হোয়াট? ডারউইনের এমন কোনও বক্তব্য আমি পাইনি, যা দিয়ে তোর দাবি মেনে নেওয়া যায়।'

তৃপ্ত ভাইয়ের ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে, ডারউইনের লেখা সব বই তিনি পড়ে ফেলেছেন। কোনও কিছু বাদ রাখেননি। তবে বেশি ভাব নেওয়া মাঝে মাঝে বিপদের কারণ হতে পারে। তৃপ্ত ভাইয়ের ক্ষেত্রেও এমন হয় কি না, দেখার বিষয়!

ফারিস ওর ব্যাগ থেকে একটি বই বের করল। এরপর বলল, 'এই বইটার মধ্যে তুর্কিদের সম্পর্কে ডারউইন মতামত প্রদান করেন, ১৮৮৮ সালে। বইটার নাম *The Life and Letters of Charles Darwin.* এ বইয়ের কয়েকটি লাইন আমি অনুবাদ করে শোনাচ্ছি—"আমি যদি আপনাকে সভ্যতার উন্নয়নপ্রক্রিয়ার প্রাকৃতিক নির্বাচনের সংগ্রাম এবং এর ধারাবাহিক ভূমিকা উল্লেখ করি, তা বিশ্বাস করাই আপনার জন্যে কঠিন হবে। স্মরণ করুন, কয়েক শতক পূর্বে তুর্কিদের দ্বারা বিপর্যস্ত হওয়ার আতঙ্কের ঝুঁকির মধ্যে ইউরোপ সময় কাটিয়েছে। আর বর্তমানে যা একটি হাস্যকর

[১৭] "The Turks are examples of mankind's non-humans, and for the sake of their civilization, they must be pushed back to the Asian steppes and eliminated from Anatolia."

ব্যাপার। এ অস্তিত্বের সংগ্রামে অধিকতর সুসভ্য ককেশীয়[১৮] প্রজাতি অন্তঃসারবিহীন তুর্কিদের পরাজিত করেছে। এভাবে শীঘ্রই কত অনুন্নত প্রজাতি যে উন্নত ও সুসভ্য প্রজাতির দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তার ইয়ত্তা নেই।”[১৯]

ডারউইনের এ দাবি, ওই সময়ে ওসমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে—সাম্রাজ্যবাদীদের দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। যদি কথাটির দিকে একটু গভীর দৃষ্টি দেন, তাহলে দেখবেন—তুর্কিদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে তিনি সহজাত বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিবর্তনবাদের ফলেই এমনটি ঘটবে।

এর মাধ্যমে তিনি তুর্কিদের নির্মূল করার ভুয়া বৈজ্ঞানিক মতবাদ দাঁড় করান। ব্রিটেন তুর্কিদের বিরুদ্ধে ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের ব্যবহার করে। তাদের বোঝানো হয়েছিল—ব্রিটেনের বিপক্ষ নেওয়া তাদের জন্যে সম্মানজনক নয়। তুর্কিরা হলো অনুন্নত জাতি, ব্রিটেন উন্নত। তাদের এই হিংসাত্মক মনোভাবের কারণে, এ যুদ্ধে তুর্কি সেনাবাহিনীর আড়াই লাখ সেনা নিহত হয়।'

'দেখ ফারিস, এসব বিচ্ছিন্ন দু-একটা মন্তব্যকে তুই ডারউইনিজমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারিস না। সাম্রাজ্যবাদীরা কখনোই এ কথা বলেনি, তাদের রাষ্ট্র ডারউইনিজমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের সন্ত্রাসবাদের কারণ ডারউইনিজম নয়—সাম্রাজ্যবাদ। এখানে ডারউইনিজম কোনওভাবেই দায়ী নয়।'

'আপনার কথার সাথে আমি একটু দ্বিমত পোষণ করছি।'

'কেন?'

'কারণ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় খুনিরা, রাষ্ট্রীয়ভাবে ডারউইনিজমকে ব্যবহার করেছে তাদের পক্ষের বৈজ্ঞানিক যুক্তি হিসেবে।'

ফারিসের কথা শুনে রাশেদ বলে উঠল, 'তোর কথার প্রমাণ কী?'

ফারিস বলল, 'প্রমাণ হচ্ছে—গণচীন।'

'গণচীনে তো সমাজতন্ত্র ছিল। ডারউইনিজমকে টানছিস কেন?'

'ডারউইনিজমকে টানছি এই জন্যে, গণচীন ডারউইনিজমের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।'

---

[১৮] ইউরোপীয়

[১৯] "I could show fight on natural selection having done and doing more for theprogress of civilization than you seem inclined to admit. Remember whatrisk the nations of Europe ran, not so many centuries ago of being overwhelmedby the Turks, and how ridiculous such an idea now is! The morecivilized so-called Caucasianraces have beaten the Turkish hollow in thestruggle for existence. Looking to the world at no very distant date, what anendless number of the lower races will have been eliminated by the highercivilized races throughout the world."

'এটা হাস্যকর দাবি।'

'হাস্যকর হতে যাবে কেন? মাও সেতুং যদি নিজ মুখেই এই কথা স্বীকার করেন, তবুও এটা হাস্যকর মনে হবে? মাও সেতুং তো নিজেই এ ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "চীনা সমাজতন্ত্র ডারউইন ও তাঁর বিবর্তনবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"'[২০]

সত্যকে জানার পরও কিছু মানুষ তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ, তারা সত্যকে ভয় পায়। রাশেদ তাদেরই একজন। ফারিস ওকে যতই বোঝাচ্ছে, ও ততই প্যাঁচিয়ে যাচ্ছে। তাই ফারিস বলল, 'আচ্ছা, তুই এবার থাম! আমি তোকে আরও একটি উদাহরণ দিচ্ছি। তার আগে আমাকে বল, তুই স্ট্যালিনকে চিনিস কি না?'

রাশেদ জবাব দিলো, 'এটা কোনও প্রশ্ন হলো? তাঁকে কে না চেনে? সবাই চেনে। আমি চিনব না!'

'স্ট্যালিনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের উদাহরণ আমি এখানে দিতে চাচ্ছি না। কেবল এতটুকুই বলব, স্ট্যালিনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের পেছনেও ডারউইনিজম দায়ী।'

'কীভাবে?'

'স্ট্যালিন রাষ্ট্রীয়ভাবে ডারউইনিজমকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "জৈব পদার্থের মধ্যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আবিষ্কার হচ্ছে ডারউইনবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়।"'[২১]

'স্ট্যালিনের এই বক্তব্য থেকে কি তোর দাবি সত্য বলে প্রমাণ হয়?'

'আগে তো আমাকে শেষ করতে দে!'

'আচ্ছা বল।'

'স্ট্যালিন আরও বলেন, "কোনও রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই আমরা নির্ভুলভাবে ছাত্রদের তিনটি বিষয় শিক্ষা দিতে চাই। তা হলো—পৃথিবীর বয়স, ভূতাত্ত্বিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও ডারউইনের শিক্ষা।"[২২] তাঁর আরও অনেক বক্তব্য থেকে জানা যায়, তিনিও দুর্বলদের প্রতি অত্যাচার করতেন ডারউইনের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সবলেরা দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করবে। আর দুর্বলরা তা সহ্য করবে। এটা ডারউইনিজমের অন্যতম দাবি। স্ট্যালিন শুধু বড় মাপের একজন হত্যাকারীই ছিলেন না, বড় মাপের নাস্তিকও ছিলেন। তাঁর নাস্তিক হওয়ার পেছনেও ডারউইনিজম দায়ী।'

মিসবাহ এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। কেবল হা করে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু

---

[২০] "Chinese socialism is founded upon Darwin and the theory of evolution."
[২১] "Darwin's discovery is the highest triumph of the dialectic in the whole field of organic matter."
[২২] "There are three things that we do to disabuse the minds of our seminary students. We had to teach them the age of the earth, the geologic origin, and Darwin's teachings."

ফারিসের বক্তব্য শুনে বলে উঠল, 'ডারউইনের বই পড়ে তিনি নাস্তিক হয়েছিলেন, এ কথা আমি মানতে পারছি না। আমিও তো ডারউইনের বই পড়েছি। কই, নাস্তিক তো হইনি!'

ফারিস বলল, 'তোর মতো আমিও মানতাম না, যদি স্ট্যালিনের ছোটবেলার বন্ধু আমাদের এ তথ্য দিতেন।'

'কোন তথ্য?'

'স্ট্যালিনের ছোটবেলার বন্ধু G Glurdjidze, *Landmarks in the Life of Stalin* নামক পুস্তিকায় বলেছেন, "শৈশবে তিনি (স্ট্যালিন) যখন গির্জার স্কুলে পড়াশোনা করতেন, তিনি তখন বিদ্রুপাত্মক ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি চার্লস ডারউইনের বইপত্র পড়া শুরু করলেন এবং নাস্তিক হয়ে গেলেন।"'[২৩]

ফারিসের কথা শেষ না হতেই তৃপ্ত ভাই কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'তার মানে তুই এটাই বোঝাতে চাচ্ছিস—ডারউইনিজম সন্ত্রাসবাদের বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার?'

'না, ভাই! আমি বোঝাতে চাইনি। আমি প্রমাণ করে দেখিয়েছি।'

রাশেদ খুব অবজ্ঞার সুরে বলে উঠল, 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী ছিল হিটলার, যার পরোক্ষ কারণে কয়েক কোটি মানুষ নিহত হয়। সে কোত্থেকে প্রেরণা লাভ করেছিল? ডারউইনিজম যদি সন্ত্রাসীদের বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারই হয়, তাহলে হিটলারেরও তো এই হাতিয়ার ব্যবহার করা উচিত ছিল। সে কি তা করেছে?'

'অবশ্যই করেছে।' ফারিসের ঝটপট উত্তর।

তৃপ্ত ভাই বলল, 'তুই কি জোড়াতালি দিয়ে কিছু মেলাতে চাচ্ছিস, ফারিস?'

ফারিস বলল, 'জোড়াতালি দিয়ে মেলাব কেন? যা যৌক্তিকভাবেই মিলে আছে, তা জোড়াতালি দিয়ে মেলানোর কী দরকার?'

'তুই তোর দাবির সত্যতা দেখাতে পারবি?'

'জি, পারব।'

মিসবাহ বলল, 'তাহলে আর দেরি কেন?'

ওরা হয়তো ভেবেছে—ফারিসকে আজ ধরাশায়ী করে ফেলবে। কিন্তু ফারিস আজকের জন্যে কতটা প্রস্তুতি নিয়েছে, তা কেবল আমিই জানি। সেদিন বিকেল থেকে

[২৩] "At a very early age, while still a pupil in the ecclesiastical school, Comrade Stalin developed a critical mind and revolutionary sentiments. He began to read Darwin and became an atheist."

আজ সকাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। ইন্টারনেট ঘেঁটেছে। ফারুক স্যারের বাসায় পর্যন্ত গিয়েছে। স্যারের কাছ থেকে কয়েকটা জার্নালও এনেছে। দু-দিন একটানা ফোন বন্ধ করে রেখেছে। সালাত ছাড়া বাইরে পর্যন্ত বের হয়নি। মিসবাহ ওকে যতই আটকানোর চেষ্টা করুক, লাভ নেই।

মিসবাহর প্রশ্নের জবাবে ফারিস এক ফালি হেসে নিয়ে বলল, 'হিটলার জার্মান জাতিকে সবচেয়ে উঁচু জাতি মনে করতেন। তিনি বলতেন,"নর্ডিক জার্মান জাতিকে বাদ দিলে বাঁদরের নাচ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।"'[২৪]

তৃপ্ত ভাই বললেন, 'তাঁর বক্তব্য কি তোর দাবির পক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যায়?'

ফারিস বলল, 'ভাই, আমি এখনো শেষ করিনি।'

'আচ্ছা, তাহলে বল।'

ফারিস ওর নোটবুক দেখে বলল, 'হিটলার আরও বলেন,"একটি উন্নত প্রজাতি অনুন্নত প্রজাতিকে শাসন করবে। এটা একটি অধিকার যা আমরা প্রকৃতিতে দেখতে পাই। এবং এটাই একমাত্র বোধগম্য ও যুক্তিসঙ্গত অধিকার, যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।"[২৫] উন্নত প্রজাতি অনুন্নত প্রজাতিকে শাসন করার অধিকার প্রাকৃতিকভাবেই লাভ করে, তিনি এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কথার মাধ্যমেই এটা স্পষ্ট হয়। তিনি এও দাবি করেন, এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। আমাদের আর বুঝতে বাকি থাকে না, তিনি এ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কার কাছ থেকে ধার করেছিলেন।'

নাসির এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি, চুপ ছিল। কিন্তু এবার বলে উঠল, 'তার মানে ষাট লাখ ইহুদিকে মারার যৌক্তিকতা, তিনি ডারউইনের মতবাদে পেয়েছিলেন?'

ফারিস বলল, 'হুঁ। ঠিক ধরেছিস। হিটলার ইহুদিদের খুব নিচু প্রজাতি বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন,"ইহুদি জাতি একটি মানবেতর প্রজাতি গোষ্ঠী, যা পূর্বনির্ধারিত জন্মগত অধিকার হিসেবে খারাপ। যেমন নাকি নর্ডিক জার্মান জাতিকে মহৎ কাজের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। ইতিহাস এমন একটি হাজার বছরের মহান সাম্রাজ্য সৃষ্টি করবে, যার ভিত্তি হবে প্রজাতির মর্যাদাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, যা প্রকৃতি কর্তৃক নির্ধারিত।"[২৬]

ধর্মের প্রতি হিটলারের অশ্রদ্ধা দেখে Daniel Gasman তাঁর *Scientific*

[২৪] "Take away the Nordic Germans and nothing remains but the dance of apes."
[২৫] "a higher race subjects to itself a lower race a right which we see in nature and which can be regarded as the sole conceivable right," because it was founded on science."
[২৬] The Jews formed a sub-human counter race, predestined by their biological heritage to evil, just as the Nordic race was designated for nobility Historywould culminate in a newmillennial empire of unparalleled splendour, based on a new racial hierarchy ordained by nature herself.

Origins of Natural Socialism বইতে লিখেছেন, "হিটলার প্রথাগত ধর্মের বিরুদ্ধে এককভাবে জৈবিক বিবর্তনবাদকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি বহুবার খ্রিষ্টধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করেন—এই কারণে যে, ধর্মীয় বিশ্বাস ডারউইনবাদী শিক্ষার পরিপন্থী। হিটলারের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির নির্দেশক হলো ডারউইনিজম।"'[২৭]

আমাদের আলোচনায় টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছিল। বিপক্ষের লোকজন ফারিসের কাছে একেবারে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিল। মনে মনে চাচ্ছিলাম আলোচনা আরও কিছুক্ষণ চলুক। তৃপ্ত ভাই ও তাঁর পক্ষের লোকজন ভুল বুঝতে পারুক। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আমাদের আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটাল।

আমরা রুমের ভেতর ছিলাম, তাই সত্যিকার অর্থে কী ঘটেছিল বলতে পারব না। কেবল ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। তৃপ্ত ভাই দৌড়ে বেড়িয়ে গেলেন। সাথে সাথে রাশেদ আর মিসবাহও দৌড়াল।

তথ্যসূত্র :

♦ ১) Stephen Jay Gould, *The Mismeasure of Man*, (W.W. Norton and Company, New York, 1981).

♦ ২) Jacques Barzun, *Darwin, Marx, Wagner*, (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1958)

♦ ৩) Harun Yahya, *Darwinism Refuted*, (Goodword Books Pvt. Ltd, Nizamuddin West Market, New Delhi, 1st edition, 2000).

♦ ৪) Harun Yahya, *The Disaster Darwinism Brought Humanity*, (Al-Attique Publishers Inc. Canada, 2001).

♦ ৫) L.H. Gann, *Adolf Hitler : The Complete Totalitarian*, (The Inter-collegiate Review, Fall 1985).

♦ ৬) Henry M. Morris, *The Long war Against God*, (Baker Book House, 1989).

♦ ৭) Francis Darwin, *The Life and Letters of Charles Darwin;* (New York D. Appleton and Company).

♦ ৮) J. Tenenbaum., *Race and Reich*, (Twayne Pub., New York, 1956).

♦ ৯) The Road to India and What Has Been Done for the Sake of Oil :

[২৭] Hitler stressed and singled out the idea of biological evolution as the most foremost weapon against traditional religion and he repeatedly condemned Christianity for its opposition to the teaching of evolution . For Hitler, evolution was the hallmark of modern science and culture".

Turkey and Britain.

♦ ১০) Kent Hovind, *The False Religion of Evolution,* http://www.royalse.com/scroll/evolve/ndxng.html

♦ ১১) E. Yaroslavsky, *Landmarks in the Life of Stalin,* (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1940), cited by Paul G. Humber, Stalin's Brutal Faith, Vital articles on Science/Creation October 1987, Impact No. 172.

♦ ১২) War Against Religion, http://www.geocities.com/Heartland/Meadows/1733/book2-ch3.htm .

♦ ১৩) Jerry Bergman, Darwinism and the Nazi Race Holocaust, http://www.trueorigin.org/holocaust.htm).

পাতানো ফাঁদ

[এক]

আমি ফারিসকে বললাম, 'চল, রিকশায় যাই।' ও আমার কথায় পাত্তা দিলো না, হাঁটতে শুরু করল। অগত্যা আমিও ওর পিছু-পিছু ছুটতে লাগলাম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার পর আমরা মারুফদের বাসায় পৌঁছালাম।

মারুফ আমাদের বন্ধু। ছেলেটা সহজ-সরল প্রকৃতির। সারাক্ষণ চুপচাপ থাকে। অন্যদের মতো মুখ দিয়ে কথার খই ফোটে না। বেশ লাজুকও বটে। কিছুদিন আগেও ছেলেটা এগনোস্টিক ছিল। ধর্মের প্রতি উদাসীন ছিল। ফারিসের সাথে অনেক সময় পার করার পর, আবার ইসলামের দিকে ফিরে এসেছে। মারুফের পরিবর্তনের কাহিনি আমাদের গল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তবুও এ বিষয়ে কিছু বলব। এর দরকার আছে।

একবার হঠাৎ করেই স্যার জেনেটিক্স পরীক্ষা নিলেন। কারও প্রস্তুতি ছিল না। কেউ জানতও না সেদিন পরীক্ষা হবে। স্যার এ পরীক্ষার নাম দিয়েছিলেন সারপ্রাইজ পরীক্ষা। আমরা কজন বাদে অনেকেই নকলের সহায়তা নিল। মারুফ আমাদের ক্লাসের থার্ড বয়। ভালো করার জন্যে তাকেও নকল করতে বলা হলো। সে রাজি হলো না। সে বলল, 'নকল করা অন্যায়। তা ছাড়া স্যার আমাকে দেখছেন, আমি কীভাবে নির্লজ্জের মতো নকল করতে পারি?'

পরীক্ষা শেষে ফারিস তাকে বলল, 'মাশাআল্লাহ! পরীক্ষার হলে তুই যেমন সৎ, আল্লাহর সাথেও যদি এমন সৎ হতি, কতই-না ভালো হোতো!'

মারুফ কিছু বলল না। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। ফারিস বলতে লাগল, 'মহান আল্লাহর একটি নাম হলো আল-বাসীর। জানিস, বাসীর শব্দের অর্থ কী?'

আমরা না-সূচক মাথা নাড়লাম। ফারিস উত্তর দিলো। সে বলল, 'বাসীর শব্দের অর্থ সর্বদ্রষ্টা। যিনি সবকিছু দেখেন। কোনও কিছুই তাঁর আড়াল হতে পারে না। আকাশের ওপরে কী আছে, তিনি দেখেন। মাটির নিচে কী আছে, তাও তিনি দেখেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহের

ব্যাপারে অবগত। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ।"[২৮] তিনি আরও বলেছেন, "আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় তিনি অন্তরের কথাগুলোরও খবর রাখেন।"[২৯] আল্লাহকে সামনে রেখে যখন আমরা তাঁর অবাধ্য হই, তখন কেন নিজেকে নির্লজ্জ মনে করি না?'

ফারিসের কথা শুনে মারুফ চুপ হয়ে গেল। ফারিস বলল, 'তিনি কত সুন্দর করে বলেছেন, "তারা কি মনে করে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি।"[৩০] "তারা যা করে, তিনি তাদের কিয়ামত দিবসে তা জানিয়ে দেবেন।"[৩১] বন্ধু, এমন কোনও জায়গা তুই খুঁজে পাবি না, যা আল্লাহর দৃষ্টিকে আড়াল করতে পারে। তিনি তো তোর গলার ধমনি থেকেও কাছে।[৩২]

এ পর্যন্ত বলার পর ফারিস আরেকটি আয়াত বলেছিল, "যে তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে, এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার বাসস্থান।"[৩৩]

ফারিসের কথাগুলো সেদিন মারুফের ওপর অনেক প্রভাব ফেলেছিল। এরপর থেকে সে আর সালাত ছাড়েনি। মারুফের পরিবর্তনে বেশি খুশি হয়েছেন তার মা। তিনিই আমাদের দাওয়াত করেছেন। তাই বেড়াতে আসা।

সদর দরজা খোলাই ছিল। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। দোতলা বাড়ি। সদর দরজা থেকে একেবারে থাকার ঘর পর্যন্ত একটি সরু ইটের রাস্তা। রাস্তার দু-পাশে ঝাউগাছ। কিঞ্চিৎ দূরে গোলাকার করে বানানো একটি বৈঠকখানা। আরেকটু দূরে একটি মস্ত পুকুর। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানান প্রজাতির ফুল আর ফলের গাছপালা। ঔষধী গাছও আছে। ঘৃতকুমারী গাছ চোখে পড়ার মতো।

আমি কলিংবেল চাপলাম। ভেতর থেকে মারুফ এসে দরজা খুলে দিলো। আমরা মারুফের রুমে গিয়ে বসলাম। মিনিট দশেক পর একজন বৃদ্ধ লোক প্রবেশ করলেন। হাতে তার বাহারি রঙের খাবার। এত খাবার দেখে ফারিস রাগ করলো। ফারিসকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মারুফ বলল, 'এগুলোর একটাও আমি করতে বলিনি। সব আব্বুর আদেশে তৈরি করা হয়েছে। তোরা আসবি—সেটা আব্বুকে আগেই জানিয়েছিলাম। তিনিই এসবের ব্যবস্থা করেছেন। আমার কোনও দোষ নেই।'

ফারিস বলল, 'হয়েছে হয়েছে। আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকা লাগবে না।'

---

[২৮] সূরা আল-আন'আম, (০৩) : ১০৩ আয়াত।
[২৯] সূরা মা'ঈদা, (০৫) : ০৭ আয়াত।
[৩০] সূরা আয-যুখরুফ,'(৪৩) : ৮০ আয়াত।
[৩১] সূরা মুজাদালাহ, (৫৮) : ০৭ আয়াত।
[৩২] সূরা কাফ, (৫০) : ১৬ আয়াত।
[৩৩] সূরা আন-নাযি'আত, (৭৯) : ৪০-৪১ আয়াত।

খেতে খেতে মারুফ জানালো, আন্টি ফারিসের সাথে কথা বলতে চান। ফারিস রাজি হলো। খাওয়া শেষ হলে ফারিস আন্টির সাথে কথা বলল। পর্দার আড়াল থেকে। আন্টি ফারিসকে বললেন, 'ছেলেটাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার চিন্তা দূর করেছেন। তোমার জন্যে দোয়া রইল বাবা। আমার এখন একটাই চিন্তা, ওর বাবাকে নিয়ে। শুনেছি তুমি অনেক কিছু জানো। তোমার আংকেলের সাথে একটু কথা বলে দেখবে?'

ফারিস বলল, 'আংকেল কি ইসলামকে অপছন্দ করেন?'

পর্দার ওপাশ থেকে আন্টি জবাব দিলেন, 'না বাবা। উনি মুক্তচিন্তার মানুষ। মানুষের কাজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। পরিবারের কাউকেই কোনও কাজে বাধা দেন না।'

ফারিস বলল, 'হিদায়াত তো আল্লাহর হাতে। তবুও আপনি যেহেতু বলেছেন, আমি কথা বলব ইনশাআল্লাহ।'

আন্টি চলে যাওয়া কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ লোকটি এলেন। এসে বললেন, 'বড় সাহেব বাইরের বৈঠকখানায় অপেক্ষা করছেন। আপনাদের যেতে বলেছেন।'

[দুই]

গোলাকার একটি টেবিল পাতা। টেবিলের ওপাশের চেয়ারে আংকেল বসা। এপাশে তিনটি চেয়ার রাখা। চেয়ারগুলো কাঠের। ফারিস মাঝের চেয়ারটিতে বসল। আমি আর মারুফ দু-পাশের দুটিতে। মারুফ আমাদের আংকেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ লোকটি ট্রেতে করে কি যেন নিয়ে এল। এটা জুস না শরবত, তা বুঝা মুশকিল।

বৃদ্ধ লোকটি চলে যাওয়ার পর আংকেল বললেন, 'এটা ঘৃতকুমারী আর মধু দিয়ে বানানো শরবত। বেশ উপকারী। নাও।'

আমি ভয়ে ভয়ে গ্লাসটা হাতে নিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, খেলে হয়ত বমি করব। কিন্তু এক চুমুক দেওয়ার পর সে ভয়টা কেটে গেল।

আংকেল আবার বললেন, 'মারুফের মুখে ফারিসের কথা অনেক শুনেছি। আজ তোমাকে দেখলাম। যুবক বয়সেই ধর্মীয় বেশভূষা ধরেছ। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলছ। ভালো। ভালো লাগছে তোমাদের দেখে। ধর্মের প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ নেই। তবে ধর্মের কিছু কিছু দিক আমার কাছে এক্সট্রিম মনে হয়। এই আরকি।'

ফারিস গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

আংকেল জবাব দিলেন, 'শিওর। হোয়াই নট?'

'ধর্মের কোন কোন দিক আপনার কাছে এক্সট্রিম মনে হয়?'

'আমার জন্ম যেহেতু মুসলিম পরিবারে, তাই ইসলামের কথাই বলি। ইসলাম তার অনুসারীদের বাধ্য করে ধর্মের আইনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। এর জন্যে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে। এই রুলটা আমার কাছে এক্সট্রিম মনে হয়।'

আংকেলের কথা শুনে ফারিস কিছুটা নীরব হয়ে গেল। ফারিস ভালো চিন্তা করতে পারে। হয়ত চিন্তার সাগরে ডুব দিল। আংকেলের প্রশ্নের যৌক্তিক একটা জবাব সে দেবে, এ আমার বিশ্বাস।

আংকেল টেবিলে থাকা পত্রিকাটি হাতে তুলে নিলেন। এরপর বললেন, 'এখন পত্রিকা পড়ে আর মজা পাই না। আগে পেতাম। পাকিস্তান আমলে। তখন পত্রিকা ছিল কম, কিন্তু ভালো ভালো খবর ছাপা হত। সে সময়ে পত্রিকা ছিল জ্ঞানের মাধ্যম। আর এখন! এখন তো বিনোদন ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। যাও কিছু খবর থাকে, সেখানেও আবার খুন, ধর্ষন, গুম এসব দিয়েই ভর্তি।'

আংকেল পত্রিকাটি টেবিলে রাখতেই ফারিস সেটা তুলে নিলো। পেছনের পৃষ্ঠাটা আংকেলকে দেখিয়ে বলল, 'এই খবরটা দেখেছেন আংকেল?'

'কোনটা বাবা? ১% লোকের হাতে বিশ্বের মোট ৪০ ভাগ সম্পদ, এই খবরটা?'

'জি আংকেল। এটা।'

'খবরটা পড়ার সময় খুব আফসোস করেছি। এ জন্যেই কি আমরা যুদ্ধ করলাম?'

'আপনি শুনলে হয়ত আরও কষ্ট পাবেন, ২০১৫ সালের জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ওয়েলথ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, মাত্র ১% মানুষের হাতে বন্দী আছে ৫০% সম্পদ।'

'তার মানে গত নয় বছরে এক ভাগ ধনীর সম্পদ, দশ শতাংশ বেড়ে গেছে?'

'জি আংকেল। ঘুরিয়ে বললে, এই নয় বছরে ৯৯ ভাগ মানুষের সম্পদ দশ শতাংশ কমে গেছে। আরও মজার বিষয় হলো—বিশ্বের মাত্র ৩০০ জন ধনী, সবচেয়ে দরিদ্র ৩ বিলিয়ন মানুষের সমান সম্পদ দখল করে রেখেছে।'

'তাদের সম্পদের পরিমাণ তো তাহলে ইন্ডিয়া, চীন, আমেরিকা, ব্রাজিলের মোট সম্পদের চাইতেও বেশি?'

'জি, সেটাই। আংকেল, আরেকটা প্রশ্ন করি?'

'হ্যাঁ করো।'

‘থাংকয়্যু। বর্তমান বিশ্বে মোড়লের ভূমিকা পালন করে কোন দেশ?’

‘ইট’স ভেরি সিমপল মাই সান। এভরিবডি নোস দিস। আমেরিকা।’

‘আমেরিকায় অর্থনৈতিক বৈষম্য কেমন, জানেন আংকেল?’

‘না বাবা। বলতে পারব না।’

‘মোট সম্পদের ৩৫ ভাগ দখল করে আছে মাত্র ১% আমেরিকান। উচ্চ-মধ্যবিত্ত আমেরিকানরা ধরে আছে ১১ ভাগ। এদের সংখ্যা ২০%। আর সবচেয়ে নিচুস্তরের, যাদের সংখ্যা ৪০%, তাদের কাছে আছে এক ভাগেরও কম। সবচেয়ে ধনী মাত্র চার শ আমেরিকানের সম্পদ, মোট সম্পদের অর্ধেকের চাইতেও বেশি। এটা তো গেল আমেরিকার কথা। সম্পদের বৈশ্বিক বৈষম্যটা কেমন, জানেন আংকেল?’

‘পত্রপত্রিকায় একটু একটু পড়েছিলাম। ৮০% লোকের কাছে নাকি, মাত্র ৬ শতাংশ সম্পদ আছে?’

‘হ্যাঁ আংকেল। বাদবাকি ৯৪ ভাগ সম্পদ ধনী দেশগুলোর হাতে। সম্পদের এই বৈষম্যের দিকটা প্রথম ফুটে ওঠে ২০০৭ সালে। এর আগ পর্যন্ত বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল। আস্তে আস্তে এই বৈষম্য আরও বাড়তে থাকে। ২০১১-তে তা প্রকট আকার ধারণ করে।’

‘ধনী দেশগুলোর মাথাপিছু আয়ও তো বেশি।’

‘হ্যাঁ আংকেল। ওদের মাথাপিছু আয় এক লাখ ডলার। আর দরিদ্র দেশগুলোর মাত্র এক হাজার ডলার। যাদের মধ্যে ২০% এর দৈনিক আয় হলো ১.২৫ ডলারেরও কম। পৃথিবীতে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কী হারে বাড়ছে, তা আন্দাজ করার জন্যে—এই পরিসংখ্যানই যথেষ্ট।’

‘স্ট্রেইঞ্জ! এভাবে তো ভেবে দেখিনি।’

‘আমাদের অনেকের কাছেই বিষয়গুলো ক্লিয়ার না। অথচ এটা তুচ্ছ বিষয় নয়। নোবেল বিজয়ী মানবাধিকার কর্মী কৈলাস সত্যার্থী মনে করেন, বিশ্বব্যাপী আয়বৈষম্য অর্থনৈতিক সহিংসতার রূপ পেয়েছে। এই সহিংসতা মানবজাতির নিরাপত্তা ও শান্তির জন্যে বড় ধরনের হুমকি।’

আংকেল গ্লাসে চুমুক দিয়ে ফারিসকে প্রশ্ন করলেন, ‘আচ্ছা বাবা, ধনী দেশগুলো তো অনুদান দেওয়ার মাধ্যমে এই বৈষম্য কমানোর চেষ্টা করে। তাই না?’

‘হ্যাঁ, করে।’

‘তাহলে তাদের দোষ দিয়ে লাভ কী? তারা তো দারিদ্র্যবিমোচনে সহায়তা করে

যাচ্ছে।’

‘তাদের দোষ দেওয়া যেত না, যদি বৈষম্য কমানোর জন্যেই তারা অনুদান দিত। তারা অনুদান দেয় অন্য কারণে। প্রতিবছর ধনী দেশগুলো প্রায় ১৩০ বিলিয়ন ডলার অনুদান দেয়। কিন্তু তার পরেও দরিদ্র দেশগুলোর তেমন উন্নতি হয় না। কেবল ধনীরাই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। এর পেছনে অবশ্যই একটা বড় কারণ জড়িয়ে আছে।’

‘তুমি কি ট্রেড মিসপ্রাইসিং-কে এর জন্যে দায়ী করতে চাও?’

‘জি আংকেল। এটা অন্যতম একটা কারণ। এর মাধ্যমে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলো, দরিদ্র দেশ থেকে প্রতিবছর ৯০০ বিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ঋণের বিপরীতে বছরে সুদ আসছে—৬০০ বিলিয়ন ডলার। যার বোঝা গরিব দেশগুলোকে বইতে হচ্ছে। এ ছাড়া ধনী দেশগুলোর ঠিক করা বাণিজ্যনীতির কারণে, দরিদ্র দেশগুলো প্রতিবছর ৫০০ বিলিয়ন ডলার হারাচ্ছে। ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটসের অর্থনিতিবিদদের দেওয়া তথ্য এটি। সব মিলিয়ে মোট কত টাকা তারা হাতিয়ে নিচ্ছে, জানেন আংকেল?’

‘না বাবা। কত?’

‘২ ট্রিলিয়ন ডলার।’

মারুফ মাত্র গ্লাসে চুমুক দিয়েছিল। ফারিসের কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, ‘২ ট্রিলিয়ন ডলার!’

ফারিস বলল, ‘হ্যাঁ। প্রতিবছর ওরা ২ ট্রিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে।’

ফারিসের কথাগুলো আমার অন্তরে বিঁধছে। ঋণ দেওয়ার নাম করে ওরা আমাদের নিঃস্ব করে দিচ্ছে। আমাদের কষ্টার্জিত টাকাগুলো শুষে নিয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে। অবশ্যি এর পেছনেও একটা কারণ আছে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সমাজকে টিকিয়ে রাখতে টাকার প্রয়োজন। টাকা নেই, তাদের ঘুমও নেই। টাকার জন্যে তারা মরিয়া। টাকার জন্যে তারা যেকোনও পথ বেছে নিতে রাজি। অর্থের পাহাড় গড়ে তোলার জন্যে এরাই অশ্লীলতাকে প্রমোট করছে। সম্পদের জন্যে উন্নত রাষ্ট্রগুলো আজ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে তারা সরাসরি বিভিন্ন রাষ্ট্রকে শোষণ করত। নব্য ঔপনিবেশ যুগে নিজ দেশে বসেই আমাদের শোষণ করছে, পার্থক্য কেবল এতটুকুই।

মনে যখন এ চিন্তার ঢেউ খেলা করছিল, তখন আংকেল বললেন, ‘তবে সব দেশই তো কম-বেশি উন্নতির দিকে আগাচ্ছে। এভাবে হয়তো দরিদ্র দেশগুলো উন্নতির দিকে পৌঁছাবে।’

ফারিস জবাব দিলো, 'হয়তো পৌঁছাবে কোনও দিন। যেদিন বিশ শতাব্দী গত হবে!'

'ব্যাপারটা বুঝলাম না ফারিস!'

'আমি বুঝিয়ে বলছি। জিম্বাবুয়ে একটি উন্নয়নশীল দেশ। যে গতিতে দেশটি আগাচ্ছে, একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে তার মিনিমাম ২৭২২ বছর লাগবে। সে পর্যন্ত বিশ শতাব্দী গত হবে না?'

ফারিসের কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। হাসি থামিয়ে আংকেল বললেন, 'বুঝতে পেরেছি বাবা। বুঝতে পেরেছি।'

আংকেল স্পেশাল শরবতের গ্লাসটা খালি করে বললেন, 'বুঝলে ফারিস, বিশ্বটা সিস্টেমের বেড়াজালে বন্দী। তাই বিশ্বের এই দশা।'

মুচকি হেসে ফারিস জবাব দিলো, 'একদম ঠিক আংকেল। বিশ্বকে সুন্দর করতে হলে, পাল্টে দিতে হবে এ সিস্টেমকে। পাল্টাতে হবে এই পাতানো ব্যবস্থাকে।'

'কিন্তু এর বিপরীতে আমরা তো নতুন কিছুই আনতে পারছি না। আপাতত এতেই সমাধান খুঁজতে হবে।'

'আমাদের তো নতুন কিছুই আনার দরকার নেই।'

'মানে?'

'এর বিপরীতে আমাদের বিকল্প সিস্টেম আছে। যেখানে ব্যক্তিবিশেষের কিংবা রাষ্ট্রবিশেষের ইচ্ছেকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। মানুষকে ইচ্ছেমতো অর্থনৈতিক কাঠামো বানানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। যেটি মানুষের বানানো নয়, মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত।'

'তুমি কি ইসলামিক সিস্টেমের কথা বলছো?'

'হ্যাঁ আংকেল।'

'পুঁজিবাদের সাথে এ ব্যবস্থার পার্থক্য কোথায়?'

'আসলে পুঁজিবাদ আর ইসলাম—একটি আরেকটির বিপরীত। একেবারে ১৮০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অবস্থিত। পুঁজিবাদ একটি পাতানো ফাঁদ, আর ইসলাম সে ফাঁদের মুক্তিদাতা।'

'আরেকটু ইলাবোরেটলি বলো।'

'বোঝার সুবিধার জন্যে আমরা একটু ভাগ ভাগ করে বলি। প্রথমত, ইসলাম

বাহ্যিক পরিবর্তনের চেয়ে আত্মিক পরিবর্তনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়। মানুষ বাইরে যতই ভালো হোক না কেন, ভেতরটা ভালো না হলে তার থেকে ভালো কিছু পাওয়া অসম্ভব। তাই ইসলাম প্রথমেই আত্মিক পরিশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেয়। যাতে মানুষ নিজ থেকেই ভালো কাজের দিকে উদ্বুদ্ধ হয়। মন্দকে ত্যাগ করে। পুঁজিবাদে আত্মিক পরিশুদ্ধির কোনও স্থান নেই।

দ্বিতীয়ত, ইসলামে উপার্জনের বৈধ-অবৈধ পথ নির্ধারিত। ইসলামে বৈধ-অবৈধ নির্ধারণ করা হয় ওহীর দ্বারা। পুঁজিবাদে নির্ধারণ করা হয়—গুটিকতক ক্ষমতাবানের দ্বারা। যার ফলে আইনের মধ্যে ওই বিশেষ শ্রেণির ইচ্ছেটাই প্রাধান্য পায়। ইসলামে এ ধরনের কোনও সুযোগ নেই। আর ইসলাম ওইসব ব্যবসাকে হারাম করেছে, যা মানবতার জন্যে অকল্যাণকর। যেমন : হেরোইন, অ্যালকোহল, পর্নোগ্রাফি, জুয়া, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি।

আপনি লক্ষ করলে দেখবেন—পুঁজিবাদ এ ব্যবসাগুলোকে নিষেধ করেনি, ক্ষেত্রবিশেষে উৎসাহিত করেছে। সমাজের মধ্যে মাদক, অ্যালকোহল, পর্নোগ্রাফিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদ চায় মানুষ এই জিনিসগুলোর দিকে আকৃষ্ট হোক। এগুলোর ভোক্তায় পরিণত হোক। মানুষ যত এগুলোর দিকে আকৃষ্ট হবে, তাদের ব্যবসা ততই জাঁকজমক হবে। এ সকল ব্যবসাগুলোই আজ অনেককে বিত্তশালী করে তুলছে। পতিতাবৃত্তি কি আজ সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা নয়?'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছ। আজ তো এসব জিনিসকে আকর্ষণীয় করে যুবকদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। বৃদ্ধ থেকে শুরু করে, একেবারে টিন এইজের ছেলেরাও এ রোগে আক্রান্ত। সেদিন পত্রিকায় দেখলাম, টিন এইজের ছেলেরাই পতিতালয়ের নিয়মিত খদ্দের। ভাবতেও কষ্ট হয়। আচ্ছা, তুমি বলো।'

'তিন নাম্বার পয়েন্টে আসি। ইসলাম টাকা-পয়সা জমিয়ে রাখতে নিষেধ করেছে। আপনি যদি এমন টাকা জমিয়ে রাখেন, যা কোনও কাজেই লাগে না, তাহলে বছরপূর্তিতে ইসলাম সে টাকা থেকে যাকাত আদায় করবে। আর পুঁজিবাদ ব্যাংকে জমানো টাকা থেকে মাসে মাসে ইন্টারেস্ট দেবে। যার ফলে আপনার টাকা তো কমবেই না, দিন দিন বেড়ে যাবে। যাকাত হলো ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যাকাত আদায়ের ফলে ধনীদের সম্পদের অংশ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। সম্পদ একটি শ্রেণির হাতেই জমা থাকবে না, সমাজের প্রতিটি স্তরে তা ছড়িয়ে পড়বে।'

ফারিসের কথা একদম সত্যি। মনে হলো উমার ইবনুল আব্দুল আযীয ﵀ এর কথা। তাঁর সময়ে যাকাত এমনভাবে বণ্টিত হয়েছিল যে, বছর দুয়ের মধ্যে যাকাত

নেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোনও লোককে গরিব থাকতে হয়নি। অভাবী থাকতে হয়নি। না খেয়ে মরতে হয়নি। এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেকেই, যাকাত দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছিল।

একটু কেশে নিয়ে এরপর ফারিস বলল, 'ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে পুঁজিবাদের চতুর্থ পার্থক্য হলো—ইসলাম অর্থব্যয় করার নির্দেশ দেয়। কল্যাণমূলক কাজ করতে উৎসাহিত করে। এখানেই পুঁজিবাদের সাথে মূল পার্থক্য। পুঁজিবাদ মনে করে—দান করলে মূলধন থেকে কমে যায়। আর ইসলাম মনে করে—দান করলে কমে না, বেড়ে যায়।

ইসলাম লৌকিকতামুক্ত দানকে গ্রহণ করে। পুঁজিবাদে লৌকিকতাই প্রাধান্য পায়। আপনি একটু লক্ষ করলেই দেখবেন, যারা বিভিন্ন সময়ে অসহায় মানুষকে সাহায্য করে, তারা পত্র-পত্রিকায় তা ফলাওভাবে প্রচার করতে থাকে। অপর দিকে ইসলাম এমন দানকে বেশি পছন্দ করে, যা চোখের আড়ালে করা হয়। যেন ডান হাত দান করলে, বাম হাত না জানে।

পঞ্চমত, পুঁজিবাদ ঋণ দেয়, তবে সুদ ছাড়া নয়। সুদ ছাড়া ঋণ, পুঁজিবাদ কল্পনাও করতে পারে না। ফলে দেখা যায়, আর্থিক দিক দিয়ে ঋণগ্রহীতা কখনোই ঋণদাতাকে অতিক্রম করতে পারে না। সুদ পরিশোধ করতে না পারলে, পুঁজিবাদ ঋণগ্রহীতাকে দেউলিয়া করে দেয়।

ইসলামও ঋণ দেয়। তবে সুদ ছাড়া। ইসলাম সুদকে কল্পনাও করতে পারে না। সুদ ইসলামে হারাম। পাশাপাশি ইসলাম ঋণগ্রহীতাকে তাগাদা দিতে অনুৎসাহিত করে। এমনকি ঋণ শোধ করতে অক্ষম হলে, ঋণগ্রহীতাকে ক্ষমা করে দিতে বলে। পুঁজিবাদে এসব অকল্পনীয়। আর বড় কথা হলো, পুঁজিবাদের মাধ্যমে একটা সময় অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দেবে। ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।'

'সেটা কীভাবে?'

'ধন সঞ্চয় করে সুদী ব্যবস্থায় নিয়োগ করার কারণে, সম্পদ কিছু মানুষের হাতে আটকে যাবে। যার ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাবে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দেবে। দিনশেষে অবস্থা এমন হবে যে, পুঁজিপতিরা টাকা বিনিয়োগের রাস্তা খুঁজে পাবে না।'

'অহহ, আচ্ছা। এখন বুঝতে পেরেছি। এর বিপরীতে ইসলাম কী ব্যবস্থা নিয়েছে?'

'ইসলামে সম্পদকে জমা হতে দেওয়া হয় না। যাকাত, দান, সদকাহর মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে ধনীদের বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি হয়। সাধারণ মানুষের

উপকার হয়। যাকাত, দান, সাদাকাহর অর্থ, ইসলাম বায়তুল মালে জমা করে। এই বায়তুল মালই মুসলিমদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ইনশিওরেন্স কোম্পানি, প্রভিডেন্ট ফান্ড। এখান থেকেই এতিম, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও অসহায়কে সাহায্য করা হয়। সাহায্য করা হয় বেকার মুসলিমদের। ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনা, সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কম খরচ করে। বেশির ভাগ অর্থ মানবতার কল্যাণে ব্যয় করে।'

ফারিস আর আংকেলের কথোপকথন, আমার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। এক ধ্যানে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তবে ফারিসের কথা শুনে বেশ ঈর্ষা হচ্ছিল। ছেলেটার মাথায় যে কত ধরনের জ্ঞান, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। ফারিসের চোখে চোখ পড়তেই ও আমাকে বলল, 'কথা কি বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে?'

'হু। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। মারুফ, তোর মাথায় ঢুকছে?'

'না বাবা। আমি ফারিসের মতো অত পড়ুয়া ছেলে নই যে, সাইন্সের ছাত্র হয়েও অর্থনীতি নিয়ে জানব।' মারুফ জবাব দিলো।

আমাদের কথা শুনে ফারিস মুচকি হেসে বলল, 'একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি, খেয়াল কর। পুঁজিবাদের দাবি হচ্ছে—টাকা জমা করতে হবে। টাকার পরিমাণ বাড়ানোর জন্যে সুদ নিতে হবে। যার ফলে সুদের নালা দিয়ে গড়াতে গড়াতে, আশেপাশের লোকদের টাকা এ পুকুরে জমা হবে। কিন্তু ইসলাম নির্দেশ দেয়—টাকা জমা করে রাখা যাবে না। যদি কখনো জমা হয়ে যায়, তাহলে জমা হওয়া পুকুর থেকে নালা কেটে দিতে হবে। যাতে আশেপাশের শুকোনো জমিতে পানি পৌঁছে যায়। জমিগুলো সবুজ-শ্যামলে ভরে ওঠে।

পুঁজিবাদে সম্পদ জমা থাকে। কিন্তু ইসলামে তা গতিশীল। পুঁজিবাদের পুকুর থেকে পানি নিতে হলে, গ্রহীতার কাছে অবশ্যই কিছু পানি থাকতে হবে। নয়তো এক ফোঁটা পানিও তাকে দেওয়া হবে না। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় পুকুরের নিয়ম হচ্ছে—কারও যদি প্রয়োজনের বেশি পানি থাকে, তাহলে বাড়তি পানি ইসলামী পুকুরে ঢেলে দিতে হবে। যার পানির প্রয়োজন হবে, সে ওখান থেকে ইচ্ছেমতো নিয়ে যাবে। এবার কি মাথায় কিছু ঢুকেছে?'

'হুঁ, কিছুটা।'

ফারিস হয়তো আরও কিছু বলতো। কিন্তু আংকেল ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'সবই বুঝলাম। কিন্তু আমার উত্তরটা তো পেলাম না।'

'মাফ করবেন আংকেল। আপনার উত্তর দেওয়ার জন্যেই কথাগুলো বললাম।'

'মানে?'

'আমি দুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কিছুটা পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এখন আপনি বলুন তো, এ দুটির কোনটি বেশি মানবকল্যাণমূলক?'

'মনে হচ্ছে, ইসলামিক ইকোনোমিক সিস্টেমটাই বেটার।'

'ইসলামের ইকোনোমিক সিস্টেমটাই নয়, ইসলামের প্রত্যেকটি আইনই এমন সুন্দর। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ইসলামের আইনগুলো কোনও মানুষ বানায়নি। সর্বশক্তিমান স্রষ্টা এগুলো তৈরি করেছেন। তাই এখানে কিছু লোকের স্বার্থের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। সকলের কল্যাণের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। ইসলামের প্রত্যেকটি আইনেই আছে মানবতার কল্যাণ। এই ভণ্ডামিপূর্ণ সিস্টেমের বিপরীতে, ইসলাম যদি তার সুন্দর 'ল' গুলোকে এস্ট্যাবলিশ করতে নির্দেশ দেয়, এ জন্যে ইসলামকে কি আপনি এক্সট্রিম ধর্ম বলবেন?'

আংকেল এবারও কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। এরপর বললেন, 'তা না হয় বুঝলাম। তবে তার জন্যে যুদ্ধের আদেশটা কেন?'

'আপনি তো একজন মুক্তিযোদ্ধা, তাই না?'

'এনি ডাউট?'

'না আংকেল। ডাউট থাকবে কেন? আচ্ছা আংকেল, আপনি পাকিস্তানিদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন কেন?'

'পাকিস্তানিদের অন্যায়ের কালো হাতকে ভেঙে দিতে। পরাধীনতার শেকল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে।'

'তাই বলে যুদ্ধ?'

'আমরা তো প্রথমে যুদ্ধ চাইনি। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান চেয়েছি। অনেক আন্দোলন করেছি। লাভ হয়নি। পাকিস্তানিরা সব সময়ই আমাদের দমিয়ে রাখতে চেয়েছে। পরাধীনতার শেকল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে, বাধ্য হয়েই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি।'

'ইসলামও যদি একই কাজ করে, তাহলে আপনার অসুবিধা কোথায়?'

'মানে?'

'ইসলামও প্রথমে শান্তিপূর্ণ সমাজবিপ্লবের কথা শিখিয়েছে। যেসব কারণে ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো, অন্যায়ের কালো হাতকে ভেঙে দিয়ে মানবতাকে মুক্তি দিতে। পাতানো ফাঁদ থেকে থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে।

মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে স্বাধীন করে দিতে।'

ফারিস যে কথার পিঠে কথা কীভাবে বের করে, তা বোঝা মুশকিল। নয়তো ইসলামী সমাজবিপ্লব যে রক্তপাত ছাড়াও সম্ভব, সে কথা ভুলেই গেছিলাম। মনে হলো, রাসূলের ﷺ মাদানী-জীবনের কথা। আমি ফারিসকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। ফারিস অনেক খুশি হলো। এরপর বলল, 'ভালো কথা মনে করেছিস। আল্লাহ ﷻ তোকে বারাকাহ দান করুন। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমাজবিপ্লবের দ্বারা। কোনও যুদ্ধ ছাড়াই। রক্তপাত না করেও রাসূল ﷺ মদীনার রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন। ভণ্ডামিপূর্ণ সিস্টেম থেকে মানুষকে মুক্ত করেছিলেন। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে স্বাধীন করেছিলেন।'

ফারিস এ পর্যন্ত বলতেই আংকেলের ফোনে কল আসলো। জরুরি মিটিং আছে। এখনি উঠতে হবে। চলে যাওয়ার সময় আংকেল বললেন, 'বেশ ভালো লাগল তোমার সাথে কথা বলে। তোমরা গল্প করো। আমি উঠি। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা মিটিং-এ অ্যাটেন্ড করতে হবে। থ্যাংস মাই সান। থ্যাংস আ লট।'

আংকেল চলে যাওয়ার পর মারুফ ফারিসকে বললো, 'তুই পারিসও! আব্বুকে আজ পর্যন্ত আমি কিছু বুঝাতে পারিনি। তুই একেবারে সোজা করে ছেড়ে দিলি!'

প্রায় দুমাস পরের ঘটনা। সকাল নটার ক্লাস ধরতে খুব দ্রুত ফ্যাকাল্টিতে যাচ্ছিলাম, আমি আর ফারিস। পেছন থেকে মারুফের গলা শোনা গেল। আমরা দাঁড়ালাম। মারুফ দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমাকে অনেক ঋণী করে দিলি ফারিস।'

ফারিস বলল, 'কীভাবে?'

'জানিস, কী হয়েছে?'

'না বললে কীভাবে জানব?'

'আজ আব্বুকে ফযরের সালাত পড়তে দেখেছি।' কথাটা বলতেই মারুফের চোখ দুটো টলমলে হয়ে গেল।

মারুফের কথা শুনে অন্তরটা প্রশান্তিতে ভরে গেল। অবশ্যি অন্তর প্রশান্ত হওয়ার মতোই বিষয়। একটা মানুষ তাঁর রবের দিকে ফিরে এসেছে, এর চেয়ে প্রশান্তির সংবাদ আর কী হতে পারে?

তথ্যসূত্র :

♦ ১) সূরা বাকারাহ, (০২) : ১৮৮, ২৭৫, ২৭৮-২৮০, ২৮৩ আয়াত।
♦ ২) সূরা আলি 'ইমরান, (০৩) : ১৩০ আয়াত।
♦ ৩) সূরা আল-মায়িদাহ, (০৫) : ৯০ আয়াত।
♦ ৪) সূরা তাওবা, (০৯) : ৬০ আয়াত।
♦ ৫) সূরা আল-মুতাফফিফীন, (৮৩) : ৩, ৪ আয়াত।
♦ ৬) শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ;* (দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, চতুর্থ সংস্করণ, এপ্রিল, ২০১৫)
♦ ৭) *ইসলামী অর্থনীতি,* সম্পাদক : অধ্যাপক শরীফ হোসাইন; (শতাব্দী প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)।
♦ ৮) Branko Milanovic-Global Income Inequality by the Numbers-In History and Now-February 2013
♦ ৯) Neuman, Scott (January 2014 ,20). Oxfam : World's Richest 1 Percent Control Half Of Global Wealth. NPR. Retrieved January ,25 2014.
♦ ১০) Stout, David (January 2014 ,20). "One Stat to Destroy Your Faith in Humanity : The World's 85 Richest People Own as Much as the 3.5 Billion Poorest". *Time.* Retrieved January 2014 ,21.
♦ ১১) Wearden, Graeme (January 2014 ,20). "Oxfam : 85 richest people as wealthy as poorest half of the world". *The Guardian.* Retrieved January 2014 ,21.
♦ ১২) Kristof, Nicholas (July 2014 ,22). "An Idiot's Guide to Inequality". *New York Times.* Retrieved July 2014 ,22.
♦ ১৩) World's richest %1 own %40 of all wealth, UN report discovers. 6 December 2006. By James Randerson. *The Guardian.* https://www.theguardian.com/money/2006/dec/06/business.internationalnews
♦ ১৪) https://www.youtube.com/watch?v=1BEpVjG-rCY
♦ ১৫) https://www.youtube.com/watch?v=UbGt69BqHUc
♦ ১৬) https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/-01-2017 16/just-8-men-own-same-wealth-half-world
♦ ১৭) https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/wonk/wp/-10/22/01/2014startling-facts-about-global-wealth-inequality/?espv=1
♦ ১৮) https://www.theguardian.com/money/2015/oct/13/half-world-wealth-in-hands-population-inequality-report?espv=1
♦ ১৯) https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/global-development/2017/jan/16/worlds-eight-richest-people-have-same-wealth-as-poorest50-?espv=1
♦ ২০) http://www.jugantor.com/old/window/345315/31/10/2015

♦ ২১) http://www.bdnews24us.com/bangla/article/585805/index.htm l#sthash.knTqQDtw.dpuf

♦ ২২) ফোবস ম্যাগাজিনের তালিকা অনুযায়ী 'বিল গেটস গত ২৩ বছরের মধ্যে ১৮ বার বিশ্বের সর্বোচ্চ ধনীর তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। বিশ্বজুড়ে বিলিয়ন ডলার মালিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বসবাস করছে আমেরিকায়। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চীন এবং তৃতীয় অবস্থানে আছে জার্মানি। (http://www.bbc.com/bengali/news-39336046?ocid=socialflow_facebook)

সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক অনুসন্ধান

[এক]

মা বাসায় নেই। আজ সকালে যে চা খাওয়া হবে না তা ভালোই বুঝতে পারছি। কিন্তু চা ছাড়া সকাল কাটবে কী করে? শীতের সকাল; চা ছাড়া কি চলে? আগুনগরম এক কাপ চা খাওয়া চাই। তবে আজ বিছানায় বসে সে চা খাওয়ার সুযোগ নেই, বাইরে যেতে হবে। শীতের মধ্যে বাইরে যেতে একটু কষ্টই হবে। সে যা হবার হোক, চা তো খেতে হবে।

সকালটা বেশ সুন্দর মনে হচ্ছে। কুয়াশার ফাঁকে সূর্যের আলো উঁকি দিচ্ছে। মানুষজন তেমন রাস্তায় বের হয়নি। দু-একজন ছাত্রের দেখা মিলল। হয়তো প্রাইভেট কিংবা কোচিং-এ যাচ্ছে। মনে হলো ফারিসের কথা। ওকে একটু চমকে দিলে কেমন হয়? কী করলে ও চমকাবে?

বলা নেই কওয়া নেই হুটহাট ওর মেসে হাজির। ফারিস কী যেন পড়ছিল। আমাকে দেখে তো অবাক!

'কিরে, এত সকালে?'

'সকালে কি তোর কাছে আসতে মানা?'

'আমি কি তা-ই বলেছি?'

'চল।'

'কোথায়?'

'আরে চল না।'

'আচ্ছা একটু দাঁড়া।'

অল্প সময়ের মধ্যেই আমি আর ফারিস বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য—শেখ ঘাট।

অবশ্যি নাম শেখ ঘাট হলেও সেখানে এখন কোনও ঘাট নেই। অনেক আগে ছিল। এখন সেখানে নতুন ব্রিজ বানানো হয়েছে। পাকা রাস্তাও করা হয়েছে। আগে ওখানে পৌঁছতে দু-ঘণ্টা লাগত, এখন পনেরো মিনিট লাগে। সেখানে ভালো চা পাওয়া যায়। আসলে ভালো না বলে ব্যতিক্রমও বলা যায়। ব্যতিক্রম চা পাওয়া যায়। রহস্যময় চা। অবশ্যি সে রহস্য এখনো আমি উদ্ধার করতে পারিনি। দোকানি সে রহস্য আড়াল করে রাখে।

ঘাটে পৌঁছে আমরা দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। ডাবল চা। ছোটবেলায় যখন চা খেয়েছি বাবার সাথে, তখন সিঙ্গেল-ডাবল ছিল না। এই তো সেদিন থেকে সিঙ্গেল-ডাবল চায়ের কথা শুনছি। নদীর ধারে বসে চা খাচ্ছি আমরা দুজন। সূর্যের আলোটা এখন আগের চেয়ে স্পষ্ট হয়েছে। কুয়াশা কুয়াশা ভাবটা কমতে শুরু করেছে। ফারিসকে দেখে কিছুটা চিন্তিত মনে হচ্ছে। এক ধ্যানে চা খাচ্ছে, আর নদীর দিকে তাকিয়ে আছে।

চুপচাপ বসে থাকতে আমার একদম ভালো লাগে না। তাই ফারিসকে বললাম, 'কিরে, কিছু হয়েছে?'

আমার দিকে না তাকিয়েই ও উত্তর দিলো, 'না, তেমন কিছু না।'

'কিছু না মানে? মুখ দেখেই বুঝা যাচ্ছে কিছু হয়েছে। জলদি জলদি বল কী হয়েছে।'

'কাল আরটিভি কী করেছে জানিস?'

'কী?'

'সমকামিতা নিয়ে নাটক প্রচার করেছে—রেইনবো।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ রে। রাজন ফোন করেছিল। ও-ই জানাল। জানিস, স্পন্সর কে করেছিল?'

'কে?'

'গ্রামীণফোন।'

ফারিসের চিন্তার কারণ বুঝতে আর বেগ পেতে হলো না। খানিক বিরতি দিয়ে ফারিস বলল, 'কদিন আগে কী হয়েছে জানিস?'

উৎসুক গলায় আমি বললাম, 'কী?'

'ঢাকার কেরাণীগঞ্জে প্রায় তিরিশেক সমকামী আটক করা হয়েছে।'

'ওরা ভালোই প্রচারণা চালাচ্ছে তাহলে?'

'হুম। চালাচ্ছেই তো। বেশ প্রচারণা চালাচ্ছে। বল তো ওদের প্রচারণার উদ্দেশ্য

কী?'

'সমকামিতা ছড়িয়ে দেওয়া?'

'তা তো অবশ্যই। তবে প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমকামিতাকে সাধারণ বিষয় করে তোলা। মানুষ যাতে মনে করে এটা একটা স্বাভাবিক বিষয়, যার ইচ্ছে সে সমকামী হতে পারে। এতে দোষের কিছুই নেই।'

'গোপনে গোপনে এগুলো ছড়াচ্ছে তাহলে?'

'গোপনে কী, প্রকাশ্যেই তো চালাচ্ছে। পহেলা বৈশাখে ওদের র‍্যালি হয়—দেখিসনি? *রূপবান* ম্যাগাজিন বের করে ওরা। এছাড়া বিভিন্ন এনজিও তো আছেই ওদের পিছে। এনজিওগুলো প্রতিনিয়ত আর্থিক সাহায্য করে যাচ্ছে। সমকামীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দিচ্ছে, লুব্রিকেন্ট অয়েল দিচ্ছে, সভা-সেমিনার করে যাচ্ছে।'

'ছেলেবেলায় তো এদের এত তোড়জোড় দেখিনি।'

'দেখিসনি, এখন দেখবি। এদেশে ওদের কাজ শুরু হয়—নব্বই দশকের শেষের দিকে। এরপর থেকে গোপনে-প্রকাশ্যে কাজ করেই যাচ্ছে। বিদেশিদের সাপোর্ট নিয়ে এখন কোমর বেঁধে নেমেছে। ২০১০ সালে বাংলায় জোড়াতালি দিয়ে একটা বইও লিখে ফেলেছে।'

'সমকামিতা নিয়ে?'

'হুঁ।'

'কে লেখেছে?'

'কে আবার, অভিজিৎ। অভিজিৎ রায়।'

'আচ্ছা দোস্ত, *রূপবান* কারা চালায়?'

'তুই তো দেখছি কোনও খবরই রাখিস না। *রূপবান* ব্রিটিশ অর্থায়নে চলে। ২০১৪ সালে এদের এ ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয়। সেখানে প্রধান অতিথি ছিল ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট গিবসন।'

'এভাবে চলতে থাকলে তো বিপদ!'

'বিপদ মানে ভয়াবহ বিপদ। ১৯৮৭-তে মাত্র ৩৭% আমেরিকান মনে করত সমকামিতা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু ২০১৭-তে এসে এ চিত্র পুরোটাই পাল্টে গেছে। এখন ৬৪% আমেরিকান সমকামিতাকে সাধারণ বিষয় মনে করে। সমকামীদের প্রচার-প্রচারণার ফলে এমনটা হয়েছে। আমেরিকা ছাড়াও প্রায় ২১ টি দেশে সমকামী বিয়ে

আইনসিদ্ধ। মজার ব্যাপার হলো, এসব দেশে রাষ্ট্র জনগণের ওপর সমকামিতা চাপিয়ে দেয়নি, জনগণই রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছে। আমাদের দেশেও যে হারে প্রচারণা শুরু হয়েছে—আমেরিকার মতো হতে বেশি দিন লাগবে না মনে হয়।'

'আচ্ছা দোস্ত, একবার খবরে গে-জীনের কথা শুনেছিলাম, জেনেটিক্সে তো এমন কোনও জীনের কথা শুনিনি। গে-জীন কি সত্যিই আছে?'

'আমার জানামতে নেই। তবে আরও ক্লিয়ার হতে হবে। কিছুদিন সমকামিতা নিয়ে পড়াশোনা করব বলে ঠিক করেছি।'

'এ জন্যেই তোর টেবিলে অভিজিতের বইটা দেখলাম?'

ফারিস কিছু বলল না। এক ফালি হাসি উপহার দিলো। শব্দবিহীন হাসি।

[দুই]

বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠলে নাকি মানুষকে আর পড়াশোনা করতে হয় না। ছোটবেলা থেকেই অপেক্ষা করতাম, কবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হব? কবে থেকে আর পড়াশোনা করতে হবে না? কবে থেকে শিক্ষকরা আর বকবে না? পড়ো-পড়ো করে কেউ সারাদিন মাথা খারাপও করবে না। কবে অপেক্ষার প্রহর শেষ হবে?

অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। মনে হতে লাগল, আজ থেকে আমি মুক্ত, স্বাধীন। ইচ্ছেমতো পড়াশোনা করব। যখন খুশি বই পড়ব। হাদিসের বই, সীরাতের বই, গল্পের বই—কোনওটা আর বাদ রাখব না। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনাকে বিদায় জানাব।

আমার সে আশা আশাই রয়ে গেল। আর পূর্ণ হলো না। এমন একটা সাব্জেক্টে ভর্তি হলাম—ক্লাস করতে করতে দিন শেষ। রাতে যতটুকু সময় পাওয়া যেত, সেটাও অ্যাসাইনমেন্টের পেছনে ব্যয় হতো। অন্য বই পড়ব কখন? ক্লাস করতে করতে হাঁপিয়ে উঠতাম। ক্লাসের ফাঁকে কফি খাওয়ার সময়টুকু মেলানো যেত না। কখনো যদি স্যাররা ব্যস্ততার কারণে ক্লাস না নিতেন, তখন কফি খেতে যেতাম। ক্লাসের অবসর সময়কে স্পেশাল নিয়ামত মনে হতো।

কোনও এক ক্লাসের বিরতিতে, কফি খাওয়ার মনস্থ করলাম। আমি আর ফারিস। ভার্সিটির ক্যাফেটেরিয়ায়। ক্যাফেটেরিয়ায় গিয়েছিলাম একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে, তা আর হলো না। অবশ্যি এর জন্যে রফিক ভাই-ই দায়ী। তাঁর কারণেই অবসর সময়টুকু মাটি হয়ে গেল। আমরা গিয়ে দেখি তিনি সেখানে বসা।

রফিক ভাই ইকোনোমিক্সে পড়েন। আমাদের সিনিয়র। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছ-ইঞ্চি। বেশ

মোটা। গোঁফ চুলের থেকেও লম্বা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাগাছ সংঘের সভাপতি। অবশ্যি কলাগাছ সংঘ নামটা আমার দেওয়া। আসল নামটা আমি বলতে চাচ্ছি না। এর দরকারও নেই। কলাগাছ সংঘের সভাপতি ছাড়াও তাঁর আরেকটি পরিচয় আছে। তিনি নারী অধিকার কর্মী। নারীদের নিয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত নেই। ইসলামকে খোঁচা দিয়ে কথা বলাটা তাঁর অভ্যাস। কথায় আঞ্চলিকতার টান বেশ স্পষ্ট। ফারিসকে দেখলেই তিনি নানান বিষয়ে প্রশ্ন করেন। অবশ্যি জানার জন্যে নয়; পরাজিত করার জন্যে। তবে ফারিসকে কখনো পরাজিত করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই।

আমাদের ক্যাফেটেরিয়ায় দেখে তিনি বললেন, 'কিরে মোল্লার দল? এইহানে কী করিস?'

ফারিস মুচকি হেসে জবাব দিলো, 'কফি খেতে এসেছি ভাই।'

'কফি! আয় বোস।'

'আপনি খাবেন?'

'খাওয়া যায়। তয় শর্ত হইল তোরা বিল দিতে পারবি না। আমিই দিমু।'

'এ তো মেঘ না চাইতেই জল।'

'অত জল টল বুঝি না। রাজি থাকলে ক।'

'জি ভাই, রাজি।'

'তাইলে দিতে ক।'

রফিক ভাই লোক সুবিধের না। সব সময় হুজুরদের নাজেহাল করার চেষ্টা করেন। আমরা দুজনই হুজুর। আমাদের নিয়ে কী ফন্দি এঁটেছেন, কে জানে? যতই ফন্দি করুন না কেন, ফারিসকে পরাস্ত করার শক্তি তাঁর নেই। এর আগেও অনেক কৌশল করেছিলেন। তবে পারেননি। শত জাল ছিন্ন করে ফারিস ঠিকই বেরিয়ে এসেছে।

আমি কফির অর্ডার দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে কফি চলে এল। কাপটা হাতে নিয়ে রফিক ভাই বললেন, 'ঈদের অনুষ্ঠানে আরটিভি সমকামিতা নিয়া একটা নাটক প্রচার করল। সেইখানে না খারাপ কিছু দেহানো অইলো, আর না খারাপ কোনও কতা প্রচার করা অইল। তারপরেও হুজুররা এইডা নিয়া লাফালাফি শুরু করল। অনলাইন অফলাইনে এক্কেবারে ঝড় তুইলা ফেলল। এইসব করা কি ঠিক অইল, তুই ক?'

যা ভেবেছিলাম তা-ই। আজও তিনি তর্ক করতে এসেছেন। তর্কের বিষয়টাও মনে হয় বেছে বেছে নির্ধারণ করেছেন—সমকামিতা। ইংরেজিতে যাকে বলে Homosexuality. যখন ছোট ছিলাম, তখন এদেশে সমকামিতা নিয়ে তেমন

কথাবার্তা শুনিনি। আজকাল অবশ্যি শব্দটা বেশি বেশি উচ্চারিত হচ্ছে। সমকামিতা একটি অপ্রাকৃতিক যৌনকর্ম। এর দ্বারা সমলিঙ্গের মধ্যে যৌন সম্পর্ক বোঝায়। Homosexual শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কার্ল মারিয়া কার্টবেরি, ১৮৬৯ সালে। পরে জীববিজ্ঞানী গুস্তভ জেগার এবং রিচার্ড ফ্রেইহার ভন ক্রাফট ইবিং শব্দটি জনপ্রিয় করে তোলেন। এটা সেই ১৮৮০-এর দশকের কথা। তবে Homosexual শব্দটা সমকামীদের পছন্দ নয়। বিশ্বজুড়ে তাদের আন্দোলনের ফলে গে এবং লেসবিয়ান শব্দ দুটি অধুনা সমাজে ব্যবহার করা হয়। এসব তথ্য ফারিসের কাছে সেদিন শেখ ঘাটে বসেই শুনেছিলাম।

'হুজুররা কেন সমকামিতার বিরোধিতা করে, জানেন ভাই?' ফারিস রফিক ভাইকে প্রশ্ন করল।

'ক্যান আবার? তারা মানুষের কাজ কামের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, হের জন্যেই করে।'

'আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।'

'ভুল?'

'হ্যাঁ, ভুল।'

'ক্যান?'

'কারণ, হুজুরদের সমকামিতাকে বিরোধিতা করার আসল কারণটা আপনি জানেন না।'

'জানি জানি, খুব জানি। হুজুরগো আমার চিনা আছে। খালি মসজিদ-মাদ্রাসা লইয়া পইড়া থাকে। আর মানুষের কাজে-কামে নাক গলায়। মানুষরে দাস বানাইয়্যা রাখবার চায়। এইডাই মেন কারণ।'

'রফিক ভাই, আপনি আবারও ভুল বলছেন।'

'ভুল কইতাছি? তাইলে ঠিকটা কী, ক দেহি।'

'হুজুরদের সমকামীদের বিরোধিতা করার কারণ হলো—এটি একটি গর্হিত কাজ।'

'গর্হিত কাম? হা হা হা। হাসাইলি ফারিস, হাসাইলি। সমকামিতা খারাপ কাম অইব কেন? এইডা মানুষের জেনেটিক বিষয়। মানুষ জন্মগতভাবেই সমকামী অইতে পারে। হেইডা কি তোর জানা নাই?'

'একটা মস্ত বড় ভুল ইনফরমেশন দিলেন ভাই।'

'ভুল ইনফরমেশন দিছি?'

'হুম। এই তো, এইমাত্র দিলেন।'

'তাইলে ঠিকটা তুই-ই ক।'

রফিক ভাইয়ের কথা শেষ হলে ফারিস আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুই তো হিস্টোলজি আমার থেকে ভালো করে পড়েছিস। রফিক ভাইকে একটু পায়ু ও যোনির গাঠনিক পার্থক্যগুলো বল তো।'

ফারিসের কথা শেষ হলে আমি বললাম, 'মেয়েদের যোনি যৌনমিলনের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি একটি অঙ্গ। যোনি তিন স্তরবিশিষ্ট, যা পুরু ও স্থিতিস্থাপক পেশি দিয়ে তৈরি। যেখানে ন্যাচারাল লুব্রিকেন্ট উপস্থিত। ফলে লিঙ্গ সহজেই যোনিতে প্রবেশ করতে পারে। তিন স্তরবিশিষ্ট লেয়ার, ন্যাচারাল লুব্রিকেন্ট ও স্থিতিস্থাপক পেশি থাকার কারণে—যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশের ফলে রক্তপাত হয় না। কোনওরকম ঘর্ষণ হয় না।

অপর দিকে মলাশয় অত্যন্ত নাজুক অঙ্গ। মলাশয়ে ন্যাচারাল লুব্রিকেন্ট অনুপস্থিত। মলাশয়গাত্র একেবারেই পাতলা। এক স্তরবিশিষ্ট আবরণ দিয়ে তৈরি। মলাশয়ে লিঙ্গ যোনির মতো সহজেই প্রবেশ পারে না, চাপ দিয়ে প্রবেশ করাতে হয়। যেহেতু মলাশয়গাত্র পাতলা ও ন্যাচারাল লুব্রিকেন্ট অনুপস্থিত, তাই লিঙ্গ প্রবেশের ফলে রক্তপাত হয়। আর বীর্য সহজেই রক্তের সাথে মিশে ইনফেকশন তৈরি করতে পারে। বীর্য ইমিউনোসাপ্রেসিভ[৩৪]।

মানুষের অ্যানাল রুটের ইমিউনো সিস্টেম যোনির তুলনায় দুর্বল। বীর্য যদি মলাশয়ে নির্গত হয়, তাহলে মলাশয়ের ইমিউনো সিস্টেম আরও দুর্বল হয়ে পরে। ফলে জীবাণু বিনাবাধায় শরীরে প্রবেশ করে, বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে।'

আমার কথা শুনে রফিক ভাই সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হলো না। তিনি বললেন, 'সবই বুঝলাম। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যে গে-জীন আবিষ্কার করছে। গে-জীনডাই যথেষ্ট সমকামিতারে জেনেটিক্যালি প্রোভ করবার লাইগ্যা।'

রফিক ভাইয়ের কথা শুনে ফারিস হাসতে শুরু করল। হাসি থামিয়ে বলল, 'ভাই, একটা প্রশ্ন করি?'

'আর কী প্রশ্ন করবি? এইবার তো তুই আমার কাছে হাইরা গেলি। হো হো হো।'

'সে না হয় পরে দেখা যাবে। আগে বলেন তো, আপনি গে-জীনের কথা কোথা থেকে শুনেছেন।'

---

[৩৪] Reduction of the activation of the immune system is called immunosuppression. Which agents are responsible for this process is called immunosuppressive.

'হেইডা তোরে কওয়া যাইব না। সিক্রেট ব্যাপার।'

'আমি বলি?'

'ক দেহি। দেহি তোর আইডিয়া কেমন।'

'অভিজিৎ রায়ের বই থেকে। তাই না?'

রফিক ভাই কোনও জবাব দিলেন না। রফিক ভাইয়ের চুপ থাকাটাই তাঁর মৌন সম্মতি নির্দেশ করে। ফারিসের সন্দেহটা ঠিক। অভিজিৎ বাবু পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। নাস্তিকদের বহুলপ্রচারিত একটি ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা। লোকটার বায়োলজির জ্ঞানের কমতির অভাব নেই। কপি পেস্ট লেখক হিসেবেও তার জুড়ি-মেলা-ভার। জোড়া-তালি দিয়ে সমকামিতার পক্ষে একটা বইও লিখেছেন তিনি। তাই নিয়ে বাংলার নাস্তিকদের অহমিকার শেষ নেই। রফিক ভাইদের মতো লোকেরা তার লিখনীগুলো গসপেল মনে করে। আর তৃপ্তির ঢেকুর তোলে।

রফিক ভাই চুপ করে আছেন দেখে ফারিস জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা রফিক ভাই, আমি যদি ইতিহাসের ছাত্রের কাছে অর্থনীতি বুঝতে যাই, সেটা কেমন হবে?'

'পাগলে কয় কী? ইতিহাসের ছাত্রের কাছে তুই অর্থনীতির কী পাইবি? অর্থনীতি বুঝতে চাইলে অর্থনীতিবিদদের কাছে যাইতে অইব।'

'আপনি ইঞ্জিনিয়ারের বই পড়ে যদি মেডিকেল সাইন্স বুঝতে চান, তাহলে সেটা কেমন হবে?'

'তুই কইবার চাস—মেডিকেল সাইন্স নিয়া আমাগোর ঘাঁটাঘাঁটি করবার অধিকার নাই?'

'থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে। তবে মিথ্যাচার করার অধিকার কারও নেই।'

'তুই কইবার চাস অভিজিৎ দাদা মিসা কতা লিখছে তার বইডার মধ্যে?'

'শুধুই কি মিথ্যা? তার গোটা বইটাই তো মিথ্যার ফুলঝুরি দিয়ে সাজানো।'

'দাদা তো বইডা রেফারেন্স দিয়াই লিখছে, না কি?'

'রেফারেন্স দিয়েছে, কিন্তু ভুল গবেষণার।'

'ভুল?'

'জি ভাই। ভুল।'

'যেমন?'

'অভিজিৎ রায় গে-জীনের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর দাবি করেছেন, সমকামিতার জন্যে গে-জীন দায়ী। কিন্তু তথাকথিত গে-জীনের ফাদার উপাধিপ্রাপ্ত Dr. Dean Hamer, গে-জীনের কথা অস্বীকার করেছেন। Scientific American Magazine যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল—সমকামিতা কি জীনবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, Absolutely not.

The Human Genome প্রজেক্ট শুরু হয় ১৯৯০ সালে। শেষ হয় ২০০৩ সালে। এ প্রজেক্টে মানুষের জীন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করা হয়। কিন্তু তারা গে-জীনের কোনও অস্তিত্বই খুঁজে পায়নি। Dr. George Rice, Dr. Neil and Whitehead, Dr. William Byne, Bruce Parsons—এসব বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, মানুষ কখনোই জন্মগতভাবে সমকামী হতে পারে না।

এ ছাড়া অনেক বিজ্ঞানীই হেমারের গবেষণাকে ভুল প্রমাণ করেছেন। Laumann এর গবেষণায় দেখা যায়, সমকামিতা সৃষ্টিতে শহুরে পরিবেশ গ্রাম্য পরিবেশের তুলনায় বেশি ভূমিকা পালন করে। যদি সমকামিতা জেনেটিকই হতো, তাহলে তো সব স্থানে এর বিস্তার সমান হওয়ার কথা ছিল। সমকামিতা জেনেটিক বিষয় নয়; এটা আবেগ, কৌতূহল, আকর্ষণ ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলেই সৃষ্টি হয়। সমকামী সম্পর্ক অস্থায়ী। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়।

সমকামিতা কখনোই জন্মগতভাবে লাভ করা যায় না। এটি শিশুকাল থেকে শেখা আচার-আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। বেশ কিছু কারণে সমকামিতার প্রতি দুর্বলতা আসতে পারে। যদি পরিবার সমকামী হয়, তাহলে বাচ্চার মধ্যেও সেটার প্রভাব দেখা যায়। পর্নোগ্রাফি, বিশেষ করে সমকামী পর্নোগ্রাফিগুলো মানুষের মধ্যে সমকামিতা সৃষ্টি করতে পারে। সমকামিতার খারাপ প্রভাব সম্পর্কে অসচেতনতা ও সমকামী বন্ধুও এর জন্যে দায়ী। এছাড়া সমাকামী সমাজ ব্যবস্থাও সমকামী হওয়ার জন্যে দায়ী। এখন বলেন তো ভাই, অভিজিৎ রায় কি মিথ্যা তথ্য দেননি?'

রফিক ভাইকে কিছুটা চিন্তিত মনে হচ্ছে। তিনি চুপ রইলেন। চুপ থাকারই কথা। তাঁর প্রিয় দাদা যে এতবড় ভুল করবেন, তা কি আর তিনি জানতেন? জানবেনই-বা কী করে? বেচারা পড়াশোনা করেছেন কমার্স নিয়ে। বিজ্ঞান নিয়ে যে দু-কলম জেনেছেন, সেটাও নিজের জ্ঞানে না—অন্যদের থেকে ধার করে। কখনো ধার করেছেন ব্লগ থেকে, কখনো বা বিজ্ঞানমনস্ক কলাবিভাগের ছাত্রের কাছ থেকে। যাদের কাছ থেকে ধার করেছেন, তারাও আবার কারও কাছ থেকে ধার করে লিখেছে। তাই বিজ্ঞানের ভুল জ্ঞান তাঁর কাছে থাকাটাই স্বাভাবিক।

তবে সত্য-মিথ্যে যা-ই হোক, সে পরে দেখা যাবে। কিন্তু এখন তাঁর গুরুকে ফারিস

মিথ্যেবাদী প্রমাণ করবে, আর তিনি বসে বসে দেখবেন, তা কি হয়? যে করেই হোক ফারিসকে হারাতে হবে। তাই তো তিনি বলে উঠলেন, 'তোর আগের কথাডা মাইনা নিলাম। কিন্তু বিজ্ঞান তো এইডাও প্রমাণ করছে—সমকামীদের মগজ অন্যদের থেইকা আলাদা। তাইলে মিছা মিছা দাদারে দুশ দিয়া লাভ কী?'

প্রশ্ন শেষ করে রফিক ভাই কফির কাপে চুমুক দিলেন। তাঁর মুখের চিন্তার ছাপটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না। হয়তো মনে মনে ভাবছেন—নে বেটা, পারলে এই প্রশ্নের জবাব দে। দেখি তোর মুরোদটা কেমন! তিনি যা খুশি ভাবুন। তাতে কিছু আসে যায় না। ফারিস যে তাঁর প্রশ্নের উচিত জবাব দেবে, সে আমার বুঝতে বাকি নেই। ফারিস তাৎক্ষণিক বলে উঠল, 'এটাও আপনি অভিজিৎ রায়ের বই থেকে বলছেন, তাই না ভাই?'

'না মানে...'

'অভিজিৎ রায় Dr. Simon Levay-এর একটি গবেষণাকে কেন্দ্র করে এ তথ্যটা দিয়েছেন। যদিও পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা এই তথ্যকে বাতিল করে দিয়েছেন।'

Dr. Simon Levay তাঁর গবেষণায় কী বলেছিলেন, তা জানতে ইচ্ছে করছিল। তাই ফারিসকে প্রশ্ন করলাম, 'ডক্টর সাহেব কী বলেছিলেন রে?'

'ডক্টর সাহেব বলেছেন, হাইপোথ্যালামাসের Cluster cell INAH3-বিষমকামী পুরুষের আর সমকামীদের এক নয়—ভিন্ন।'

'তাঁর গবেষণা বাতিল হওয়ার কারণ কী?'

'গবেষণাটি ছিল দুর্বল।'

'কেন?'

'তিনি যে সমকামীদের নিয়ে গবেষণা করেছেন, তারা এইডস রোগে মারা গিয়েছিল। তাই তাঁর গবেষণার বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রফেসর Dr. A. Dean Byrd সহ অনেকেই তাঁর গবেষণাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন—মানুষের মস্তিষ্ক স্থির নয়, পরিবর্তনশীল। কেউ যখন একটা কাজ বার বার করতে থাকে, তখন নির্দিষ্ট একটা নিউরাল পথ শক্তিশালী হয়। যখন এই নিউরাল পথ শক্তিশালী হয়, তখন এটি মস্তিষ্কের রসায়নে প্রতিফলিত হয়।

তাই ভিন্ন ভিন্ন পেশার লোকদের মধ্যে মস্তিষ্কের পার্থক্য ঘটে। যিনি সাইন্টিস্ট আর যিনি কৃষক—দুজনের মস্তিষ্কের গঠন এক নয়। আলাদা। তুই শুনলে হয়তো আরও অবাক হবি, ডক্টর সাহেব নিজেই ২০০১ সালে তাঁর গবেষণার ব্যর্থতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "আমি প্রমাণ করিনি যে, সমকামিতা জেনেটিক। আমি সমকামিতার

জেনেটিক কোনও কারণও বের করিনি।"'

ফারিসের কথায় রফিক ভাই প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। খাবেনই-বা না কেন? তাঁর দাদা বিজ্ঞানের নাম দিয়ে অপবিজ্ঞান রচনা করেছেন, তাঁর তো কষ্ট হবেই। অবশ্যি তা ছাড়া অভিজিতের কোনও উপায়ও ছিল না। বিজ্ঞান দিয়ে তো আর সমকামিতাকে জেনেটিক প্রমাণ করা যাবে না; যদি মিথ্যে দিয়ে হয়, তো ক্ষতি কী?

'শুনলাম আমেরিকার মনোবিজ্ঞানীরা নাকি সমকামিতারে মানসিক রোগের চার্ট থেইকা বাদ দিছে? যদি দিয়ায় থাকে, তাইলে তোর কথা ক্যামনে মানি? হেরা নিশ্চয়ই তোর চাইতে বিজ্ঞান বেশি জানে।' রফিক ভাইয়ের প্রশ্ন ফারিসের কাছে।

ফারিস বেশ হাসিমুখে বলল, 'ভাই আপনি জানেন কি, ১৯৭৩ সালের আগে আমেরিকায় সমকামিতাকে মানসিক ব্যাধি মনে করা হতো?'

রফিক ভাই মাথা নাড়লেন। ফারিস বললো, 'সমকামিতাকে মানসিক ব্যাধির চার্ট থেকে বাদ দেওয়ার কারণ বিজ্ঞান নয়—অন্য কিছু।'

'তোরা না! সব কামোই খালি সন্দেহ খুঁজস। আইচ্ছা ক দেহি, কারণডা কী।'

'পলিটিকাল কারণ।'

'পলিটিকাল?'

'জি ভাই, পলিটিকাল। আমেরিকান রাজনৈতিক দলগুলো সমকামী ও তাদের প্রতি সহনশীলদের ভোট পাওয়ার জন্যে মনোবিজ্ঞান সংস্থাকে চাপ দিতে করতে থাকে। চাপের মুখে সংস্থাটি নতি স্বীকার করে। আসলে স্বীকার করে বললে ভুল হবে, করতে বাধ্য করা হয়। তবে তারা এটা বলে নি যে, বিজ্ঞান জেনিটিক্যালি সমকামিতা মেনে নিয়েছে। ২০০০ সালের মে মাসে American Psychiatric Association জানায়—এমন কোনও তথ্য তাদের কাছে নেই, যা দিয়ে সমকামিতার পক্ষে বায়োলজিক্যাল প্রমাণ দাঁড় করানো যায়।

রফিক ভাই এবার চেয়ারের সাথে হেলান দিয়ে বসলেন। এরপর বললেন, 'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা বইলা তো একটা কথা আছে, নাকি? সমকামীরা তো আমাগোর সমাজে কোনও ক্ষতি করতাছে না। তাইলে তাগো পিছনে লাইগ্যা লাভ কী? তারা তাগোর কাম করুক, আমরা আমাগোর কামে টাইম দেই। হেইডাই আমাগোর লাইগ্যা ভালা।'

'রফিক ভাই, একটা প্রশ্ন করি?'

'হ, কর।'

'কেউ যদি আপনার সামনে গাঁজা খায়, আপনি কি তাকে বাধা দেবেন?'

'বাধা দিমু না মানে? এইডা তুই কী কস?'

'কেন বাধা দিবেন? গাঁজা খাওয়াটা তো ব্যক্তি-স্বাধীনতা! বাধা দিলে তো আপনি তার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেন!'

'রাখ তোর স্বাধীনতা। গাঞ্জা খাইলে হের শরীলো কী পরিমাণ ক্ষতি অইব, তুই জানস? তারে অবশ্যই এই কাম থেইকা ফিরাইয়্যা রাহন লাগব।'

'সমকামীদেরও বাধা না দিলে যে রোগব্যাধি তাদের শরীরে বাসা বাঁধবে, সে খেয়াল কে করবে ভাই? সমকামিতার সাথে জীবন-মরণ সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। জীবনটাই যদি না থাকে, তাহলে অযথা মরীচিকার পেছনে দৌড়িয়ে লাভ কী? সমকামিতাকে যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলা হয়, তবে মদপান, ধূমপান, ইয়াবা—এসবকেও তা-ই বলতে হবে। '

'তুইতো আবার ঘুইরা ফিইরা হেই পুরান প্যাঁচালই শুরু করলি।'

'কী করবো বলেন? বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে—অ্যানাল সেক্স অন্য যেকোনও সেক্সের চাইতে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এর মাধ্যমে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজগুলো[৩৫] দ্রুত ছড়ায়। সমকামীদের মধ্যে এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়ার হার বেশি। অন্য যৌনরোগও তাদের বেশি হয়। যেমন, গে-বাওয়েল সিনড্রোম সমকামীদের বেশি হয়। তাই এর নাম গে-বাওয়েল সিনড্রোম। আচ্ছা ভাই বলেন তো, এইডস, সিফিলিস, কিংবা গনোরিয়ার মধ্যে কোনটা সবচাইতে বেশি ক্ষতিকর?'

'কোনডা আবার? এইডস। এইডা তো সবাই জানে। এইডার কোনও অশুধ এহনো আবিষ্কার অয়নাই।'

'আপনি শুনলে হয়তো অবাক হবেন, মরণঘাতী এইডসের অন্যতম কারণ—সমকামিতা।'

'কয়দিন আগে একটা বাংলা পত্রিকায় দেখলাম এইডা লেখছে। তুই কি ঐখান থেইকা কপি করতাছস নি?'

'না ভাই। আমি কোনও বাংলা পত্রিকা থেকে বলছি না। আমেরিকান সেন্ট্রাল ফর ডিজিজ কন্ট্রোল[৩৬], বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, UNAIDS-এর রিপোর্ট থেকে বলছি। তারা দেখিয়েছে যে, সমকামিতা এইডসের বড় রিস্ক ফ্যাক্টর। CDC-এর তথ্য থেকে আরও জানা যায়, ১৯৯৮ সালে আমারিকায় নতুন এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিদের মধ্যে

[৩৫] Sexually transmitted diseases are those diseases that are commonly spread by sex, especially vaginal intercourse, anal sex or oral sex.
[৩৬] CDC

৫৪%-ই ছিল সমকামী। ২০০৯ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত CDC-এর একটি রিপোর্ট বলছে, অন্যদের চেয়ে এইডস সংক্রমণের হার সমকামীদের বেশি। অনেক বেশি। প্রায় ৫০ গুণ বেশি। UNAIDS-এর ২০১৫ সালের রিপোর্টও একই কথাই বলেছে।'

ফারিসের কথা শুনে রফিক ভাইয়ের মাথা ধরছে মনে হলো। তাঁর কপালের ভাঁজ স্পষ্টতই দৃশ্যমান হচ্ছে। হয়তো মনে মনে ভাবছেন, 'যাকগে! আর প্রশ্ন করার দরকার নেই। না জানি কোন বিপদ হয়। যেভাবে ফারিস আমার দাদার ভুলগুলো টেনে টেনে বের করছে, আবার কিছু বললে মনে হয় থলের বিড়াল সব বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং চুপ থাকি। চুপ থাকাই শ্রেয়।'

চুপচাপ ভাই কফি খাচ্ছেন। ফারিসও খাচ্ছে। আমি এক চুমুক দিয়ে বললাম, 'আচ্ছা ফারিস, সমকামিতা কি যৌনরোগ ছাড়া অন্যান্য রোগের জন্যেও দায়ী? যেমন, ক্যান্সার বা এই টাইপের কিছু?'

আমার প্রশ্ন শুনে ফারিস বলল, 'গুড পয়েন্ট। অনেক সুন্দর একটা প্রশ্ন করছিস। নয়তো আমার এই পয়েন্টটা মনেই আসত না। জাজাকাল্লাহ দোস্ত। সমকামিতা শুধু যৌনরোগই নয়, অন্যান্য রোগও ছড়ায়। ক্যান্সার হলো তাদের মধ্যে অন্যতম।'

'মেকানিজমটা কী দোস্ত?'

'অ্যানাল সেক্সের[৩৭] ফলে মলাশয়গাত্রে ক্ষত হতে পারে, যেটা তুই নিজেই বলেছিস। প্যাপিলোমা ভাইরাস সহজেই অ্যানাল রুট দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। ক্ষতের মাধ্যমে ভাইরাসটি অল্প সময়েই রক্তের সাথে মিশে যায়। তাই অ্যানাল ক্যান্সার সমকামীদের মধ্যে বেশি। Nursing Clinic of North America-এর ২০০৪ সালের একটি রিপোর্ট বলছে—এইডস আক্রান্ত ৯০% এবং এইডস ব্যতীত ৬৫% সমকামীদের দেহে—Human Papilloma Virus আছে; যা ক্যান্সারের জন্যে দায়ী। সমকামীদের অ্যানাল ক্যান্সারের ঝুঁকি বিষমকামীদের থেকে ১০ গুণ বেশি। আর এইডস আক্রান্ত সমকামীদের এ ঝুঁকির পরিমাণ আরও বেশি। প্রায় ২০ গুণ।'

'ক্যান্সার ছাড়া অন্য রোগের ঝুঁকি তাদের মধ্যে কেমন?'

'অন্যান্য রোগও তাদের মধ্যে বেশি। যেমন ধর, হেপাটাইটিস-এ। এ রোগটি সমকামীদের বেশি হতে দেখা যায়। ১৯৯১ সালে নিউইয়র্কে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সে সময়ে ৭৮% হেপাটাইটিস-এ তে আক্রান্ত ব্যক্তি ছিল—সমকামী। এ ছাড়া বিভিন্ন প্যারাসাইটিক ও ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজও সমকামীদের বেশি হয়ে থাকে।'

[৩৭] Anal sex is generally the insertion and thrusting of the erect penis into a person's anus or anus and rectum for sexual pleasure.

'যেমন?'

'সালমোনেলা সম্পর্কে ধারণা আছে?'

'হুম, আছে। কিন্তু এটি তো যৌনবাহিত রোগ নয়।'

'তা নয়। তবে যৌনসংশ্লিষ্ট সালমোনেলার প্রধান কারণ—ওরাল-অ্যানাল এবং ওরাল–জেনিটাল যৌনসম্পর্ক।'

'ও আচ্ছা।'

'বল তো টাইফয়েড কোন ধরনের রোগ?'

'এটি তো পানিবাহিত রোগ।'

'হ্যাঁ, পানিবাহিত রোগ, তবে এর যৌনসংশ্লিষ্ট প্রকারটির অন্যতম মূল কারণ—সমকামিতা। টাইফয়েড ছাড়াও মলাশয়ের প্রদাহ সমকামীদের মধ্যে অনেক কমন। এ ছাড়া গনোরিয়া, সিফিলিস, ক্ল্যামিডিয়া, এমিবিয়োসিস রোগগুলোও তাদের বেশি। অত্যন্ত বেশি। এসব রোগ থেকে অতি সহজেই মলাশয়ের প্রদাহ হতে পারে। সমকামী এইচআইভি আক্রান্তদের অনেকেই কাপোসিসারকোমা নামক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। অহ, ভালো কথা! রেক্টাল প্রলেপস ডিজিজের কথা মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'এটি কাদের হয়?'

'যারা অ্যানাল রুটে সংগম করে তাদের।'

রফিক ভাই এতক্ষণ নিঃশব্দে বসে কেবল কফি পান করছিলেন। কিন্তু কাপটা এখন শূন্য, তাই সেটা টেবিলে রেখে দিলেন। তাঁর শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। গরম যদিও কম, তবুও তিনি ঘামছেন। কেন ঘামছেন কে জানে! পকেট থেকে টিস্যু বের করে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'আমার একটা প্রশ্ন আছিল।'

ফারিস চায় রফিক ভাই তাকে প্রশ্ন করুক। তবে প্যাঁচে ফেলার জন্যে নয়; জানার জন্যে। রফিক ভাইয়ের মাথায় মিথ্যার যে বসত গড়ে উঠেছে, সেটা দূর হোক। তিনি আলোর পথ খুঁজে পান। তাই রফিক ভাইয়ের প্রশ্ন শুনে তাকে বেশ প্রসন্ন দেখালো। একটু মুচকি হেসে বলল, 'কী প্রশ্ন ভাই?'

'সমকামী পুলাগোরে সমস্যা অয়, হেইডা না হয় বুঝলাম, কিন্তু মাইয়্যাগো তো সমস্যা অইবার কতা না। তাইলে তাগোর সমকামিতা তো মাইনাই নেওন যায়। তুই কী কস?'

'সমকামী মেয়েরা মানে লেসবিয়ান যারা, তারা কি ওরাল সেক্স[৩৮] করে, নাকি অ্যানাল?'

'ওরাল।'

'কদিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার, ওরাল সেক্স নিয়ে একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে—বিবিসির অনলাইন পেইজে। সেটা দেখেছিলেন?'

'আমি ক্যামনে দেখমু? আমি কি সারাদিন বিবিসি লইয়া পইড়া থাহি? নাকি আমি বিবিসির সাংবাদিক? ভার্সিটিতে আমার অনেক কাম। কাম বাদ দিয়া এইসব চিপাচাপার খবর পড়ার মতন টাইম আমার নাই। তয় গনোরিয়া নাকি কি নিয়া একটা খবর চোখে পরছিল। হেডিং দেইখা আর ভিতরে যাই নাই।'

'রিপোর্টটি আপনার পড়ার দরকার ছিল। পড়লেই বুঝতে পারতেন ওরাল সেক্স কতটা বিপদজনক। ওদের রিপোর্টে বলা হয়—ওরাল সেক্সের মাধ্যমে গনোরিয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। গনোরিয়া জীবাণু সাধারণত যৌনাঙ্গ, মলদ্বার বা গলার ভেতরে সংক্রমণ ঘটায়। এর মধ্যে গলার সংক্রমণই সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অন্তত ৭৭টি দেশের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখেছে, গনোরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। প্রতিনিয়ত তা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এর জন্যে দায়ী—ওরাল সেক্স। ওরাল সেক্স গনোরিয়া জীবাণুকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ভয়ংকর মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া লেসবিয়ান নারীদের আরও অনেক সমস্যায় পড়তে হয়।'

'যেমন?'

'মাদকাসক্ত পুরুষের সঙ্গে লেসবিয়ানদের সঙ্গমের হার বিষমকামীদের থেকে ৩-৪ গুণ বেশি। এ ছাড়া লেসবিয়ানদের মধ্যে এইডসের হাই রিস্ক ফ্যাক্টর—ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ এবিউজ, পতিতাবৃত্তি এসবে জড়িত থাকার প্রবণতাও অত্যধিক।'

আমার কফি অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। ফারিসের কাপে এখনো অবশ্যি কিছু বাকি আছে। ফারিস শেষ চুমুকটা দিয়ে বলল, 'সমকামিতার আরও বড় সমস্যা হলো, একটা সময় সমকামীদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়।'

'বিকৃত হইয়্যা যায় মানে? কস কী আবোল-তাবোল? এইসব ইনফরমেশন তোরে কেডায় দিছে?' রফিক ভাই খানিকটা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'Coprofilia কাকে বলে, জানেন ভাই?' ফারিসের পাল্টা প্রশ্ন রফিক ভাইয়ের

[৩৮] Oral sex sometimes referred to as oral intercourse, is sexual activity involving the stimulation of the genitalia of a person by another person using the mouth (including the lips, tongue or teeth) or throat.

কাছে।

'হ জানি। Coprofilia হইতাছে এমন একটা আচরণ, যেইখানে ব্যক্তি পেশাব-পায়খানার কাছে আইলে আনন্দ পায়।' এটুকু বলে ভাই চেয়ারে হেলান দিলেন। মনোযোগ তাঁর কফির কাপের দিকে। কফি অনেক আগেই শেষ। তিনি কাপটা ঘুরাতে লাগলেন।

ফারিস বলল, 'ফিনল্যান্ডের একটি সার্ভে থেকে জানা যায়—১৭% সমকামী এই অস্বাভাবিক যৌনাচারে লিপ্ত। একবার চিন্তা করুন ভাই, সমকামীরা মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। তারপরেও এই অস্বাভাবিক যৌনাচার তাদের মধ্যে ১৭%। আনুপাতিক বিচারে এই পারসেন্টেজটা তাহলে কত বিশাল?'

'তারমানে তোর শেষ কতা অইলো, সমকামীদের রোগ-বালাই বেশি ওয়?'

'শুধু রোগভোগ নয়, অন্যান্য সমস্যাও আছে। সমকামীরা যৌনতাড়িত বেশি হয়। সমকামীদের মধ্যে ধর্ষকাম দেখা যায়। ৩৭% সমকামীই ধর্ষকামে লিপ্ত। বড় কথা হলো, একটা পর্যায়ে সমকামীরা আত্মবিধ্বংসী চিন্তা-চেতনার অধিকারী হয়ে যায়। New York Times এর প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়—সমকামী ব্যক্তির এইডসের ভাইরাস ছড়ানোর পরেও কোনও অনুতাপ থাকে না। কোনও অনুশোচনা বোধ আসে না। কারণ সমকামীরা উন্নাসিক প্রকৃতির হয়। সমাজ কিংবা রাষ্ট্র নিয়ে তাদের মাথাব্যথাই থাকে না। Bagley ও Tremblay-এর রিসার্চ থেকে দেখা যায়—সমকামী ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ২ থেকে ১৩.৯ গুণ বেশি।'

ফারিসের কথা শুনে রফিক ভাইয়ের ভ্রু যুগল কুঁচকে গেল। তিনি কিছুটা মোটা গলায় বললেন, 'তোর লাস্ট পয়েন্টটার সাথে আমি একমত হইতে পারলাম না।'

'কেন ভাই?'

'আত্মহত্যা কস আর মানসিক সমস্যাই কস, এইগুলার জন্য সমকামীরা দায়ী না। এইডার জন্যে দায়ী হোমোফোবিয়া। দায়ী সমাজের হুজুররা। যারা উঠতে বইতে সমকামীদের বিরোধিতা করে। আর হোমোফোবিয়া ছড়াইবার কাম করে। সমকামীদের সামাজিকভাবে মাইন্যা নিলে এই সমস্যাডা আর থাকব না।'

'ভাইয়ের নিশ্চয় জানা আছে, নেদারল্যান্ডে সমকামী বিয়ে আইনসিদ্ধ?'

'হ জানি। জানুম না কেন?'

'নেদারল্যান্ডের General Psychiatry-এর দেওয়া রিপোর্ট থেকে জানা যায়—তাদের দেশে সমকামীদের মধ্যে মানসিক সমস্যা অনেক বেশি। সমকামীরা বেশি মেন্টাল ডিপ্রেশনে ভোগে। কানাডা একটি উদার রাষ্ট্র, যেখানে সমকামিতা সাধারণ

বিষয়। কানাডায় বছরে যে কটি আত্মহত্যা ঘটে, তার মধ্যে ৩০% আত্মহত্যাকারী সমকামী। একটু লক্ষ করুন ভাই। এসব রাষ্ট্রে হোমোফোবিয়া নেই, তারপরেও সেখানে সমকামীদের মানসিক সমস্যা বেশি। আর এ থেকেই বোঝা যায়, সমকামীদের মানসিক সমস্যার কারণ হোমোফোবিয়া নয়, হুজুররাও নয়। ওরা নিজেরাই এর জন্যে দায়ী। তাদের যৌন-উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনই এর জন্যে দায়ী।'

'আইচ্ছা ফারিস, সমকামিতা তো খ্রিষ্টের জন্মের অনেক আগে থেইকাই চইলা আইতাছে। তাইলে এইডারে কি স্বাভাবিক আচরণ ধরা যাইব না?'

'ধর্ষণকে কি আপনি স্বাভাবিক আচরণ মনে করেন?'

'পাগলে কয় কী? হা হা হা। সাত খণ্ড রামায়ণ পইড়া কয় সীতা কার বাপ। ধর্ষণরে কি কোনও সুস্থ মানুষ স্বাভাবিক আচরণ বইলা মাইনা নিব? হা হা হা।'

'কেন নেবেন না ভাই? আপত্তি কোথায়? ধর্ষণ তো খ্রিষ্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই চলে আসছে।'

রফিক ভাই চুপচাপ। কফির কাপটিকে ঘুরাচ্ছেন। কপাল ভাঁজ করে কী যেন চিন্তা করছেন। হয়তো মনে মনে ভাবছেন, 'আমার শেষ টোপটাও ফারিসকে গেলানো গেল না।' রফিক ভাইয়ের নিস্তব্ধতা আমাকে সত্যিই আনন্দিত করছে। লোকটা অনেক ফাঁক-ফোকর খুঁজে ফারিসকে আটকানোর চেষ্টা করল। কোনওটাই কোনও কাজে আসল না। আসলে মিথ্যে যতই বিশাল হোক না কেন, তার স্থিতি নেই। মিথ্যে তো সমুদ্রের ফেনার মতো। ফেনা তো বিলীন হয়েই যায়।

রফিক ভাই চুপ করে আছেন দেখে ফারিস বলল, 'সমকামিতাকে সহজলভ্য করার জন্যে, আমেরিকাকে আজ চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। আমেরিকা এক যৌনবিকারগ্রস্ত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যৌনরোগ সেখানে মহামারি আকার ধারণ করেছে। ৬৫ মিলিয়ন আমেরিকান বিভিন্ন যৌনরোগে আক্রান্ত। যার মধ্যে শুধু এইডস-এ আক্রান্ত ১.২ মিলিয়ন। এদের ৫৪%-ই সমকামী। আমেরিকার মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩.৫% হলো সমকামী। তুলনামূলক অনুপাতে সমকামীরা একেবারেই নগণ্য, কিন্তু সংক্রমণের দিক থেকে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

শুধু ২০১২ সালে প্রায় পনেরো হাজার এইডস আক্রান্ত রোগী মারা যায়। যাদের মধ্যে ম্যাক্সিমামই হলো—গে অথবা লেসবিয়ান। যৌনরোগগুলোর ৫৭% সমকামীদের দ্বারা ছড়ায়। এত কিছুর পরেও যদি আপনি সমকামীদের পক্ষ নেন, তো আমার বলার কিছুই নেই। অ্যাজ ইওর উইশ ব্রাদার।'

কথা বলতে বলতে কোন দিক দিয়ে যে সময় পেরিয়ে গেছে, বুঝতেই পারিনি।

ফারিসের জাদুকরী কথার ছোঁয়ায় হারিয়ে গিয়েছিলাম মনে হয়। ক্লাসের সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি ফারিসকে ইশারা দিলাম। ও কথা থামিয়ে দিলো। সেদিনকার মতো রফিক ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

বিদায় নিয়ে আমরা ফ্যাকাল্টির দিকে যাত্রা করলাম। চলে যাওয়ার সময় আমি ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। মুখটা বেশ শুকনো দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন বাংলার পাঁচ। পরাজিত সৈনিকের মতো মনে হচ্ছিল। তিনি আজও ফারিসের কাছে হেরেছেন। মারাত্মকভাবে হেরেছেন। আর হবেনই-না কেন? সত্য কখনোই মিথ্যের সামনে জয়ী হতে পারে না। মিথ্যের সে ক্ষমতা নেই। মিথ্যে তো নিম্নগামী।

তথ্যসূত্র :

♦ ১) Hamer DH, Hu S, Magnuson VL, Hu N, Pattatucci AM (July 1993). A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation. Science, 7–321 : (5119) 261.

♦ ২) S. S. Witkin and J. Sonnabend, "Immune Responses to Spermatozoa in Homosexual Men," Fertility and Sterility, -337 : (3)39 342, pp. 1983) 341-340).

♦ ৩) New Evidence of a gay gene, by AnastasiaTouefexis, *Time,* November 13,1995, vol. 146, issue 20, p.95.

♦ ৪) George Rice, et al., "Male Homosexuality: Absence of Linkage to Microsatellite Markers at Xq28", Science, Vol. 284, p. 667.

♦ ৫) William Byne and Bruce Parsons, "Human Sexual Orientation : The Biologic Theories Reappraised," Archives of General Psychiatry, Vol. 50, March 239-228 :1993.

♦ ৬) Laumann EO, Gagnon JH, Michael RT, Michaels S. 1994. The Social Organization of Sexuality. Chicago : University of Chicago Press

♦ ৭) American Psychiatric Association. Fact sheet—"Gay,Lesbian and Bisexual Issues,", May, 2000.

♦ ৮) Henry Kazal, et al., "The gay bowel syndrome : Clinicopathologic correlation in 260 cases," Annals of Clinical and Laboratory Science, 1976) 192-184 : (2)6).

♦ ৯) "The HIV/AIDS Epidemic in the United States". Kaiser Family Foundation. March 2013 ,22. Retrieved June 2012 ,2.

♦ ১০) Hepatitis A among Homosexual Men—United States, Canada, and Australia," Morbidity and Mortality Weekly Report, CDC, :(09)41

164-161 ,155 (March 1992 ,06).
♦ ১১) "December 2008 Monthly HIV/AIDS Statistics" (PDF). California Department of Public Health Office of AIDS. July 2009 ,9. Retrieved March 2010 ,21.
♦ ১২) Glen E. Hastings and Richard Weber, "Use of the term 'Gay Bowel Syndrome', reply to a letter to the editor, American Family Physician, 1994) 582 : (3)49).
♦ ১৩) Paraphilias," Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, p. 576, Washington : American Psychiatric Association, 2000;
♦ ১৪) Karla Jay and Allen Young, The Gay Report: Lesbians and Gay Men Speak Out About Sexual Experiences and Lifestyles, pp. 555-554, New York: Summit Books (1979).
♦ ১৫) Mads Melbye, Charles Rabkin, et al., "Changing patterns of anal cancer incidence in the United States, 1989-1940," American Journal of Epidemiology, 780-772 : 139, p. 779, Table 1994) 2).
♦ ১৬) N. Kenneth Sandnabba, Pekka Santtila, Niklas Nordling (August 1999). "Sexual Behavior and Social Adaptation Among Sadomasochistically-Oriented Males". Journal of Sex Research.
♦ ১৭) Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archives of General Psychiatry, -85 : (1)58 91, p. 89 and Table 2 (January 2001).
♦ ১৮) Edward O. Laumann, John H. Gagnon, et al., The social organization of sexuality : Sexual practices in the United States, p. 293, Chicago : University of Chicago Press, 1994.
♦ ১৯) United States. HIV/AIDS Knowledge Base. University of California, San Francisco. Retrieved November 2011 ,25.
♦ ২০) "Estimating HIV Prevalence and Risk Behaviors of Transgender Persons in the United States : A Systematic Review". AIDS Behav. :(1) 12 17–1. Jan 2008. Doi : 10.1007/s3-9299-007-10461. PMID 17694429.
♦ ২১) Centers for Disease Control and Prevention, (CDC) (June 2011 ,3). "HIV surveillance—United States, 2008–1981". MMWR. Morbidity and mortality weekly report. 93–689 : (21) 60. PMID 21637182.
♦ ২২) R. R. Wilcox, "Sexual Behaviour and Sexually Transmitted Disease Patterns in Male Homosexuals," British Journal of Venereal Diseases, 1981) 167 ,169-167 : (3)57).
♦ ২৩) C. M. Thorpe and G. T. Keutsch, "Enteric bacterial pathogens: Shigella, Salmonella, Campylobacter," in K. K. Holmes, P. A. Mardh, et al., (Eds.), Sexually Transmitted Diseases (3rd edition), New York :

McGraw-Hill Health Professionals Division, 1999.
♦ ২৪) Dr. Rene Josef Bullecer's pamphlet on What You Should KnowAbout Homosexuality; Dr. Armand Fabella, Health & Homes, May-June 1989
♦ ২৫) "HIV in the United States". Center for Disease Control. September 2015 ,29. Retrieved June 2016 ,29.
♦ ২৬) United States". HIV/AIDS Knowledge Base. University of California, San Francisco. Retrieved November 2011 ,25.
♦ ২৭) Centers for Disease Control and Prevention, (CDC) (June ,3 2011). "HIV surveillance—United States, 2008–1981".
♦ ২৮) http://www.bbc.com/bengali/news40546773-
♦ ২৯) http://www.cdc.gov/hiv/topics/msm/index.htm
♦ ৩০) http://www.springerlink.com/content/jx13231641717w48/
♦ ৩১) http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/qa22.htm
♦ ৩২) http://www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsstrategygoals by 2015/
♦ ৩৩) http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/basic.htm#incid ence
♦ ৩৪) http://www.journals.uchicago.edu/CID/journal/issues/v38 n30832/30832/2.html?erFrom=8997763093503343538-Guest
♦ ৩৫) http://www2.law.ucla.edu/williamsinstitute/pdf/How-many-people-are-LGBT-Final.pdf
♦ ৩৬) http://www.theatlantic.com/science/archive/10/2015/no-scie ntists-have-not-found-the-gay-gene/410059/
♦ ৩৭) http://www.evolvedworld.com/articles/item/-169back-to-sch ool-sex101-
♦ ৩৮) http://www.yourtango.com/experts/ava-cadell–ph-d—ed-d/-3 reas ons-men-cheat
♦ ৩৯) https://concernedwomen.org/images/content/bornorbred.pdf
♦ ৪০) http://www.youth-suicide.com/gay-bisexual/gbsuicide1.htm

অভিশপ্ত সভ্যতার আর্তনাদ

আমার আসার কথা ছিল ভোর ছ-টায়। এসেছি ছ-টা বেজে দুই মিনিটে। এসে দেখি ফারিস ঠিক সেকেন্ড গেইটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সময়কে ফারিস অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাজে কাজে সময় নষ্ট করে না কখনো। যতটুকু অবসর পায়, কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। আর করবেই-বা না কেন? সময়ানুবর্তিতা যার ব্রত, সে কি সময়কে অপচয় করতে পারে? পারে না। তাই বরাবরের মতো আজও বিলম্ব করেনি। ঠিকঠাক ছ-টায় এসেছে।

ফজরের সালাতের পর ফারিস হাঁটে নিয়মিত। সেকেন্ড গেইট থেকে ইকোপার্কের শেষ মাথা পর্যন্ত। অবশ্যি তারও একটা কারণ আছে। ফজরের পরে ঘুমের উপদ্রব দেখা দেয়। ঘণ্টাখানিক যুদ্ধ করেও ঘুমকে জয় করা দায়। ঘুমেরই জয় হয়। একবার ঘুমিয়ে গেলে আটটায় ক্লাস ধরাটা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ফারিস ঘুম তাড়ানোর জন্যে হাঁটে। অবশ্যি শুধু হাঁটেই না, সকালের যিকিরগুলোও পুরো করে নেয়। একেবারে এক ঢিলে দুই পাখি।

বিগত দিনের তুলনায় আজ ফারিসকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। দেখাবেই না কেন! সাদা পাঞ্জাবিতে টগবগে ফর্সা যুবকের চেহারা সুন্দর দেখাবে না? অবশ্যই দেখাবে। তবে সে সৌন্দর্য সরাসরি না দেখে—শত ভাগ উপলব্ধি করা দায়। ফারিস আমাকে দেখে তার সুন্দর হাসিটা উপহার দিয়ে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম।'

'ওয়ালাইকুম আসসালাম।'

'কী, ঘুমের ঘোর কেটেছে তাহলে?'

প্রতিদিন নিয়ত করি, কাল ফজরের পর আর ঘুমাব না। কিন্তু সে কাল কালই রয়ে যায়। একদিন ফজরের পরে না ঘুমিয়ে জেগে ছিলাম। সকালের আবহাওয়া যে এত মিষ্টি হতে পারে, সেদিন অনুধাবন করেছিলাম। বেশ ভালো লেগেছিল। সারাদিন মেজাজ ফুরফুরে ছিল। তাই আজ থেকে পণ করেছি—আর সকালে ঘুমাব না। যত ঘুম আসুক না কেন, তাকে জয় করবই করব। সে জয়ের কিঞ্চিৎ প্রচেষ্টা হিসেবেই ফারিসের সাথে হাঁটতে আসা।

ফারিসের উত্তরে আমি বললাম, 'পার্কের দিকে যাবি?'

‘হুঁ।’

‘চল।’

ইকোপার্কের প্রধান ফটকে বেশ বড় অক্ষরে লিখা—‘বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকেন্দ্র’। মজার ব্যাপার হলো, ভেতরে কোনও প্রাণীই নেই। আছে কেবল প্রাণীদের জন্যে বানানো খাঁচা। লোহার খাঁচা। প্রাণী না থাকায় কিছুটা সুবিধেই হয়েছে। যখন ইচ্ছে পার্কে ঢোকা যায়। অবশ্যি প্রাণী থাকলে এই সুবিধেটা পাওয়া যেত না। পার্কের ভেতরে ইট-সিমেন্টের বেঞ্চিও আছে। ইচ্ছেমতো সেখানে জিরিয়ে নেওয়া যায়।

হাঁটার অভ্যাস আমার খুবই কম। নেই বললেই চলে। মিনিট দশেক হেঁটেই ক্লান্তি ধরেছে। তাই পাশের খালি বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। অগত্যা ফারিসকেও বসতে হলো। কিছুক্ষণ পর ফারিস পকেট থেকে বাদাম বের করল। এরপর আমার হাতে দিয়ে বলল, ‘এই নে। বাদাম চিবুতে থাক।’

এত সকালে পার্কে বাদাম পাওয়াটা সত্যিই দুষ্কর। তাই হয়তো ফারিস বাদাম সাথে করে নিয়ে এসেছে। আমি বাদাম চিবুতে চিবুতে বললাম, ‘জানিস! আজ খুব মজার একটা স্বপ্ন দেখেছি।’

‘কী স্বপ্ন?’

‘তুই, আমি, আর অর্ক মিলে কোথাও বেড়াতে গেছি। জায়গাটার নামটা মনে পড়ছে না। ভুলে গেছি। আমি দেখলাম, অর্ক তোর হাত ধরে আছে। ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কণ্ঠটা ভেজা ভেজা মনে হচ্ছে। তোকে কিছু বলতে চাচ্ছে। বলতে গিয়ে বার বার আটকে যাচ্ছে। নিজ হাতে চোখের জল মুছছে। তোকে কিছু বলতে যাবে ... নাহ! ভুলে যাচ্ছি। কী যেন বলল? কী যেন বলল...।’

‘থাক, আর কষ্ট করে মনে করতে হবে না।’

‘তবে স্বপ্নের শেষ দিকটা মনে আছে।’

‘শেষে কী হলো?’

‘অর্ক আমাদের সাথে সালাত আদায় করল।’

‘সত্যিই! আলহামদুলিল্লাহ। তোর স্বপ্ন যেন সত্যি হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, “কিয়ামতের আগে মু’মিনের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে। কেননা মু’মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর নবুয়তের কোনও কিছুই অবাস্তব হতে পারে না”।’[৩৯]

‘আল্লাহ্ কবুল করুন। স্বপ্ন জিনিসটা আমার কাছে বেশ অদ্ভুত লাগে রে দোস্ত।’

[৩৯] বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং : ৬৫৪৪।

'কেন?'

'কেন, তা জানি না। তবে লাগে। খুব অদ্ভুত লাগে। আচ্ছা দোস্ত, মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে?'

'রাসূল ﷺ বলেছেন, স্বপ্ন তিন প্রকার। এক. ভালো স্বপ্ন, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। দুই. ব্যক্তির মনের চিন্তাভাবনা—স্বপ্নের আকারে। তিন. দুশ্চিন্তায় ফেলার স্বপ্ন, যা শয়তানের পক্ষ থেকে।[৪০] মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে, এই নিয়ে বিজ্ঞান প্রধানত দুটি তত্ত্ব দিয়েছে। একটি হলো মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব, আরেকটি সক্রিয় সংশ্লেষণ মডেল তত্ত্ব।

প্রথমটিতে বলা হয়েছে—স্বপ্ন হলো মানুষের অবদমিত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে মানুষের অনেক চিন্তাই অবদমিত থাকে। এই অবদমিত চিন্তাগুলো এত প্রকট অবস্থায় থাকে যে, স্বপ্নের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে। এ সম্পর্কে ফ্রয়েড বলেন, স্বপ্ন হচ্ছে অবদমিত আকাঙ্ক্ষার ছদ্মবেশী তৃপ্তিকরণ।

অপর মতবাদে বলা হয়েছে—ঘুমের REM পর্যায়ে Brainstem এর circuit গুলো সক্রিয় হয়। যা ব্রেইনের পাশের amygdala, hippocampus সহ limbic system-কে সক্রিয় করে। Limbic system আবেগ, সংবেদন ও স্মৃতির সাথে জড়িত। আমাদের ব্রেইন এই অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকে সংশ্লেষণ করে। এরপর অর্থপূর্ণ করে তোলে। যার ফলে আমরা স্বপ্ন দেখি। মজার ব্যাপার কী জানিস?'

'কী?'

'মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও স্বপ্ন দেখে।'

'সত্যিই?'

'হ্যাঁ, সত্যিই। কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীরাও স্বপ্ন দেখে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন—স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রে মানুষের মস্তিষ্ক-তরঙ্গের যে পরিবর্তন হয়, একই পরিবর্তন প্রাণীদের ক্ষেত্রেও হয়।'

'বেশ মজার তো!'

'হ্যাঁ, সত্যিই মজার।'

আমি স্বপ্ন নিয়ে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার সে ইচ্ছেটুকু অপূর্ণই রয়ে গেল। জুতার আওয়াজ আমাদের আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটাল।

আওয়াজটা ক্রমেই জোরালো হয়ে আসছে। আমি পেছন ফিরে তাকালাম। রকি! এত সকালে! ব্যাপার কী? আর এত মোটা ছেলেটা এভাবে দৌড়াচ্ছে কেন? কোনও

[৪০] তিরমিযী, *আস-সুনান,* হাদীস নং : ২২৯১।

বিপদ হয়েছে নাকি?

আমাদের নিকট এসে রকি তার দৌড় থামালো। এরপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস।'

'মর্নিং।' ফারিস জবাব দিলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত সকালবেলা? দৌড়াচ্ছিস কেন? কী হয়েছে?'

রকি হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিলো, 'না, তেমন কিছু হয়নি। শরীরের সুগার লেভেলটা একটু ইনক্রিজ হয়েছে। ডক্টর বলেছেন, এভরিডে মিনিমাম টু টাইমস জগিং করতে হবে। তাই।'

'খেয়ে খেয়ে যে শরীর বানিয়েছিস না, কদিন পর তো দরজা দিয়ে বেরই হতে পারবি না। দরজা কেটে বের করতে হবে। শরীরটা একটু কমা, বুঝলি?'

'হয়েছে হয়েছে, আর জ্ঞান দিতে হবে না। সো হোয়াট আর ইউ গাইজ ডুয়িং হিয়ার?'

'কিছু না। বাতাস খাচ্ছি। সুগার-ফ্রি। খাবি?'

আমার কথার উত্তর না দিয়ে রকি থপাস করে বসে পড়ল। বসার কারণটা অবশ্যি তখন বুঝতে পারলাম, যখন সে বাদামের প্যাকেটটা নিমেষেই শেষ করে দিলো। সারাদিন খাই খাই করাটা ওর অভ্যাস। একেবারে হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তা-ই খেতে থাকে। বাদাম শেষ করে বলল, 'এনিথিং মোর?'

'ইয়েস।' ফারিস জবাব দিলো।

'গিভ মি ব্রাদার।'

ফারিস পকেট থেকে চকলেট বের করে রকির হাতে দিলো। চকলেট খেতে খেতে ও বলল, 'তোদের দেখলে মাঝে মাঝে হাসি পায়। ওয়ার্ল্ড কতদূর এগিয়ে গেছে, আর তোরা! তোরা একেবারে ব্যাকডেটেড। হাজার বছর পিছিয়ে আছিস। সো স্যাড ম্যান! সো স্যাড!'

ফারিস বলল, 'পিছিয়ে আছি মানে?'

'মানে আবার কী? ওয়ার্ল্ড কতটা মডার্ন হয়েছে, আর তোরা এখনো সেই মধ্যযুগীয় কালচার আঁকড়ে ধরে আছিস। এই যুগে কি এসব মানায়? কতবার বললাম, এগুলো ছাড়। ছেড়ে মডার্ন হতে ট্রাই কর।'

'তোর কাছে আধুনিকতা মানেই তো—পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ!'

'তা তুই যা বলার বল। বাট মাইন্ড ইট, ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশান লাইফকে অনেক ইজি করে দিয়েছে। আমাদের আলট্রা মর্ডান করেছে। ডার্কনেস থেকে লাইটের দিকে নিয়ে এসেছে। সাইন্স শিখিয়েছে। এই যে দেখ—আজ আমরা চকলেট খাচ্ছি, পিৎজা খাচ্ছি, বার্গার খাচ্ছি; অথচ একটা সময় তো এগুলোর নামও আননউন ছিল।'

রকি পাশ্চাত্য-সভ্যতার একনিষ্ঠ অনুসারীদের একজন। যারা পাশ্চাত্যের রঙে রঙ বদলায়, পাশ্চাত্যের সুরে তাদের সুর বদলায়, যাদের ধ্যানধারণা পাশ্চাত্যের ধাঁচে পরিচালিত হয়, রকি তাদেরই একজন। ওর পোশাক থেকে শুরু করে হেয়ার স্টাইল, সবটাই পাশ্চাত্যের আদলে পরিচালিত। ওর মুখ দিয়ে এমন কথা বের হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

রকির চকলেট খাওয়া অর্ধেক হলে ফারিস বলল, 'পড়াশোনা শেষ করে আমেরিকান এম্বাসিতে একটা চাকরি নিস। তোর জন্যে খুব ভালো হবে। মাসে মাসে মাইনে পাবি, আর পাশ্চাত্যের জয়গান গেয়ে বেড়াবি।'

ফারিসের কথা শুনে রকিকে কিছুটা আনন্দিতই দেখালো। সে বলল, 'সে জন্যেই তো IELTS করে যাচ্ছি। সুযোগ পেলেই ট্রাই করব। সে আর তোকে বলতে হবে না।'

'আচ্ছা রকি, পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে তোর এত বেশি ভালো লাগার কারণ কী?'

'স্ট্রেইঞ্জ! লাগবে না? যারা আমাদের মডার্নিজম শিখিয়েছে, ম্যান-ওম্যানের ইকুয়ালিটি শিখিয়েছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা শিখিয়েছে; তাদের থ্যাংস দেবো না? আমি কি এতই আনগ্রেটফুল নাকি?'

রকি কথাগুলো এমনভাবে বলছে—মনে হচ্ছে যেন পাশ্চাত্য-সভ্যতা না এলে আমরা বন্য থাকতাম। পাশ্চাত্য এসে আমাদের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে দিয়েছে। রকির কথা শুনে ফারিস বলল, 'আসলেই দোস্ত, পাশ্চাত্য আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। পাশ্চাত্য শিখিয়েছে—কীভাবে বছরে লাখ লাখ ধর্ষণ করা যায়। কীভাবে নিজের বোনের সাথে সেক্স করা যায়। কীভাবে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করা যায়। কীভাবে পর্নোগ্রাফির নেশায় আসক্ত হওয়া যায়। কীভাবে মদের নেশায় বুঁদ হওয়া যায়। সত্যিই, অনেক কিছু শিখিয়েছে।'

ফারিসের কথা শুনে রকির গোলগাল মুখখানা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। চোখগুলো বড় বড় করে ফারিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর ইউ ম্যাড! তোদের নজরে কি ভালো জিনিসগুলো ফুটে ওঠে না? নাকি মনের মধ্যে শুধু নেগেটিভ থিংকিং কাজ করে? বি পজেটিভ ম্যান। তোদের মতো মোল্লারা ওয়ার্ল্ডকে আধুনিক করেনি, তারাই করেছে। তারা যদি আমাদের পথ না দেখাত, তাহলে আমরা ব্যাকডেটেড থাকতাম!'

ফারিস মুচকি হেসে জবাব দিলো, 'সেটাই মনে হয় ভালো ছিল।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'সে না হয় পরে বলছি। তার আগে বল পাশ্চাত্যের কোন দেশকে তোর বেশি ভালো লাগে?'

'কোনটা আবার? ইউএসএ। শুধু আমারই না, যাদের মডার্ন কালচার শেখার ইন্টারেস্ট আছে, তাদের সবার কাছেই। দেখিস না, কেউ একবার ইউএসএ-তে যাওয়ার সুযোগ পেলে আর হাতছাড়া করতে চায় না। পাপার সাথে আমিও বেশ ক-বার গিয়েছি। কী যে ভালো লেগেছিল! ইউ ক্যান্ট রিয়েলাইস দিস। স্বপ্নের মতো একটি কান্ট্রি। ওফফ! ভাবতেই কেমন থ্রিলিং লাগে।'

রকিকে না থামালে মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে একটা লম্বাচওড়া লেকচার দিয়ে ফেলত। ফারিস বলল, 'আচ্ছা রকি, তোর কি জানা আছে—যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর কী পরিমাণ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে?'

'এটা আবার জানার কী হলো? সব কান্ট্রিতেই তো কম বেশি রেইপের ঘটনা ঘটে। এস ইউজুয়াল, সেখানেও কিছু ঘটবে।'

'সেই কিছুটা কত, জানিস?'

'অনেক বড় কান্ট্রি তো, থাউজ্যান্ড প্লাস হবে হয়তো।'

'হাজার কয়েক?'

'এনিথিং রং?'

'ভুল মানে, মারাত্মক ভুল। শুধু ২০০৫ সালে আমেরিকায় প্রায় দুই লক্ষের মত নারী ধর্ষিত হয়। ২০১৫ সালে যা তিন লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। জর্জ ম্যাসন ইউনিভার্সিটির গবেষণা বলছে, প্রতি ৩ জন নারীর ১ জন, একবার হলেও ধর্ষিত হয়। গবেষণার আরও ভয়াবহ তথ্য হলো—প্রতিবছর দেশটির ৬৮ শতাংশ নাগরিক, ধর্ষণ ও যৌননির্যাতনের শিকার হয়। আর অপরাধীদের ৯৮ ভাগেরই কোনও বিচার হয় না। ন্যাশনাল ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন-এর সার্ভে অনুযায়ী, আমেরিকার প্রতি ৬ জন মহিলার মধ্যে ১ জন ধর্ষিত হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানটা ৩৩ জনে ১ জন।'

রকি বাকি চকলেটটা শেষ করে বলল, 'তুই পড়ে আছিস রেইপ নিয়ে। এগুলো সেখানে নর্মাল ব্যাপার। তোরা এসব নিয়ে যতটা মাথা ঘামাস, অ্যামেরিকানরা ততটা মাথা ঘামায় না। সাইন্স এন্ড টেকনোলোজির দিক দিয়ে অ্যামেরিকা কতদূর এগিয়ে

গেছে, সে খেয়াল আছে তোর?'

'সত্যিই অনেক দূর এগিয়ে আছে। কিন্তু যে দেশে এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, তারা কেন তাদের নাগরিকদের মৃত্যুর হার কমাতে পারছে না?'

'সরি!'

'তোর প্রিয় দেশ আমেরিকা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিতে গিয়ে এমন সমস্যায় পড়েছে যে, তার খেসারত কোনও দিন দিয়ে শেষ করতে পারবে না।'

'আরেকটু ক্লিয়ারলি বল। এত প্যাঁচাচ্ছিস কেন?'

'তোর কি জানা আছে, প্রতিবছর আমেরিকায় অ্যালকোহল জনিত কারণে কী পরিমাণ মানুষ মারা যায়?'

'নো। আই হ্যাভ নো আইডিয়া।'

রকির প্রিয় দেশ আমেরিকা। ওর দেখা সবচেয়ে ভালো দেশও আমেরিকা। অথচ সে দেশের এই সামান্য তথ্যও তার কাছে নেই। ও কী দেখে আমেরিকার প্রতি পাগল হয়েছিল, কে জানে?

রকির মুখে না-সূচক জবাব শুনে ফারিস বলল, 'প্রতিবছর প্রায় নব্বই হাজার লোক অ্যালকোহল জনিত কারণে মারা যায়।'

'রিয়েলি?'

'মিথ্যা হবে কেন? এটা তো আমার বানানো কোনও তথ্য না। তোর প্রিয় দেশের Centers for Disease Control-এর দেওয়া তথ্য।'

রকি এবার সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেল। এত ভালোবাসার দেশের শোচনীয় অবস্থাটা ওর মনে হয় জানা ছিল না। গোপন ছিল। আজ তা প্রকাশ পেল। যে দেশের বিজ্ঞান এতটা উন্নত, সে দেশে এত এত মানুষ অ্যালকোহলের কারণে মারা যাচ্ছে, এটা কি ভাবা যায়? তাই হয়তো রকি চিন্তায় পড়ে গেছে। রকির চিন্তিত মুখ দেখে ফারিস বলল, 'তুই কি জানিস, প্রতিবছর অ্যালকোহলের পেছনে কত টাকা ব্যয় হয় আমেরিকায়?'

রকি না-সূচক মাথা নাড়ল। জবাবটা ফারিসই দিলো। সে বলল, 'প্রায় দু শ পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার।'

ফারিসের দেওয়া তথ্য শুনে আমি যতটা বিস্মিত হলাম, রকিকে তার অর্ধেকও বিচলিত মনে হলো না। সে বরং প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে বলল, 'তবে যা-ই বলিস না কেন, ইউএসএ-তে ক্রাইম অনেক কম। তারা আমাদের থেকে অনেক বেশি অনেস্ট।'

'কেউ যদি আপনার সামনে গাঁজা খায়, আপনি কি তাকে বাধা দেবেন?'

'বাধা দিমু না মানে? এইডা তুই কী কস?'

'কেন বাধা দিবেন? গাঁজা খাওয়াটা তো ব্যক্তি-স্বাধীনতা! বাধা দিলে তো আপনি তার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেন!'

'রাখ তোর স্বাধীনতা। গাঞ্জা খাইলে হের শরীলো কী পরিমাণ ক্ষতি অইব, তুই জানস? তারে অবশ্যই এই কাম থেইকা ফিরাইয়্যা রাহন লাগব।'

'সমকামীদেরও বাধা না দিলে যে রোগব্যাধি তাদের শরীরে বাসা বাঁধবে, সে খেয়াল কে করবে ভাই? সমকামিতার সাথে জীবন-মরণ সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। জীবনটাই যদি না থাকে, তাহলে অযথা মরীচিকার পেছনে দৌড়িয়ে লাভ কী? সমকামিতাকে যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলা হয়, তবে মদপান, ধূমপান, ইয়াবা—এসবকেও তা-ই বলতে হবে। '

'তুইতো আবার ঘুইরা ফিইরা হেই পুরান প্যাঁচালই শুরু করলি।'

'কী করবো বলেন? বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে—অ্যানাল সেক্স অন্য যেকোনও সেক্সের চাইতে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এর মাধ্যমে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজগুলো[৩৫] দ্রুত ছড়ায়। সমকামীদের মধ্যে এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়ার হার বেশি। অন্য যৌনরোগও তাদের বেশি হয়। যেমন, গে-বাওয়েল সিনড্রোম সমকামীদের বেশি হয়। তাই এর নাম গে-বাওয়েল সিনড্রোম। আচ্ছা ভাই বলেন তো, এইডস, সিফিলিস, কিংবা গনোরিয়ার মধ্যে কোনটা সবচাইতে বেশি ক্ষতিকর?'

'কোনডা আবার? এইডস। এইডা তো সবাই জানে। এইডার কোনও অশুধ এহনো আবিষ্কার অয়নাই।'

'আপনি শুনলে হয়তো অবাক হবেন, মরণঘাতী এইডসের অন্যতম কারণ—সমকামিতা।'

'কয়দিন আগে একটা বাংলা পত্রিকায় দেখলাম এইডা লেখছে। তুই কি ঐখান থেইকা কপি করতাছস নি?'

'না ভাই। আমি কোনও বাংলা পত্রিকা থেকে বলছি না। আমেরিকান সেন্ট্রাল ফর ডিজিজ কন্ট্রোল[৩৬], বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, UNAIDS-এর রিপোর্ট থেকে বলছি। তারা দেখিয়েছে যে, সমকামিতা এইডসের বড় রিস্ক ফ্যাক্টর। CDC-এর তথ্য থেকে আরও জানা যায়, ১৯৯৮ সালে আমারিকায় নতুন এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিদের মধ্যে

[৩৫] Sexually transmitted diseases are those diseases that are commonly spread by sex, especially vaginal intercourse, anal sex or oral sex.
[৩৬] CDC

৫৪%-ই ছিল সমকামী। ২০০৯ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত CDC-এর একটি রিপোর্ট বলছে, অন্যদের চেয়ে এইডস সংক্রমণের হার সমকামীদের বেশি। অনেক বেশি। প্রায় ৫০ গুণ বেশি। UNAIDS-এর ২০১৫ সালের রিপোর্টও একই কথাই বলেছে।'

ফারিসের কথা শুনে রফিক ভাইয়ের মাথা ধরছে মনে হলো। তাঁর কপালের ভাঁজ স্পষ্টতই দৃশ্যমান হচ্ছে। হয়তো মনে মনে ভাবছেন, 'যাকগে! আর প্রশ্ন করার দরকার নেই। না জানি কোন বিপদ হয়। যেভাবে ফারিস আমার দাদার ভুলগুলো টেনে টেনে বের করছে, আবার কিছু বললে মনে হয় থলের বিড়াল সব বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং চুপ থাকি। চুপ থাকাই শ্রেয়।'

চুপচাপ ভাই কফি খাচ্ছেন। ফারিসও খাচ্ছে। আমি এক চুমুক দিয়ে বললাম, 'আচ্ছা ফারিস, সমকামিতা কি যৌনরোগ ছাড়া অন্যান্য রোগের জন্যেও দায়ী? যেমন, ক্যান্সার বা এই টাইপের কিছু?'

আমার প্রশ্ন শুনে ফারিস বলল, 'গুড পয়েন্ট। অনেক সুন্দর একটা প্রশ্ন করছিস। নয়তো আমার এই পয়েন্টটা মনেই আসত না। জাজাকাল্লাহ দোস্ত। সমকামিতা শুধু যৌনরোগই নয়, অন্যান্য রোগও ছড়ায়। ক্যান্সার হলো তাদের মধ্যে অন্যতম।'

'মেকানিজমটা কী দোস্ত?'

'অ্যানাল সেক্সের[৩৭] ফলে মলাশয়গাত্রে ক্ষত হতে পারে, যেটা তুই নিজেই বলেছিস। প্যাপিলোমা ভাইরাস সহজেই অ্যানাল রুট দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। ক্ষতের মাধ্যমে ভাইরাসটি অল্প সময়েই রক্তের সাথে মিশে যায়। তাই অ্যানাল ক্যান্সার সমকামীদের মধ্যে বেশি। Nursing Clinic of North America-এর ২০০৪ সালের একটি রিপোর্ট বলছে—এইডস আক্রান্ত ৯০% এবং এইডস ব্যতীত ৬৫% সমকামীদের দেহে—Human Papilloma Virus আছে; যা ক্যান্সারের জন্যে দায়ী। সমকামীদের অ্যানাল ক্যান্সারের ঝুঁকি বিষমকামীদের থেকে ১০ গুণ বেশি। আর এইডস আক্রান্ত সমকামীদের এ ঝুঁকির পরিমাণ আরও বেশি। প্রায় ২০ গুণ।'

'ক্যান্সার ছাড়া অন্য রোগের ঝুঁকি তাদের মধ্যে কেমন?'

'অন্যান্য রোগও তাদের মধ্যে বেশি। যেমন ধর, হেপাটাইটিস-এ। এ রোগটি সমকামীদের বেশি হতে দেখা যায়। ১৯৯১ সালে নিউইয়র্কে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সে সময়ে ৭৮% হেপাটাইটিস-এ তে আক্রান্ত ব্যক্তি ছিল—সমকামী। এ ছাড়া বিভিন্ন প্যারাসাইটিক ও ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজও সমকামীদের বেশি হয়ে থাকে।'

---

[৩৭] Anal sex is generally the insertion and thrusting of the erect penis into a person's anus or anus and rectum for sexual pleasure.

'যেমন?'

'সালমোনেলা সম্পর্কে ধারণা আছে?'

'হুম, আছে। কিন্তু এটি তো যৌনবাহিত রোগ নয়।'

'তা নয়। তবে যৌনসংশ্লিষ্ট সালমোনেলার প্রধান কারণ—ওরাল-অ্যানাল এবং ওরাল–জেনিটাল যৌনসম্পর্ক।'

'ও আচ্ছা।'

'বল তো টাইফয়েড কোন ধরনের রোগ?'

'এটি তো পানিবাহিত রোগ।'

'হ্যাঁ, পানিবাহিত রোগ, তবে এর যৌনসংশ্লিষ্ট প্রকারটির অন্যতম মূল কারণ—সমকামিতা। টাইফয়েড ছাড়াও মলাশয়ের প্রদাহ সমকামীদের মধ্যে অনেক কমন। এ ছাড়া গনোরিয়া, সিফিলিস, ক্ল্যামিডিয়া, এমিবিয়োসিস রোগগুলোও তাদের বেশি। অত্যন্ত বেশি। এসব রোগ থেকে অতি সহজেই মলাশয়ের প্রদাহ হতে পারে। সমকামী এইচআইভি আক্রান্তদের অনেকেই কাপোসিসারকোমা নামক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। অহ, ভালো কথা! রেক্টাল প্রলেপস ডিজিজের কথা মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'এটি কাদের হয়?'

'যারা অ্যানাল রুটে সংগম করে তাদের।'

রফিক ভাই এতক্ষণ নিঃশব্দে বসে কেবল কফি পান করছিলেন। কিন্তু কাপটা এখন শূন্য, তাই সেটা টেবিলে রেখে দিলেন। তাঁর শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। গরম যদিও কম, তবুও তিনি ঘামছেন। কেন ঘামছেন কে জানে! পকেট থেকে টিস্যু বের করে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'আমার একটা প্রশ্ন আছিল।'

ফারিস চায় রফিক ভাই তাকে প্রশ্ন করুক। তবে প্যাঁচে ফেলার জন্যে নয়; জানার জন্যে। রফিক ভাইয়ের মাথায় মিথ্যার যে বসত গড়ে উঠেছে, সেটা দূর হোক। তিনি আলোর পথ খুঁজে পান। তাই রফিক ভাইয়ের প্রশ্ন শুনে তাকে বেশ প্রসন্ন দেখালো। একটু মুচকি হেসে বলল, 'কী প্রশ্ন ভাই?'

'সমকামী পুলাগোরে সমস্যা অয়, হেইডা না হয় বুঝলাম, কিন্তু মাইয়্যাগো তো সমস্যা অইবার কতা না। তাইলে তাগোর সমকামিতা তো মাইনাই নেওন যায়। তুই কী কস?'

'সমকামী মেয়েরা মানে লেসবিয়ান যারা, তারা কি ওরাল সেক্স[৩৮] করে, নাকি অ্যানাল?'

'ওরাল।'

'কদিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার, ওরাল সেক্স নিয়ে একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে—বিবিসির অনলাইন পেইজে। সেটা দেখেছিলেন?'

'আমি ক্যামনে দেখমু? আমি কি সারাদিন বিবিসি লইয়া পইড়া থাহি? নাকি আমি বিবিসির সাংবাদিক? ভার্সিটিতে আমার অনেক কাম। কাম বাদ দিয়া এইসব চিপাচাপার খবর পড়ার মতন টাইম আমার নাই। তয় গনোরিয়া নাকি কি নিয়া একটা খবর চোখে পরছিল। হেডিং দেইখা আর ভিতরে যাই নাই।'

'রিপোর্টটি আপনার পড়ার দরকার ছিল। পড়লেই বুঝতে পারতেন ওরাল সেক্স কতটা বিপদজনক। ওদের রিপোর্টে বলা হয়—ওরাল সেক্সের মাধ্যমে গনোরিয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। গনোরিয়া জীবাণু সাধারণত যৌনাঙ্গ, মলদ্বার বা গলার ভেতরে সংক্রমণ ঘটায়। এর মধ্যে গলার সংক্রমণই সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অন্তত ৭৭টি দেশের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখেছে, গনোরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। প্রতিনিয়ত তা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এর জন্যে দায়ী—ওরাল সেক্স। ওরাল সেক্স গনোরিয়া জীবাণুকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ভয়ংকর মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া লেসবিয়ান নারীদের আরও অনেক সমস্যায় পড়তে হয়।'

'যেমন?'

'মাদকাসক্ত পুরুষের সঙ্গে লেসবিয়ানদের সঙ্গমের হার বিষমকামীদের থেকে ৩-৪ গুণ বেশি। এ ছাড়া লেসবিয়ানদের মধ্যে এইডসের হাই রিস্ক ফ্যাক্টর—ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ এবিউজ, পতিতাবৃত্তি এসবে জড়িত থাকার প্রবণতাও অত্যধিক।'

আমার কফি অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। ফারিসের কাপে এখনো অবশ্যি কিছু বাকি আছে। ফারিস শেষ চুমুকটা দিয়ে বলল, 'সমকামিতার আরও বড় সমস্যা হলো, একটা সময় সমকামীদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়।'

'বিকৃত হইয়্যা যায় মানে? কস কী আবোল-তাবোল? এইসব ইনফরমেশন তোরে কেডায় দিছে?' রফিক ভাই খানিকটা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'Coprofilia কাকে বলে, জানেন ভাই?' ফারিসের পাল্টা প্রশ্ন রফিক ভাইয়ের

[৩৮] Oral sex sometimes referred to as oral intercourse, is sexual activity involving the stimulation of the genitalia of a person by another person using the mouth (including the lips, tongue or teeth) or throat.

কাছে।

‘হ জানি। Coprofilia হইতাছে এমন একটা আচরণ, যেইখানে ব্যক্তি পেশাব-পায়খানার কাছে আইলে আনন্দ পায়।’ এটুকু বলে ভাই চেয়ারে হেলান দিলেন। মনোযোগ তাঁর কফির কাপের দিকে। কফি অনেক আগেই শেষ। তিনি কাপটা ঘুরাতে লাগলেন।

ফারিস বলল, ‘ফিনল্যান্ডের একটি সার্ভে থেকে জানা যায়—১৭% সমকামী এই অস্বাভাবিক যৌনাচারে লিপ্ত। একবার চিন্তা করুন ভাই, সমকামীরা মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। তারপরেও এই অস্বাভাবিক যৌনাচার তাদের মধ্যে ১৭%। আনুপাতিক বিচারে এই পারসেন্টেজটা তাহলে কত বিশাল?’

‘তারমানে তোর শেষ কতা অইলো, সমকামীদের রোগ-বালাই বেশি ওয়?’

‘শুধু রোগভোগ নয়, অন্যান্য সমস্যাও আছে। সমকামীরা যৌনতাড়িত বেশি হয়। সমকামীদের মধ্যে ধর্ষকাম দেখা যায়। ৩৭% সমকামীই ধর্ষকামে লিপ্ত। বড় কথা হলো, একটা পর্যায়ে সমকামীরা আত্মবিধ্বংসী চিন্তা-চেতনার অধিকারী হয়ে যায়। New York Times এর প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়—সমকামী ব্যক্তির এইডসের ভাইরাস ছড়ানোর পরেও কোনও অনুতাপ থাকে না। কোনও অনুশোচনা বোধ আসে না। কারণ সমকামীরা উন্নাসিক প্রকৃতির হয়। সমাজ কিংবা রাষ্ট্র নিয়ে তাদের মাথাব্যথাই থাকে না। Bagley ও Tremblay-এর রিসার্চ থেকে দেখা যায়—সমকামী ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ২ থেকে ১৩.৯ গুণ বেশি।’

ফারিসের কথা শুনে রফিক ভাইয়ের ভ্রু যুগল কুঁচকে গেল। তিনি কিছুটা মোটা গলায় বললেন, ‘তোর লাস্ট পয়েন্টটার সাথে আমি একমত হইতে পারলাম না।’

‘কেন ভাই?’

‘আত্মহত্যা কস আর মানসিক সমস্যাই কস, এইগুলার জন্য সমকামীরা দায়ী না। এইডার জন্যে দায়ী হোমোফোবিয়া। দায়ী সমাজের হুজুররা। যারা উঠতে বইতে সমকামীদের বিরোধিতা করে। আর হোমোফোবিয়া ছড়াইবার কাম করে। সমকামীদের সামাজিকভাবে মাইন্যা নিলে এই সমস্যাডা আর থাকব না।’

‘ভাইয়ের নিশ্চয় জানা আছে, নেদারল্যান্ডে সমকামী বিয়ে আইনসিদ্ধ?’

‘হ জানি। জানুম না কেন?’

‘নেদারল্যান্ডের General Psychiatry-এর দেওয়া রিপোর্ট থেকে জানা যায়—তাদের দেশে সমকামীদের মধ্যে মানসিক সমস্যা অনেক বেশি। সমকামীরা বেশি মেন্টাল ডিপ্রেশনে ভোগে। কানাডা একটি উদার রাষ্ট্র, যেখানে সমকামিতা সাধারণ

বিষয়। কানাডায় বছরে যে কটি আত্মহত্যা ঘটে, তার মধ্যে ৩০% আত্মহত্যাকারী সমকামী। একটু লক্ষ করুন ভাই। এসব রাষ্ট্রে হোমোফোবিয়া নেই, তারপরেও সেখানে সমকামীদের মানসিক সমস্যা বেশি। আর এ থেকেই বোঝা যায়, সমকামীদের মানসিক সমস্যার কারণ হোমোফোবিয়া নয়, হুজুররাও নয়। ওরা নিজেরাই এর জন্যে দায়ী। তাদের যৌন-উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনই এর জন্যে দায়ী।'

'আইচ্ছা ফারিস, সমকামিতা তো খ্রিষ্টের জন্মের অনেক আগে থেইকাই চইলা আইতাছে। তাইলে এইডারে কি স্বাভাবিক আচরণ ধরা যাইব না?'

'ধর্ষণকে কি আপনি স্বাভাবিক আচরণ মনে করেন?'

'পাগলে কয় কী? হা হা হা। সাত খণ্ড রামায়ণ পইড়া কয় সীতা কার বাপ। ধর্ষণরে কি কোনও সুস্থ মানুষ স্বাভাবিক আচরণ বইলা মাইনা নিব? হা হা হা।'

'কেন নেবেন না ভাই? আপত্তি কোথায়? ধর্ষণ তো খ্রিষ্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই চলে আসছে।'

রফিক ভাই চুপচাপ। কফির কাপটিকে ঘুরাচ্ছেন। কপাল ভাঁজ করে কী যেন চিন্তা করছেন। হয়তো মনে মনে ভাবছেন, 'আমার শেষ টোপটাও ফারিসকে গেলানো গেল না।' রফিক ভাইয়ের নিস্তব্ধতা আমাকে সত্যিই আনন্দিত করছে। লোকটা অনেক ফাঁক-ফোকর খুঁজে ফারিসকে আটকানোর চেষ্টা করল। কোনওটাই কোনও কাজে আসল না। আসলে মিথ্যে যতই বিশাল হোক না কেন, তার স্থিতি নেই। মিথ্যে তো সমুদ্রের ফেনার মতো। ফেনা তো বিলীন হয়েই যায়।

রফিক ভাই চুপ করে আছেন দেখে ফারিস বলল, 'সমকামিতাকে সহজলভ্য করার জন্যে, আমেরিকাকে আজ চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। আমেরিকা এক যৌনবিকারগ্রস্ত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যৌনরোগ সেখানে মহামারি আকার ধারণ করেছে। ৬৫ মিলিয়ন আমেরিকান বিভিন্ন যৌনরোগে আক্রান্ত। যার মধ্যে শুধু এইডস-এ আক্রান্ত ১.২ মিলিয়ন। এদের ৫৪%-ই সমকামী। আমেরিকার মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩.৫% হলো সমকামী। তুলনামূলক অনুপাতে সমকামীরা একেবারেই নগণ্য, কিন্তু সংক্রমণের দিক থেকে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

শুধু ২০১২ সালে প্রায় পনেরো হাজার এইডস আক্রান্ত রোগী মারা যায়। যাদের মধ্যে ম্যাক্সিমামই হলো—গে অথবা লেসবিয়ান। যৌনরোগগুলোর ৫৭% সমকামীদের দ্বারা ছড়ায়। এত কিছুর পরেও যদি আপনি সমকামীদের পক্ষ নেন, তো আমার বলার কিছুই নেই। অ্যাজ ইওর উইশ ব্রাদার।'

কথা বলতে বলতে কোন দিক দিয়ে যে সময় পেরিয়ে গেছে, বুঝতেই পারিনি।

ফারিসের জাদুকরী কথার ছোঁয়ায় হারিয়ে গিয়েছিলাম মনে হয়। ক্লাসের সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি ফারিসকে ইশারা দিলাম। ও কথা থামিয়ে দিলো। সেদিনকার মতো রফিক ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

বিদায় নিয়ে আমরা ফ্যাকাল্টির দিকে যাত্রা করলাম। চলে যাওয়ার সময় আমি ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। মুখটা বেশ শুকনো দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন বাংলার পাঁচ। পরাজিত সৈনিকের মতো মনে হচ্ছিল। তিনি আজও ফারিসের কাছে হেরেছেন। মারাত্মকভাবে হেরেছেন। আর হবেনই-না কেন? সত্য কখনোই মিথ্যের সামনে জয়ী হতে পারে না। মিথ্যের সে ক্ষমতা নেই। মিথ্যে তো নিম্নগামী।

তথ্যসূত্র :

♦ ১) Hamer DH, Hu S, Magnuson VL, Hu N, Pattatucci AM (July 1993). A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation. Science, 7–321 : (5119) 261.

♦ ২) S. S. Witkin and J. Sonnabend, “Immune Responses to Spermatozoa in Homosexual Men,” Fertility and Sterility, -337 : (3)39 342, pp. 1983) 341-340).

♦ ৩) New Evidence of a gay gene, by AnastasiaTouefexis, *Time,* November 13,1995, vol. 146, issue 20, p.95.

♦ ৪) George Rice, et al., “Male Homosexuality: Absence of Linkage to Microsatellite Markers at Xq28”, Science, Vol. 284, p. 667.

♦ ৫) William Byne and Bruce Parsons, “Human Sexual Orientation : The Biologic Theories Reappraised,” Archives of General Psychiatry, Vol. 50, March 239-228 :1993.

♦ ৬) Laumann EO, Gagnon JH, Michael RT, Michaels S. 1994. The Social Organization of Sexuality. Chicago : University of Chicago Press

♦ ৭) American Psychiatric Association. Fact sheet—“Gay,Lesbian and Bisexual Issues,”, May, 2000.

♦ ৮) Henry Kazal, et al., “The gay bowel syndrome : Clinicopathologic correlation in 260 cases,” Annals of Clinical and Laboratory Science, 1976) 192-184 : (2)6).

♦ ৯) “The HIV/AIDS Epidemic in the United States”. Kaiser Family Foundation. March 2013 ,22. Retrieved June 2012 ,2.

♦ ১০) Hepatitis A among Homosexual Men—United States, Canada, and Australia,” Morbidity and Mortality Weekly Report, CDC, :(09)41

164-161 ,155 (March 1992 ,06).
♦ ১১) "December 2008 Monthly HIV/AIDS Statistics" (PDF). California Department of Public Health Office of AIDS. July 2009 ,9. Retrieved March 2010 ,21.
♦ ১২) Glen E. Hastings and Richard Weber, "Use of the term 'Gay Bowel Syndrome', reply to a letter to the editor, American Family Physician, 1994) 582 : (3)49).
♦ ১৩) Paraphilias," Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, p. 576, Washington : American Psychiatric Association, 2000;
♦ ১৪) Karla Jay and Allen Young, The Gay Report: Lesbians and Gay Men Speak Out About Sexual Experiences and Lifestyles, pp. 555-554, New York: Summit Books (1979).
♦ ১৫) Mads Melbye, Charles Rabkin, et al., "Changing patterns of anal cancer incidence in the United States, 1989-1940," American Journal of Epidemiology, 780-772 : 139, p. 779, Table 1994) 2).
♦ ১৬) N. Kenneth Sandnabba, Pekka Santtila, Niklas Nordling (August 1999). "Sexual Behavior and Social Adaptation Among Sadomasochistically-Oriented Males". Journal of Sex Research.
♦ ১৭) Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archives of General Psychiatry, -85 : (1)58 91, p. 89 and Table 2 (January 2001).
♦ ১৮) Edward O. Laumann, John H. Gagnon, et al., The social organization of sexuality : Sexual practices in the United States, p. 293, Chicago : University of Chicago Press, 1994.
♦ ১৯) United States. HIV/AIDS Knowledge Base. University of California, San Francisco. Retrieved November 2011 ,25.
♦ ২০) "Estimating HIV Prevalence and Risk Behaviors of Transgender Persons in the United States : A Systematic Review". AIDS Behav. :(1) 12 17–1. Jan 2008. Doi : 10.1007/s3-9299-007-10461. PMID 17694429.
♦ ২১) Centers for Disease Control and Prevention, (CDC) (June 2011 ,3). "HIV surveillance—United States, 2008–1981". MMWR. Morbidity and mortality weekly report. 93–689 : (21) 60. PMID 21637182.
♦ ২২) R. R. Wilcox, "Sexual Behaviour and Sexually Transmitted Disease Patterns in Male Homosexuals," British Journal of Venereal Diseases, 1981) 167 ,169-167 : (3)57).
♦ ২৩) C. M. Thorpe and G. T. Keutsch, "Enteric bacterial pathogens: Shigella, Salmonella, Campylobacter," in K. K. Holmes, P. A. Mardh, et al., (Eds.), Sexually Transmitted Diseases (3rd edition), New York :

McGraw-Hill Health Professionals Division, 1999.
♦ ২৪) Dr. Rene Josef Bullecer's pamphlet on What You Should KnowAbout Homosexuality; Dr. Armand Fabella, Health & Homes, May-June 1989
♦ ২৫) "HIV in the United States". Center for Disease Control. September 2015 ,29. Retrieved June 2016 ,29.
♦ ২৬) United States". HIV/AIDS Knowledge Base. University of California, San Francisco. Retrieved November 2011 ,25.
♦ ২৭) Centers for Disease Control and Prevention, (CDC) (June ,3 2011). "HIV surveillance—United States, 2008–1981".
♦ ২৮) http://www.bbc.com/bengali/news40546773-
♦ ২৯) http://www.cdc.gov/hiv/topics/msm/index.htm
♦ ৩০) http://www.springerlink.com/content/jx13231641717w48/
♦ ৩১) http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/qa22.htm
♦ ৩২) http://www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsstrategygoals by 2015/
♦ ৩৩) http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/basic.htm#incid ence
♦ ৩৪) http://www.journals.uchicago.edu/CID/journal/issues/v38 n30832/30832/2.html?erFrom=8997763093503343538-Guest
♦ ৩৫) http://www2.law.ucla.edu/williamsinstitute/pdf/How-many-people-are-LGBT-Final.pdf
♦ ৩৬) http://www.theatlantic.com/science/archive/10/2015/no-scie ntists-have-not-found-the-gay-gene/410059/
♦ ৩৭) http://www.evolvedworld.com/articles/item/-169back-to-sch ool-sex101-
♦ ৩৮) http://www.yourtango.com/experts/ava-cadell–ph-d—ed-d/-3 reas ons-men-cheat
♦ ৩৯) https://concernedwomen.org/images/content/bornorbred.pdf
♦ ৪০) http://www.youth-suicide.com/gay-bisexual/gbsuicide1.htm

অভিশপ্ত সভ্যতার আর্তনাদ

আমার আসার কথা ছিল ভোর ছ-টায়। এসেছি ছ-টা বেজে দুই মিনিটে। এসে দেখি ফারিস ঠিক সেকেন্ড গেইটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সময়কে ফারিস অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাজে কাজে সময় নষ্ট করে না কখনো। যতটুকু অবসর পায়, কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। আর করবেই-বা না কেন? সময়ানুবর্তিতা যার ব্রত, সে কি সময়কে অপচয় করতে পারে? পারে না। তাই বরাবরের মতো আজও বিলম্ব করেনি। ঠিকঠাক ছ-টায় এসেছে।

ফজরের সালাতের পর ফারিস হাঁটে নিয়মিত। সেকেন্ড গেইট থেকে ইকোপার্কের শেষ মাথা পর্যন্ত। অবশ্যি তারও একটা কারণ আছে। ফজরের পরে ঘুমের উপদ্রব দেখা দেয়। ঘণ্টাখানিক যুদ্ধ করেও ঘুমকে জয় করা দায়। ঘুমেরই জয় হয়। একবার ঘুমিয়ে গেলে আটটায় ক্লাস ধরাটা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ফারিস ঘুম তাড়ানোর জন্যে হাঁটে। অবশ্যি শুধু হাঁটেই না, সকালের যিকিরগুলোও পুরো করে নেয়। একেবারে এক ঢিলে দুই পাখি।

বিগত দিনের তুলনায় আজ ফারিসকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। দেখাবেই না কেন! সাদা পাঞ্জাবিতে টগবগে ফর্সা যুবকের চেহারা সুন্দর দেখাবে না? অবশ্যই দেখাবে। তবে সে সৌন্দর্য সরাসরি না দেখে—শত ভাগ উপলব্ধি করা দায়। ফারিস আমাকে দেখে তার সুন্দর হাসিটা উপহার দিয়ে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম।'

'ওয়ালাইকুম আসসালাম।'

'কী, ঘুমের ঘোর কেটেছে তাহলে?'

প্রতিদিন নিয়ত করি, কাল ফজরের পর আর ঘুমাব না। কিন্তু সে কাল কালই রয়ে যায়। একদিন ফজরের পরে না ঘুমিয়ে জেগে ছিলাম। সকালের আবহাওয়া যে এত মিষ্টি হতে পারে, সেদিন অনুধাবন করেছিলাম। বেশ ভালো লেগেছিল। সারাদিন মেজাজ ফুরফুরে ছিল। তাই আজ থেকে পণ করেছি—আর সকালে ঘুমাব না। যত ঘুম আসুক না কেন, তাকে জয় করবই করব। সে জয়ের কিঞ্চিৎ প্রচেষ্টা হিসেবেই ফারিসের সাথে হাঁটতে আসা।

ফারিসের উত্তরে আমি বললাম, 'পার্কের দিকে যাবি?'

'হুঁ।'

'চল।'

ইকোপার্কের প্রধান ফটকে বেশ বড় অক্ষরে লিখা—'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকেন্দ্র'। মজার ব্যাপার হলো, ভেতরে কোনও প্রাণীই নেই। আছে কেবল প্রাণীদের জন্যে বানানো খাঁচা। লোহার খাঁচা। প্রাণী না থাকায় কিছুটা সুবিধেই হয়েছে। যখন ইচ্ছে পার্কে ঢোকা যায়। অবশ্যি প্রাণী থাকলে এই সুবিধেটা পাওয়া যেত না। পার্কের ভেতরে ইট-সিমেন্টের বেঞ্চিও আছে। ইচ্ছেমতো সেখানে জিরিয়ে নেওয়া যায়।

হাঁটার অভ্যাস আমার খুবই কম। নেই বললেই চলে। মিনিট দশেক হেঁটেই ক্লান্তি ধরেছে। তাই পাশের খালি বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। অগত্যা ফারিসকেও বসতে হলো। কিছুক্ষণ পর ফারিস পকেট থেকে বাদাম বের করল। এরপর আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই নে। বাদাম চিবুতে থাক।'

এত সকালে পার্কে বাদাম পাওয়াটা সত্যিই দুষ্কর। তাই হয়তো ফারিস বাদাম সাথে করে নিয়ে এসেছে। আমি বাদাম চিবুতে চিবুতে বললাম, 'জানিস! আজ খুব মজার একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী স্বপ্ন?'

'তুই, আমি, আর অর্ক মিলে কোথাও বেড়াতে গেছি। জায়গাটার নামটা মনে পড়ছে না। ভুলে গেছি। আমি দেখলাম, অর্ক তোর হাত ধরে আছে। ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কণ্ঠটা ভেজা ভেজা মনে হচ্ছে। তোকে কিছু বলতে চাচ্ছে। বলতে গিয়ে বার বার আটকে যাচ্ছে। নিজ হাতে চোখের জল মুছছে। তোকে কিছু বলতে যাবে ... নাহ্! ভুলে যাচ্ছি। কী যেন বলল? কী যেন বলল...।'

'থাক, আর কষ্ট করে মনে করতে হবে না।'

'তবে স্বপ্নের শেষ দিকটা মনে আছে।'

'শেষে কী হলো?'

'অর্ক আমাদের সাথে সালাত আদায় করল।'

'সত্যিই! আলহামদুলিল্লাহ। তোর স্বপ্ন যেন সত্যি হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের আগে মু'মিনের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে। কেননা মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর নবুয়তের কোনও কিছুই অবাস্তব হতে পারে না"।'[৩৯]

'আল্লাহ কবুল করুন। স্বপ্ন জিনিসটা আমার কাছে বেশ অদ্ভুত লাগে রে দোস্ত।'

[৩৯] বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং : ৬৫৪৪।

'কেন?'

'কেন, তা জানি না। তবে লাগে। খুব অদ্ভুত লাগে। আচ্ছা দোস্ত, মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে?'

'রাসূল ﷺ বলেছেন, স্বপ্ন তিন প্রকার। এক. ভালো স্বপ্ন, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। দুই. ব্যক্তির মনের চিন্তাভাবনা—স্বপ্নের আকারে। তিন. দুশ্চিন্তায় ফেলার স্বপ্ন, যা শয়তানের পক্ষ থেকে।[৪০] মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে, এই নিয়ে বিজ্ঞান প্রধানত দুটি তত্ত্ব দিয়েছে। একটি হলো মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব, আরেকটি সক্রিয় সংশ্লেষণ মডেল তত্ত্ব।

প্রথমটিতে বলা হয়েছে—স্বপ্ন হলো মানুষের অবদমিত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে মানুষের অনেক চিন্তাই অবদমিত থাকে। এই অবদমিত চিন্তাগুলো এত প্রকট অবস্থায় থাকে যে, স্বপ্নের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে। এ সম্পর্কে ফ্রয়েড বলেন, স্বপ্ন হচ্ছে অবদমিত আকাঙ্ক্ষার ছদ্মবেশী তৃপ্তিকরণ।

অপর মতবাদে বলা হয়েছে—ঘুমের REM পর্যায়ে Brainstem এর circuit গুলো সক্রিয় হয়। যা ব্রেইনের পাশের amygdala, hippocampus সহ limbic system-কে সক্রিয় করে। Limbic system আবেগ, সংবেদন ও স্মৃতির সাথে জড়িত। আমাদের ব্রেইন এই অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকে সংশ্লেষণ করে। এরপর অর্থপূর্ণ করে তোলে। যার ফলে আমরা স্বপ্ন দেখি। মজার ব্যাপার কী জানিস?'

'কী?'

'মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও স্বপ্ন দেখে।'

'সত্যিই?'

'হ্যাঁ, সত্যিই। কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীরাও স্বপ্ন দেখে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন—স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রে মানুষের মস্তিষ্ক-তরঙ্গের যে পরিবর্তন হয়, একই পরিবর্তন প্রাণীদের ক্ষেত্রেও হয়।'

'বেশ মজার তো!'

'হ্যাঁ, সত্যিই মজার।'

আমি স্বপ্ন নিয়ে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার সে ইচ্ছেটুকু অপূর্ণই রয়ে গেল। জুতার আওয়াজ আমাদের আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটাল।

আওয়াজটা ক্রমেই জোরালো হয়ে আসছে। আমি পেছন ফিরে তাকালাম। রকি! এত সকালে! ব্যাপার কী? আর এত মোটা ছেলেটা এভাবে দৌড়াচ্ছে কেন? কোনও

[৪০] তিরমিযী, *আস-সুনান,* হাদীস নং : ২২৯১।

বিপদ হয়েছে নাকি?

আমাদের নিকট এসে রকি তার দৌড় থামালো। এরপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস।'

'মর্নিং।' ফারিস জবাব দিলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত সকালবেলা? দৌড়াচ্ছিস কেন? কী হয়েছে?'

রকি হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিলো, 'না, তেমন কিছু হয়নি। শরীরের সুগার লেভেলটা একটু ইনক্রিজ হয়েছে। ডক্টর বলেছেন, এভরিডে মিনিমাম টু টাইমস জগিং করতে হবে। তাই।'

'খেয়ে খেয়ে যে শরীর বানিয়েছিস না, কদিন পর তো দরজা দিয়ে বেরই হতে পারবি না। দরজা কেটে বের করতে হবে। শরীরটা একটু কমা, বুঝলি?'

'হয়েছে হয়েছে, আর জ্ঞান দিতে হবে না। সো হোয়াট আর ইউ গাইজ ডুয়িং হিয়ার?'

'কিছু না। বাতাস খাচ্ছি। সুগার-ফ্রি। খাবি?'

আমার কথার উত্তর না দিয়ে রকি থপাস করে বসে পড়ল। বসার কারণটা অবশ্যি তখন বুঝতে পারলাম, যখন সে বাদামের প্যাকেটটা নিমেষেই শেষ করে দিলো। সারাদিন খাই খাই করাটা ওর অভ্যাস। একেবারে হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তা-ই খেতে থাকে। বাদাম শেষ করে বলল, 'এনিথিং মোর?'

'ইয়েস।' ফারিস জবাব দিলো।

'গিভ মি ব্রাদার।'

ফারিস পকেট থেকে চকলেট বের করে রকির হাতে দিলো। চকলেট খেতে খেতে ও বলল, 'তোদের দেখলে মাঝে মাঝে হাসি পায়। ওয়ার্ল্ড কতদূর এগিয়ে গেছে, আর তোরা! তোরা একেবারে ব্যাকডেটেড। হাজার বছর পিছিয়ে আছিস। সো স্যাড ম্যান! সো স্যাড!'

ফারিস বলল, 'পিছিয়ে আছি মানে?'

'মানে আবার কী? ওয়ার্ল্ড কতটা মডার্ন হয়েছে, আর তোরা এখনো সেই মধ্যযুগীয় কালচার আঁকড়ে ধরে আছিস। এই যুগে কি এসব মানায়? কতবার বললাম, এগুলো ছাড়। ছেড়ে মডার্ন হতে ট্রাই কর।'

'তোর কাছে আধুনিকতা মানেই তো—পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ!'

'তা তুই যা বলার বল। বাট মাইন্ড ইট, ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশান লাইফকে অনেক ইজি করে দিয়েছে। আমাদের আলট্রা মর্ডান করেছে। ডার্কনেস থেকে লাইটের দিকে নিয়ে এসেছে। সাইন্স শিখিয়েছে। এই যে দেখ—আজ আমরা চকলেট খাচ্ছি, পিৎজা খাচ্ছি, বার্গার খাচ্ছি; অথচ একটা সময় তো এগুলোর নামও আননউন ছিল।'

রকি পাশ্চাত্য-সভ্যতার একনিষ্ঠ অনুসারীদের একজন। যারা পাশ্চাত্যের রঙে রঙ বদলায়, পাশ্চাত্যের সুরে তাদের সুর বদলায়, যাদের ধ্যানধারণা পাশ্চাত্যের ধাঁচে পরিচালিত হয়, রকি তাদেরই একজন। ওর পোশাক থেকে শুরু করে হেয়ার স্টাইল, সবটাই পাশ্চাত্যের আদলে পরিচালিত। ওর মুখ দিয়ে এমন কথা বের হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

রকির চকলেট খাওয়া অর্ধেক হলে ফারিস বলল, 'পড়াশোনা শেষ করে আমেরিকান এম্বাসিতে একটা চাকরি নিস। তোর জন্যে খুব ভালো হবে। মাসে মাসে মাইনে পাবি, আর পাশ্চাত্যের জয়গান গেয়ে বেড়াবি।'

ফারিসের কথা শুনে রকিকে কিছুটা আনন্দিতই দেখালো। সে বলল, 'সে জন্যেই তো IELTS করে যাচ্ছি। সুযোগ পেলেই ট্রাই করব। সে আর তোকে বলতে হবে না।'

'আচ্ছা রকি, পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে তোর এত বেশি ভালো লাগার কারণ কী?'

'স্ট্রেইঞ্জ! লাগবে না? যারা আমাদের মডার্নিজম শিখিয়েছে, ম্যান-ওম্যানের ইকুয়ালিটি শিখিয়েছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা শিখিয়েছে; তাদের থ্যাংস দেবো না? আমি কি এতই আনগ্রেটফুল নাকি?'

রকি কথাগুলো এমনভাবে বলছে—মনে হচ্ছে যেন পাশ্চাত্য-সভ্যতা না এলে আমরা বন্য থাকতাম। পাশ্চাত্য এসে আমাদের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে দিয়েছে। রকির কথা শুনে ফারিস বলল, 'আসলেই দোস্ত, পাশ্চাত্য আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। পাশ্চাত্য শিখিয়েছে—কীভাবে বছরে লাখ লাখ ধর্ষণ করা যায়। কীভাবে নিজের বোনের সাথে সেক্স করা যায়। কীভাবে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করা যায়। কীভাবে পর্নোগ্রাফির নেশায় আসক্ত হওয়া যায়। কীভাবে মদের নেশায় বুঁদ হওয়া যায়। সত্যিই, অনেক কিছু শিখিয়েছে।'

ফারিসের কথা শুনে রকির গোলগাল মুখখানা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। চোখগুলো বড় বড় করে ফারিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর ইউ ম্যাড! তোদের নজরে কি ভালো জিনিসগুলো ফুটে ওঠে না? নাকি মনের মধ্যে শুধু নেগেটিভ থিংকিং কাজ করে? বি পজেটিভ ম্যান। তোদের মতো মোল্লারা ওয়ার্ল্ডকে আধুনিক করেনি, তারাই করেছে। তারা যদি আমাদের পথ না দেখাত, তাহলে আমরা ব্যাকডেটেড থাকতাম!'

ফারিস মুচকি হেসে জবাব দিলো, 'সেটাই মনে হয় ভালো ছিল।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'সে না হয় পরে বলছি। তার আগে বল পাশ্চাত্যের কোন দেশকে তোর বেশি ভালো লাগে?'

'কোনটা আবার? ইউএসএ। শুধু আমারই না, যাদের মডার্ন কালচার শেখার ইন্টারেস্ট আছে, তাদের সবার কাছেই। দেখিস না, কেউ একবার ইউএসএ-তে যাওয়ার সুযোগ পেলে আর হাতছাড়া করতে চায় না। পাপার সাথে আমিও বেশ ক-বার গিয়েছি। কী যে ভালো লেগেছিল! ইউ ক্যান্ট রিয়েলাইস দিস। স্বপ্নের মতো একটি কান্ট্রি। ওফফ! ভাবতেই কেমন থ্রিলিং লাগে।'

রকিকে না থামালে মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে একটা লম্বাচওড়া লেকচার দিয়ে ফেলত। ফারিস বলল, 'আচ্ছা রকি, তোর কি জানা আছে—যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর কী পরিমাণ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে?'

'এটা আবার জানার কী হলো? সব কান্ট্রিতেই তো কম বেশি রেইপের ঘটনা ঘটে। এস ইউজুয়াল, সেখানেও কিছু ঘটবে।'

'সেই কিছুটা কত, জানিস?'

'অনেক বড় কান্ট্রি তো, থাউজ্যান্ড প্লাস হবে হয়তো।'

'হাজার কয়েক?'

'এনিথিং রং?'

'ভুল মানে, মারাত্মক ভুল। শুধু ২০০৫ সালে আমেরিকায় প্রায় দুই লক্ষের মত নারী ধর্ষিত হয়। ২০১৫ সালে যা তিন লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। জর্জ ম্যাসন ইউনিভার্সিটির গবেষণা বলছে, প্রতি ৩ জন নারীর ১ জন, একবার হলেও ধর্ষিত হয়। গবেষণার আরও ভয়াবহ তথ্য হলো—প্রতিবছর দেশটির ৬৮ শতাংশ নাগরিক, ধর্ষণ ও যৌননির্যাতনের শিকার হয়। আর অপরাধীদের ৯৮ ভাগেরই কোনও বিচার হয় না। ন্যাশনাল ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন-এর সার্ভে অনুযায়ী, আমেরিকার প্রতি ৬ জন মহিলার মধ্যে ১ জন ধর্ষিত হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানটা ৩৩ জনে ১ জন।'

রকি বাকি চকলেটটা শেষ করে বলল, 'তুই পড়ে আছিস রেইপ নিয়ে। এগুলো সেখানে নর্মাল ব্যাপার। তোরা এসব নিয়ে যতটা মাথা ঘামাস, অ্যামেরিকানরা ততটা মাথা ঘামায় না। সাইন্স এন্ড টেকনোলোজির দিক দিয়ে অ্যামেরিকা কতদূর এগিয়ে

গেছে, সে খেয়াল আছে তোর?'

'সত্যিই অনেক দূর এগিয়ে আছে। কিন্তু যে দেশে এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, তারা কেন তাদের নাগরিকদের মৃত্যুর হার কমাতে পারছে না?'

'সরি!'

'তোর প্রিয় দেশ আমেরিকা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিতে গিয়ে এমন সমস্যায় পড়েছে যে, তার খেসারত কোনও দিন দিয়ে শেষ করতে পারবে না।'

'আরেকটু ক্লিয়ারলি বল। এত প্যাঁচাচ্ছিস কেন?'

'তোর কি জানা আছে, প্রতিবছর আমেরিকায় অ্যালকোহল জনিত কারণে কী পরিমাণ মানুষ মারা যায়?'

'নো। আই হ্যাভ নো আইডিয়া।'

রকির প্রিয় দেশ আমেরিকা। ওর দেখা সবচেয়ে ভালো দেশও আমেরিকা। অথচ সে দেশের এই সামান্য তথ্যও তার কাছে নেই। ও কী দেখে আমেরিকার প্রতি পাগল হয়েছিল, কে জানে?

রকির মুখে না-সূচক জবাব শুনে ফারিস বলল, 'প্রতিবছর প্রায় নব্বই হাজার লোক অ্যালকোহল জনিত কারণে মারা যায়।'

'রিয়েলি?'

'মিথ্যা হবে কেন? এটা তো আমার বানানো কোনও তথ্য না। তোর প্রিয় দেশের Centers for Disease Control-এর দেওয়া তথ্য।'

রকি এবার সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেল। এত ভালোবাসার দেশের শোচনীয় অবস্থাটা ওর মনে হয় জানা ছিল না। গোপন ছিল। আজ তা প্রকাশ পেল। যে দেশের বিজ্ঞান এতটা উন্নত, সে দেশে এত এত মানুষ অ্যালকোহলের কারণে মারা যাচ্ছে, এটা কি ভাবা যায়? তাই হয়তো রকি চিন্তায় পড়ে গেছে। রকির চিন্তিত মুখ দেখে ফারিস বলল, 'তুই কি জানিস, প্রতিবছর অ্যালকোহলের পেছনে কত টাকা ব্যয় হয় আমেরিকায়?'

রকি না-সূচক মাথা নাড়ল। জবাবটা ফারিসই দিলো। সে বলল, 'প্রায় দু শ পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার।'

ফারিসের দেওয়া তথ্য শুনে আমি যতটা বিস্মিত হলাম, রকিকে তার অর্ধেকও বিচলিত মনে হলো না। সে বরং প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে বলল, 'তবে যা-ই বলিস না কেন, ইউএসএ-তে ক্রাইম অনেক কম। তারা আমাদের থেকে অনেক বেশি অনেস্ট।'

'সত্যিই তাই?'

'অ্যানি ডাউট?'

'সন্দেহ থাকবে কেন, প্রমাণ আছে।'

'কিসের প্রমাণ?'

'আমেরিকানরা যে আমাদের থেকে অনেক বেশি অসৎ, তার প্রমাণ।'

'আচ্ছা, বল তো শুনি।'

'এই তো কয়েকদিন আগে ফ্লোরিডায় হারিকেন ইরমা আঘাত হেনেছিল, মনে আছে?'

'ইয়াহ, হোয়াই নট?'

'ইরমা আঘাত হানার পর, ফ্লোরিডায় অনেক লুটপাট হয়। বাসাবাড়ি, দোকানপাট, অফিস-আদালতে ডাকাতি হয়। সিসি ক্যামেরায় এসব চিত্র স্পষ্ট ধরা পড়ে।'

'সো হোয়াট? এসব তো আদারস কান্ট্রিতেও হয়ে থাকে।'

'সব দেশে হয় না। তোর প্রিয় দেশে হয়। আমাদের দেশেও তো বন্যা হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। মানুষ ঘরবাড়ি ফেলে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। কিন্তু কোথাও তো এমন লুটপাটের ঘটনা ঘটে না। অথচ আমরা ওদের থেকে দরিদ্র!'

'এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা।'

'বিচ্ছিন্ন ঘটনা?'

'মাস্ট বি।'

'আচ্ছা! আমি তোকে আরও কিছু বিচ্ছিন্ন (!) ঘটনার তথ্য দিচ্ছি। ২০১১ সালে আমেরিকায় প্রায় বারো লাখেরও বেশি ভায়োলেন্ট ক্রাইম হয়। ডাকাতির ঘটনা ঘটে প্রায় সাড়ে তিন লাখ। একষট্টি লাখের মতো অপহরণের ঘটনা ঘটে। ছিঁচকে চুরির ঘটনা ঘটে প্রায় বাইশ লাখ। নব্বই লাখের ওপরে ভূসম্পত্তি-সংক্রান্ত অপরাধ ঘটে। শারীরিক আক্রমণের ঘটনা ঘটে প্রায় সাড়ে সাত লাখ। মোটরযান চুরি হয় সাত লাখেরও বেশি। হত্যাকাণ্ড হয় প্রায় পনেরো হাজার। আর জোরপূর্বক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চুরাশি হাজার। এগুলো সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তাই না? আবার বলিস না, আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি। FBI-এর দেওয়া তথ্য এটি। এরপরেও যদি এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হয়, তো আমার কীই-বা বলার আছে!'

আমেরিকার এত এত ক্রাইমের ঘটনা অজানাই রয়ে যেত, যদি ফারিসের মুখে না

শুনতাম। আমেরিকায় বছরে যে এত ক্রাইমের ঘটনা ঘটে—চিন্তা করাও দায়! ভাবতেই অবাক লাগে! এরাই আবার অনান্য দেশে নাক গলাতে আসে। নিজের দেশের খোঁজ নেই, পরের দেশে পোদ্দারি। আরও অবাক লাগল যখন ফারিস বলল, 'মেইনস্ট্রীম মিডিয়াগুলো এসব খবর প্রকাশ পর্যন্ত করে না। বেমালুম চেপে যায়!'

ফারিসের কথা শুনে রকি বিশাল একটা ধাক্কা খেলো। ক্ষণিকের জন্যে চুপ হয়ে গেল। ফারিস আরেকটা চকলেট বের করে রকিকে দিয়ে বলল, 'এই নে। এটা তোর জন্যে।'

চকলেটা পেয়ে রকি বেশ খুশিই হলো। ফারিস বলল, 'রকি, তুই না আমদের ভার্সিটির মানবাধিকার সংস্থার সাথে জড়িত?'

'ইয়াহ, এনি প্রবলেম?'

'না, এমনিই। আচ্ছা রকি, গর্ভপাত কি অপরাধের মধ্যে পড়ে?'

'মাদার যদি নিজে থেকেই এবোরশান করায়, তো সেটা ক্রাইম হবে কেন?'

'সন্তানকে হত্যা করলে অপরাধ হবে না?'

আমি ফারিসের বক্তব্য সমর্থন করে বললাম, 'অবশ্যই হবে। মানুষ হত্যা করা যদি ক্রাইম হতে পারে, নিষ্পাপ শিশু হত্যা করা ক্রাইম হবে না? এ কেমন দ্বিমুখী কথাবার্তা?'

আমার কথা শুনে ফারিস বলল, 'তোকে একটা মজার তথ্য দিই।'

আমি বললাম, 'কী তথ্য?'

'আমেরিকায় বছরে সাড়ে ছ-লাখের বেশি গর্ভপাত ঘটানো হয়। অথচ তাদের কাছে এসব অপরাধ নয়, ব্যক্তি-স্বাধীনতা।'

ফারিস যে এভাবে এক একটা বোম ফাটাবে, সেটা কি রকি জানত? জানলে হয়তো এই ধরনের প্রশ্ন ফারিসকে করত না। ফারিস ছেলেটা সত্যিই জিনিয়াস। একের পর এক তথ্য দিয়ে রকির প্রশ্নগুলোর জবাব দিচ্ছে। এত এত ডেটা যে সে কীভাবে মনে রেখেছে, আল্লাহই ভালো জানেন।

'আচ্ছা রকি, গত সপ্তাহে তোরা একটা ক্যাম্পেইন করেছিলি না?' ফারিস জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, করেছিলাম। ক্যাম্পেইনটার ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে আমি ছিলাম। দেখিসনি, নেক্সট ডে-তে ফার্স্ট লাইট পেপারে আমার ছবি ছেপেছিল!'

‘তাই বুঝি! ক্যাম্পেইনটা কী নিয়ে ছিল রে?’

‘কী নিয়ে আবার? আর্লি ম্যারিজ নিয়ে। আর্লি ম্যারিজ সম্পর্কে লোকজনের মধ্যে এওয়্যারনেস ক্রিয়েট করাই ক্যাম্পেইনের মেইন ফোকাসিং পয়েন্ট ছিল।’

‘বাল্যবিবাহ নিয়ে এত ক্যাম্পেইন করার কী দরকার? তোর প্রিয় আমেরিকায় তো এগুলো মামুলি ব্যাপার!’

‘ফারিস! এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমেরিকায় বাল্যবিবাহ! তুই আমাকে বলবি, আর আমি মেনে নেব?’

‘না, আমার কথা তোকে মানতে বলছে কে? তুই বিবিসির কথা মেনে নে; তাহলেই হবে।’

‘বিবিসির কথা মানে?’

‘তোর প্রিয় বিবিসি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে ২০০০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে দু-লাখের বেশি বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটেছে। ওসব বিয়েতে কন্যার বয়স ছিল দশ-তেরো। তাদের বিয়ে হয় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে।’

ফারিসের কথা শুনে আমি বললাম, ‘ওদের দেশে কি বাল্যবিবাহ আইনসিদ্ধ?’

‘হুঁ। আলাস্কা, লুইজিয়ানা ও সাউথ ক্যারোলাইনায় বারো বছরের বিয়ের অনুমতি আছে। এ ছাড়া এগারোটি অঙ্গরাজ্যে তেরো বছরে বিয়ে করা অনুমতি আছে।’

বেশ অবাক করার মতো তথ্য! সারা বিশ্বে যারা বাল্যবিবাহ নিয়ে হাউকাউ করে যাচ্ছে, তারাই আবার নিজেদের দেশে বাল্যবিবাহের আইন করে রেখেছে। দ্বিমুখিতা কাকে বলে! ফারিস এবার রকিকে বলল, ‘আচ্ছা রকি, পর্নোগ্রাফিকে তুই কীভাবে দেখিস?’

রকি উত্তর দিলো, ‘অ্যাডাল্টরা পর্নোগ্রাফি দেখলে প্রবলেমের কিছু নেই।’

‘আর টিন এইজাররা দেখলে?’

‘টিন এইজারদের এগুলো এভোয়েড করা উচিত।’

‘কেন? টিন এইজারদের তুই এই সুযোগ (!) থেকে বঞ্চিত করবি কেন? প্রাপ্তবয়স্করা পারলে ওরা পারবে না কেন?’

রকি এ প্রশ্নের কোনও জবাব দিলো না। অবশ্যি জবাব দেওয়ার মতো কোনও বক্তব্য ওর কাছে নেই। রকির মতো পাশ্চাত্যের অন্ধানুসারীরাই পর্নোগ্রাফিকে ভালো বলতে পারে। পর্নোগ্রাফিকে অনুমোদন দিতে পারে। নয়তো ন্যূনতম চিন্তাশক্তিও যার

আছে, সেও কখনো পর্নোগ্রাফিকে ভালো বলতে পারে না। ফারিস আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোর কাছে পর্নোগ্রাফি কেমন মনে হয়?'

আমি বললাম, 'পর্নোগ্রাফি? ছি! ছি! এইগুলা ভাবতেও ঘেন্না লাগে। পর্নোগ্রাফি হিরোইন, ইয়াবা, কিংবা গাঁজার থেকেও মারাত্মক নেশাদার জিনিস। এগুলো মানুষের মস্তিষ্ককে পাল্টে দেয়।'

'তুই কি জানিস, আমেরিকায় কি পরিমাণ মানুষ এই আত্মবিধ্বংসী ব্যাধিতে আক্রান্ত?'

'না, জানি না।'

'প্রতিদিন ৪০ মিলিয়ন আমেরিকান পর্নসাইট ভিজিট করে। প্রতি ৩৯ মিনিটে একটি করে নতুন পর্ন ভিডিও আপলোড করা হয় আমেরিকায়। বছরে পর্নোগ্রাফির পেছনে তাদের খরচ হয় ১৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, এই সমাজবিধ্বংসী জিনিসটাও তাদের কাছে দোষের কিছু না। আফটার অল, ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কথা!'

'যারা মানবাধিকারের তালিম দিয়ে বেড়ায়, তারাই কিনা মানবতাকে ধ্বংস করতে এভাবে উঠেপড়ে লেগেছে? তাদের দেশে বড় বড় বিজ্ঞানী ও ডাক্তার আছে, যাদের সামনে পর্নোগ্রাফির ক্ষতিকর দিকগুলো পরিষ্কার। তারপরেও তারা এটা থামাচ্ছে না?'

'কীভাবে থামাবে বল? অপরাধ তাদের নিত্য সঙ্গী। একটা থামাতে গেলে, আরেকটার জন্ম নেয়। তোকে একটা মজার পরিসংখ্যান দিই, তাহলে বুঝবি তারা অপরাধের গোলক ধাঁধায় কীভাবে ফেঁসে গেছে। FBI-এর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, আমেরিকায় প্রতি ২৬ সেকেন্ডে একটি ভায়োলেন্ট ক্রাইম, প্রতি ৩৬ মিনিটে একটি হত্যাকাণ্ড, প্রতি ৬ মিনিটে একটি ধর্ষণ, দেড় মিনিটে একটি ডাকাতি, সাড়ে তিন সেকেন্ডে একটি প্রোপার্টি ক্রাইম, ৪২ সেকেন্ডে একটি আক্রমণাত্মক ঘটনা, ১৪ সেকেন্ডে একটি ছিঁচকে চুরি, ৪৪ সেকেন্ডে একটি মোটরযান চুরি এবং ৫ সেকেন্ডে একটি অপহরণের ঘটনা ঘটে।'

ফারিস যা বলল তা শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। নিজেকে বিশ্বাস করাতে কষ্ট হচ্ছিল। আমিও মনে মনে ভাবতাম, তাদের নৈতিক অবক্ষয় হতে পারে, তবে অপরাধপ্রবণতা হয়তো অনেক কম। আমার ধারণা আজ মিথ্যে প্রমাণিত হলো। আমেরিকার বাইরে চাকচিক্যের পর্দা লাগানো থাকলেও, ভেতরটা একেবারেই নষ্ট। ঠিক মাকাল ফলের মতো।

রকি এবার কিছুটা নিচু স্বরে বলল, 'তুই যা খুশি বল। তবে কম্পারেটিভলি

অ্যামেরিকায় আমাদের থেকে অনেক বেশি ইকুয়ালিটি আছে। সেখানে ম্যান অ্যান্ড ওম্যানের মধ্যে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের মধ্যে ডিসটিংশন নেই। আমরা তো তাদের কাছ থেকে এই জিনিসগুলো শিখতে পারি?'

'পারি কি পারি না, সে প্রশ্নে আমি পরে যাচ্ছি। তার আগে তোর নারী-স্বাধীনতার পয়েন্টটা একটু ক্লিয়ার করি। আচ্ছা বল তো! আমেরিকার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট কে?'

রকি অনেকক্ষণ ভাবল। এরপর বলল, 'সরি! মনে পড়ছে না। কে?'

ফারিস মুচকি হেসে জবাব দিলো, 'কোনও নারী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারেনি। আর সাম্যের ব্যাপারটা শুনবি?'

রকি চুপ করে আছে দেখে ফারিস বলল, 'আমেরিকায় আজও সাদা-কালোর ভেদাভেদ দূর করা সম্ভব হয়নি। আমেরিকার গত ২০০ বছরের ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যাবে, বর্ণবাদ সেদেশের অনেক পুরোনো সমস্যা। এমনকি উত্তর ও দক্ষিণের যুদ্ধ নামে যে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ হয়েছিল, তার কারণও বর্ণবাদী সংকট। বর্ণবাদ সে দেশে এতটাই প্রবল যে, স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। হোয়াইট হাউসে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের তিনি জানিয়েছেন—"বর্ণবৈষম্য আমাদের সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত, এটা আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত"।'

ফারিসের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল, রকির মতো আমেরিকাকে যারা সভ্যতার ঈশ্বর বলে মনে করে, তাদের অবশ্যই এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। আমেরিকার অভ্যন্তরীণ দিকটা তাদের গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত। তারপর পাশ্চাত্য-সভ্যতার পক্ষা নেওয়া উচিত। তবে যাদের অন্তরই বক্র, সত্য তাদের অন্তরে কীভাবে প্রতিফলিত হতে পারে!

ফারিস রকিকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুই একবার ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়েছিলি না?'

'হুঁ। পাপার সাথে একবার গিয়েছিলাম। ওখানে আমার আন্টি থাকেন।' রকি জবাব দিলো।

'ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি শহর আছে—নাম নিপটন; তুই চিনিস?'

'হোয়াই নট? আমার আন্টি যে সিটিতে থাকেন, তার পাশেই নিপটন।'

'তুই শুনলে হয়তো অবাক হবি, অ্যামেরিকান গ্রিন নামে একটি কোম্পানি ৫০ লাখ ডলারে শহরটি কিনে নিয়েছে।'

'সো হোয়াট? তাদের ডলার আছে, কিনেছে। সারপ্রাইজড হওয়ার কিছু নেই।'

‘শহর কেনাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, সে আমিও জানি। তবে শহরকে যদি গাঁজার শহর বানানোর জন্যে কেনা হয়, তাহলে অবাক না হয়ে পারা যায়, বল?’

‘কে বলেছে তোকে, নিপটন গাঁজার শহর হবে?’

‘কোম্পানিটির প্রেসিডেন্ট ডেভিড গাথার নিজ মুখে বলেছেন, এখানে গাঁজার বিপ্লব হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সোনার যেমন বিপ্লব হয়েছিল, আমরা এমনভাবে এই বিপ্লব ঘটাব।’

ফারিসের কথা শুনে রকি মনে মনে কী যেন ভাবতে লাগল। আসলে আমেরিকা যাদের স্বপ্নের দেশ, তারা কী করে আমেরিকার এমন অভ্যন্তরীণ অবস্থা মেনে নিতে পারে? কষ্ট তো তাদের হবেই। হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমার মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্নটা করার সুযোগ খুঁজছিলাম। রকি চুপ হয়ে গেল দেখে প্রশ্নটা করেই ফেললাম।

‘আচ্ছা ফারিস, আমেরিকায় তো আইন-কানুনের কমতি নেই। আইনের বাস্তবায়ন তাদের দেশে অনেক বেশি। তবুও এত এত অপরাধের সাথে আমেরিকানরা জড়িত কেন?’

‘খুব সুন্দর প্রশ্ন। তুই ঠিকই বলেছিস, আমেরিকার কোনও কিছুর ঘাটতি নেই। অর্থ, বিত্ত, বৈভব কোনওটারই তাদের কমতি নেই। শুধু একটা জায়গায় তাদের কমতি, যার কারণে তাদের সমস্যা না কমে বেড়েই চলেছে।’

‘কী সেটা?’

‘আমেরিকান সভ্যতার শুরু হয়েছে এমন লোকদের দ্বারা, যাদের কাছে সামান্য পরিমাণও ওহীর জ্ঞান ছিল না। সে সমাজে ধর্মগুরুরা অবশ্য ছিল, কিন্তু তাদের কাছে স্রষ্টার অবিকৃত নির্দেশ ছিল না। যে বিকৃত ধর্মটি সে সমাজে ছিল, তা সবদিক থেকে পথ দেখাতে অক্ষম ছিল। শুধু অক্ষম বললে ভুল হবে, তা ছিল উন্নতির পথে বাধা। যার কারণে সমাজপতিরা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর নতুন দিকে যাত্রা শুরু করে। সে যাত্রা শুরু হয় ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদের কেন্দ্রবিন্দু থেকে।

তাদের যাত্রাকে আরও বেগবান করে ডারউইন সাহেব। পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ-আমলে স্রষ্টাবিমুখ সভ্যতার যে বীজ লাগানো হয়েছিল, কয়েক শতকেই তা বিশাল গাছে পরিণত হয়। সে গাছের ফল দেখতে সুন্দর হলেও, বাস্তবে তা মাকাল ফলের মতো। তার ফুল সুন্দর, তবে তা ধুতুরা ফুলের মতো। তার শাখা-প্রশাখায় বসন্তের বাতাস আছে। কিন্তু তার থেকে প্রবাহিত বাতাস বিষাক্ত। অত্যন্ত বিষাক্ত। সে বিষাক্ত বাতাস আজ পাশ্চাত্য-সভ্যতাকেই নয়, পুরো মানবতাকে বিষাক্ত করে তুলছে।

পাশ্চাত্য-সভ্যতা নিজ হাতে যে গাছ লাগিয়েছিল, আজ তারা নিজেরাই তার প্রতি অসন্তুষ্ট। সে গাছ তাদের জীবনকে জটিল করে তুলেছে। এমন জটিল যে, শত প্রচেষ্টাও তার সমাধান এনে দিতে পারছে না। তাদের হাতে তৈরি সভ্যতা, আজ তাদের জীবন কেড়ে নিচ্ছে। প্রতিনিয়ত যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে। সে যন্ত্রণা সইতে না পেরে, প্রতিবছর অর্ধ লক্ষ আমেরিকান আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।'

রকি এতক্ষণ চুপ করে ফারিসের কথা শুনে যাচ্ছিল। ফারিসের কথা শেষ হতেই সে বলে উঠল, 'সো, ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশান আমাদের কিছুই দেয়নি? নাথিং!'

'আমি কখন তা বললাম?'

'তোর কথা শুনে তো এমনটাই বোঝা যাচ্ছে।'

'না ভাই। এটা তোর বোঝার ভুল। পাশ্চাত্যের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান বেশি আছে। শুধু বেশিই না, অনেক বেশি আছে। কিন্তু সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ তাদের কাছে নেই। তারা একটা জায়গায় এসে মারাত্মক ভুল করেছে। তাই তাদের অবস্থা এমন হয়েছে।'

'কোন জায়গায়?'

'তারা প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের অধীন পেয়েছে। প্রয়োজনমতো সেগুলোকে ব্যবহারও করেছে। কিন্তু তারা যে সে সম্পদের মালিক নয়, আসল মালিকের প্রতিনিধি মাত্র, সেকথা ভুলে গিয়েছে। ফলে বস্তুবাদ তাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছে। আস্তে আস্তে তারা নাস্তিক্যবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদের দিকে এগিয়ে গেছে। আজ তারা যে পদক্ষেপই নিচ্ছে, তা-ই বিফল হচ্ছে।

তারা যখন পুঁজিবাদের ওপর আঘাত করল, তখন সমাজতন্ত্র চলে এল। যখন সমাজতন্ত্রের ওপর আঘাত করল, তখন ডিক্টেটরবাদ চলে এল। যখন ডিক্টেটরবাদের ওপর আঘাত করল, তখন জমহুরিয়াত চলে এল। একে একে সাম্যবাদ, নারীবাদ, জন্মনিয়ন্ত্রণবাদের সূচনা হলো। নৈতিকতা বাদ দিয়ে যখন তারা নফসের গোলামি করতে লাগল, তখন অপরাপ্রবণতা আরও বেড়ে গেল। মানুষ আইন অমান্য করতে লাগল। আস্তে আস্তে পাশ্চাত্য-সভ্যতা এক অভিশপ্ত সভ্যতায় পরিণত হলো। অভিশপ্ত সভ্যতা থেকে বিকৃতির অনেক ধারা বেরিয়ে এল। সে ধারাগুলো জমা হয়ে বিরাট এক বিষফোঁড়ায় পরিণত হলো। যে ফোঁড়ার যন্ত্রণায় তারা আজ অতিষ্ঠ। এতটাই অতিষ্ঠ যে, চিৎকার করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে।'

আমাদের কথোপকথন আরও কিছুক্ষণ চললে ভালো হতো। কিন্তু এরই মধ্যে রকিকে নিতে গাড়ি চলে এল। তাই রকি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলো।

রকি চলে যাওয়ার পর ফারিস বলল, 'অভিশপ্ত সভ্যতা—অভিশাপের আগুনে জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়েছে। আগুনের উত্তাপ তাদের তৃষ্ণার্ত করে তুলেছে। সে সভ্যতার সবাই আজ তৃষ্ণার্ত। কেবল পানি পানি বলে চিৎকার করে যাচ্ছে। পানির নাম অবশ্য শুনেছে, কিন্তু তার আসল চেহারা দেখেনি কোনও দিন। তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এও শুনেছে—সাবধান! ওই পানির ধারে কাছেও যেয়ো না।

আজ পরিস্থিতি এমন হয়েছে, সে পানির নাম গোপন করে যদি তাদের দেওয়া হয়, তাহলে তারা একবাক্যে স্বীকার করে নেবে—এ পানি এতদিন কোথায় ছিল? আমরা তো এরই অপেক্ষা করছিলাম। আগে কেন এ পানি আমাদের দেওয়া হলো না? আমরা কী ধোঁকার মধ্যেই না ছিলাম! বল তো, সে পানির নাম কী?'

'ইসলাম।'

আমার জবাব শুনে ফারিস এক ফালি হাসি উপহার দিলো। সে হাসির কাছে সূর্যের আলোটাও ম্লান মনে হলো।

তথ্যসূত্র :

♦ ১) বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান, হাদীস নং : ৬৫৪৪।

♦ ২) তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, *আস-সুনান,* অধ্যায় : স্বপ্ন ও তার তাৎপর্য, হাদীস নং : ২২৯১।

♦ ৩) *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব,* অনুবাদ : মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, (খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ, ১৯৭৬)

♦ ৪) WHO, Alcohol Consumption Rate in the USA, http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/usa.pdf

♦ ৫) Crime in the United States, FBI. 2011. Retrieved 15 May 2013. https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2011/crime-in-the-u

♦ ৬) "Criminal Victimization Survey", Bureau of Justice Statistics. 2011. Retrieved 15 May 2013. http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/cv11.pdf

♦ ৭) Sacks JJ, Gonzales KR, Bouchery EE, Tomedi LE, Brewer RD. 2010 National and State Costs of Excessive Alcohol Consumption. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26477807

♦ ৮) World Health Organization. Global Status Report on Alcohol and Health—2014. Geneva, Switzerland: World Health Organization; http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/

♦ ৯) Kanny D, Brewer RD, Mesnick JB, Paulozzi LJ, Naimi TS, Lu H. Vital Signs : Alcohol Poisoning Deaths — United States, 2012–2010. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6353a2.htm?s_cid=mm6353a2_w

♦ ১০) Stahre M, Roeber J, Kanny D, Brewer RD, Zhang X. Contribution of excessive alcohol consumption to deaths and years of potential life lost in the United States http://www.cdc.gov/pcd/issues/0293_13/2014.htm

♦ ১১) Abbey A. Alcohol-related sexual assault : A common problem among college students. J Stud Alcohol Suppl 128–118 : 14;2002. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12022717?dopt=Abstract

♦ ১২) Rehm J, Baliunas D, Borges GL, Graham K, Irving H, Kehoe T, et al. The relation between different dimensions of alcohol consumption and burden of disease : an overview. Addiction. 43-817 : (5)105;2010. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rehm+J2%C+Baliunas+D2%C+Borges+GL2%C+Graham+K2%C+Irving+H2%C+Kehoe+T2%C+et+al.+The+relation+between+different+dimensions+of+alcohol+consumption+and+burden+of+disease3%A+an+overview.+Addiction.2+3%010B3%(5)105A43-817.

♦ ১৩) "Crime in the US, 2004-1960, Bureau of Justice Statistics" (http://bjsdata.ojp.usdoj.gov/dataonline/Search/Crime/State/StateCrime.cfm). Retrieved 29-09-2006. Heath, Brad (March ,13 2014).

♦ ১৪) "A license to commit crimes" (http://www.usatoday.com/longform/news/nation/11/03/2014/fugitives-unwanted-extradition-investigation-crime-violence/6273375/). USA Today. pp. 1B, 4B. Retrieved March 2014 ,13.

♦ ১৫) http://www.nbcnews.com/id/6089353/ns/health-addictions/t/alcohol-linked-us-deaths-year/#.WZ9tVz6GPIU

♦ ১৬) https://www.cdc.gov/nchs/fastats/alcohol.htm

♦ ১৭) https://www.cdc.gov/nchs/data/nhis/earlyrelease/earlyrelease201705.pdf

♦ ১৮) https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2011/crime-in-the-u.s.-2011/tables/table1-

♦ ১৯) https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2011/crime-in-the-u.s.-2011/tables/table2-

♦ ২০) https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2011/crime-in-the-u.s.-2011/tables/table7-

♦ ২১) https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245

♦ ২২) https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cv15.pdf

♦ ২৩) http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-alcohol-related-deaths-years-lost-sxsw-20140313-story.html

♦ ২৪) http://www.bbc.com/bengali/news41250102-

♦ ২৫) http://www.bbc.com/bengali/news40826829-

♦ ২৬) https://www.prothom-alo.com2%Fnorthamerica2%Farticle%

♦ ২৭).https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2011/crime-in-the-u.s.-2011/offenses-known-to-law-enforcement/standard-links/national-data

♦ ২৮) https://www.webroot.com/us/en/home/resources/tips/digital-family-life/internet-pornography-by-the-numbers

♦ ২৯) https://www.churchmilitant.com/news/article/new-survey-of-porn-use-shows-startling-stats-for-men-and-women

মানবী : ইসলাম বনাম আধুনিক বিজ্ঞান

আজ কিছুটা আগেই স্যার ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। অবশ্যি তারও একটা কারণ আছে। নয়তো যে স্যার কাঁটায় কাঁটায় ক্লাস শেষ করেন, তিনিই কিনা আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে যাবেন, তা কী করে হয়? কেউ কাগজ পেঁচিয়ে আরেক জনকে ঢিল মেরেছিল। ভুলে ঢিলটা স্যারের গায়ে লেগেছে। যে ঢিল মেরেছিল, স্যার বার বার তাকে দাঁড়াতে বলছিলেন। কেউই দাঁড়ায়নি। তাই স্যার রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। রিকোয়েস্ট করেও স্যারকে আর ক্লাসে আনা গেল না।

বিরতি পেয়ে কেউ কেউ ঘুরতে চলে গেল। অনেকে আবার ক্লাসেই মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত রইল। ফারিসের ইচ্ছে ছিল লাইব্রেরিতে যাওয়ার। জোর করে ধরে ক্যান্টিনে নিয়ে গেলাম। খুব চা খেতে ইচ্ছে করছিল, তাই।

আমরা দক্ষিণ দিকের ছোট টেবিলটিতে বসলাম। অর্ডার ফারিসই দিলো। তবে চা নয়, কফি। চকলেট ফ্লেভারের কফি। কফি খেতে খেতে গল্প করছিলাম। মিনিট দশেক পর রফিক ভাই এলেন। আমি খানিকটা অবাক হলাম! হব না কেন বলুন। উনার সাথে আমাদের বেশি দেখা হয় ক্যান্টিনে। যতদিন ক্যান্টিনে এসেছি, প্রায় সময়ই তাঁর সাথে দেখা হয়েছে। সময়টা কাকতালীয়ভাবেই মিলে যায়।

ফারিসকে দেখে তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। কফি খাচ্ছি দেখে একটু ঠাট্টা করেই বললেন, 'কী রে মোল্লার দল? তোরা দেহি ক্যান্টিনে বইয়া বইয়া কফি খাইতাছস। কাম কাজ নাই?'

ফারিস বলল, 'থাকবে না কেন ভাই? অবশ্যই আছে। কাজের মাঝে একটু বিরতি নিলাম। শরীরটা চাঙা করার জন্যে। এই আরকি।'

'ভালো ভালো।'

আসাদ মামাকে ডেকে আরও একটা কফি দিতে বললাম। রফিক ভাই একটা সিগারেট ধরালেন। একটান দিয়েই নিভিয়ে ফেললেন। নেভানোর কারণটা অবশ্যি ফারিস। রফিক ভাই জানেন সিগারেটের গন্ধ ফারিস একদম সহ্য করতে পারে না।

মিনিট পাঁচেক পর কফি এল। কফির কাপটা ফারিস ভাইয়ের দিকে এগিয়ে দিলো।

কাপে চুমুক দিয়ে রফিক ভাই বললেন, 'মোল্লারা এত নারীবিদ্বেষী অয় কেন রে? হেগো সমস্যাডা কোন জায়গায়?'

ফারিস বলল, 'ঠিক বুঝলাম না ভাই।'

'বুঝো না? ফিডার খাও?'

'সত্যিই বুঝিনি ভাই। যদি একটু ক্লিয়ার করে বলতেন।'

'মোল্লারা নারী-পুরুষের সমান-সমান অধিকারে বিশ্বাস করে না ক্যান?'

কথা নেই বার্তা নেই হুট করে কী-সব অবান্তর প্রশ্ন। যা ধারণা করেছিলাম তা-ই। তিনি তর্ক করার জন্যেই এ প্রশ্ন করেছেন। ভাব দেখে মনে হচ্ছে প্রস্তুতি বেশ জোরালো। ফারিস তাঁর প্রশ্নের জবাবে মুচকি হেসে বলল, 'কীভাবে বুঝলেন ভাই?'

'কেমনে আবার? নারী-উন্নয়নের লাইগা আমরা যা-ই করি, হেইডাই তাগো গায়ে লাগে। সম্পত্তিত সমান অধিকার দিলে লাগে। কাজকামের সুযোগ কইরা দিলে লাগে। যৌন-স্বাধীনতা দিলে লাগে। যহনই নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা কই, তহনই তাগো লাগে। বুঝলি?'

'কেন লাগে, তা জানেন কি?'

'ক্যান আবার? মোল্লারা তো নারী-অধিকারে বিশ্বাস করে না। আর করবই কেমনে? তারা তো বিজ্ঞান নিয়া পড়াশোনা করে না, খালি কোরান-হাদিস লইয়া পইড়া থাকে। সব কিচ্ছুরে কোরান দিয়া মাপবার চায়। মধ্যযুগের কিতাবে কি—আধুনিক যুগের সমাধান পাওয়া যায়?'

'সবকিছুকে কোরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করাটা অন্যায়?'

'অন্যায় না মানে? হাজার বছরের আগের কোরান দিয়া আমাগো সমাজ মাপলে চলব? এহন আধুনিক যুগ। বিজ্ঞানের যুগ। সবকিছু বিজ্ঞান দিয়ে মাপতে অইব, কোরান দিয়া না। ওইসব পুরান ধ্যানধারণা ফালাইয়্যা দিয়া বিজ্ঞানমনস্ক জাতি অওন লাগব। নয়তো আগান সম্ভব না।'

ইকোনোমিক্সের ছাত্রের বিজ্ঞানের প্রতি এত দরদ, সত্যিই অবাক করার মতো। তবে তিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে কতটা জানেন, তা আমি জানি। বেশ ভালোই জানি। বেশ ক-মাস সময় নিয়েও 'বান্ডেল অফ হিস' কোথায় থাকে, বলতে পারেননি। আফটার অল 'বিজ্ঞানমনস্ক' বলে কথা! ফারিস এবার রফিক ভাইকে বলল, 'খুব ভালো লাগল আপনার কথা শুনে। বিজ্ঞানের প্রতি আপনার যথেষ্ট দরদ আছে দেখছি।'

'থাকব না ক্যান? বিজ্ঞান ছাড়া কি চলা যায়? বিজ্ঞানের চর্চা করি বইলাই নারীদের

লইয়া ভাবি। সমাজ লইয়া ভাবি। দ্যাশ লইয়া ভাবি।'

'আচ্ছা ভাই, ইসলামকে আপনি নারীবিদ্বেষী ধর্ম মনে করেন কেন?'

'করমু না ক্যান? না কইরা উপায় আছে? পুরা ইসলামডাই তো পুরুষগো লাইগা। নারীরে তো ইসলাম দাসী-বান্দী মনে করে।'

'আপনার কাছে কেন এমনটা মনে হয়?'

'ক্যান অয়, তা তো আগেই কইলাম। ইসলাম মাইয়্যাগো সমান অধিকার দিবার চায় না। খালি বন্দী কইরা রাখবার চায়। ইসলামে পোলারা বেশি পায়। নারীরা এক্কেবারেই কম। যা পায়, হেইডা না পাওয়ার সমান।'

'আমি যদি বলি ইসলাম সম্পর্কে আপনার ধারণাটা ভুল?'

'ভুল মানে?'

'মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ সমান—এ কথা ইসলাম কখনো অস্বীকার করে না।'

'হা হা হা। তাই নাকি? নতুন শুনলাম মনে অয়।'

'আমাকে কি একটু বলতে দেবেন?'

'দিমু না ক্যা? ক। কেমনে সমান করছে হেইডা বোঝাইয়া ক।'

'ইসলাম নারী-পুরুষকে গড়ে সমান করেছে, সবক্ষেত্রে নয়। উভয়ের জন্যে ইসলাম নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জকে ফরয করেছে। আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের ﷺ আনুগত্যের ব্যাপারে উভয়কেই সমান করেছে। আমলের ফযীলতের ক্ষেত্রে সমান করেছে। শাস্তির ক্ষেত্রেও সমান করা হয়েছে। অপরাধ করলে উভয়েই শাস্তি পাবে। জ্ঞান অর্জন উভয়ের ওপরেই ফরয। ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের মতোই স্বাধীন। উভয়কে মতপ্রকাশের অধিকার দেওয়া হয়েছে। আইনি অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি সুযোগ পেয়েছে।'

'তাই নাকি? মিছা কতা কস ক্যা?'

'মিথ্যা বলব কেন ভাই?'

'তোর কতার এভিডেন্স আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। অবশ্যই আছে।'

'ক দেহি?'

'একবার এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এল। এসে জিজ্ঞাসা করল, হে

আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার কে? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার বলল, তারপর কে? রাসূল ﷺ এবারও জবাব দিলেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? এবার রাসূল ﷺ বললেন, তোমার বাবা।"[৪১] এই হাদীস স্পষ্ট করে দিচ্ছে—একজন মা, পিতার থেকে তিন গুণ বেশি ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকার রাখে।

আরেক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন সে এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি আর সে এ রকম থাকব।"[৪২] এরপর তিনি নিজের আঙুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন। কন্যাসন্তানকে এই হাদীসের মাধ্যমে অনেক বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। দুটি ছেলে লালনপালন করলে, সে জান্নাতে নবীর ﷺ সাথে থাকবে—এমনটা বলা হয়নি। দুটি কন্যার কথা বলা হয়েছে।

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেসব লোক উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।"[৪৩] এই হাদীসের মাধ্যমে স্ত্রীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। উত্তম হওয়ার জন্যে শুধু ব্যক্তিগত আমল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বলা হয়নি, স্ত্রীর কাছেও উত্তম হতে বলা হয়েছে। আর সব থেকে বড় ব্যাপার হলো, ইসলামে সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম লিঙ্গ নয়।'

'তুই কি কইবার চাস, ছেলে-মেয়ে হইয়া জন্ম নেওয়ার মধ্যে সম্মান নাই? সম্মান অন্য জায়গায়?'

'জি ভাই। আমি সেটাই বলতে চাই। ইসলামে সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম নারী বা পুরুষ হওয়ার মধ্যে নেই। তাকওয়ার মধ্যে রয়েছে। যার তাকওয়া বেশি, সে-ই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত। হোক সে পুরুষ বা নারী। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান।"'[৪৪]

'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ইসলাম তো সব দিক দিয়া নারী ও পুরুষরে সমান মনে করে নাই। এইডাই তো মেইন সমস্যা।'

'আচ্ছা ভাই, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের শারীরিক গঠনের মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে?'

---

[৪১] বুখারী, *আস-সহীহ*, ৯/৫৫৪৬; বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদীস নং : ৩, ৫, ৬।
[৪২] নাবাবী, *রিয়াদুস সালিহীন*, ১/২৭২।
[৪৩] নাবাবী, *রিয়াদুস সালিহীন*, ১/২৮৩, আলবানী, *আদাবুয যিফাফ*, পৃষ্ঠা : ১৫৮।
[৪৪] সূরা হুজুরাত, (৪৯) : ১৩ আয়াত।

‘পাগলে কয় কী? হা হা হা। থাকব না কেন? আছে বইলাই তো তারা নারী, আর আমরা পুরুষ। হা হা হা।’

‘তা কয়েকটা বলেন তো শুনি।’

‘তাগো শরীর নরম, আমাগো শক্ত। তারা বাচ্চার জন্ম দিতে পারে, আমরা পারি না। হেগোরে ঋতুস্রাব অয়, আমাগো অয় না। তারা দেখতে আমাদের থেইকা সুন্দর। আরও কত পার্থক্য আছে।’

‘এগুলো তো নর্মাল পার্থক্য। অভ্যন্তরীণ কী কী পার্থক্য আছে?’

‘তাগো নাকি রোগ-বালাই কম অয়। বাঁচেও বেশিদিন।’

‘জি। আর কী কী পার্থক্য আছে?’

ফারিসের প্রশ্ন শুনে রফিক ভাই মাথা চুলকাচ্ছে। উত্তর দেওয়ার বদলে ইয়ে মানে করেই শেষ। তাঁর বিজ্ঞানচর্চাটা এতক্ষণে বেশ ভালোই ফুটে উঠেছে। ইসলাম আর হুজুরদের নিয়ে রফিক ভাইয়ের হেঁয়ালিপনা আমাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছিল। কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এবার সেই সুযোগ এল। ফারিস কিছু বলতে যাবে, তখন আমি বললাম, ‘নারী-পুরুষের পার্থক্যগুলো আমি বলি?’

‘নিশ্চয়। কেন নয়?’ ফারিস জবাব দিলো।

রফিক ভাই আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল। আমি সে দিকে তোয়াক্কা না করে বলতে শুরু করলাম, ‘আমরা জানি, মস্তিষ্ক হচ্ছে মানবদেহের মূল চালিকাশক্তি। যার দ্বারা পুরো দেহ পরিচালিত হয়। গত দশ বছরে বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানীদের পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পুরুষ ও মহিলাদের মস্তিষ্কে গঠনে পার্থক্য আছে। আছে তথ্য প্রক্রিয়াজাত-পদ্ধতির ভিন্নতা। তাদের উপলব্ধি, কল্পনা, স্বভাব ও পারদর্শিতার ক্ষেত্রগুলো ভিন্ন। শারীরিক দিক দিয়ে পুরুষরা অধিক শক্তিশালী। পুরুষদের পেশিশক্তিও বেশি। সাধারণভাবে পুরুষদের মস্তিষ্কের ওজন, এক শ গ্রাম বেশি। মস্তিষ্কের কোষকলার সংখ্যা চার পার্সেন্ট বেশি।

পুরুষের ফুসফুস বেশি বাতাস ধরে রাখতে পারে। পুরুষদের মধ্যকরোটিগত লোব, যা গণনার কাজ করে থাকে, তা তুলনামূলক বড়। তাই তারা গণিত, জ্যামিতি এসবে পারদর্শী হয়। স্থানসম্পর্কিত ধারণা বেশি থাকায় সহজে মানচিত্রের ভাষা বুঝতে পারে। মহিলাদের ‘লিমবিক সিস্টেম’ গভীর ও ছড়ানো। তাই পুরুষরা আবেগ ও অনুভূতি বিশ্লেষণে, বিস্তৃত মাত্রায় তথ্যসংগ্রহে, তথ্যগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরির ক্ষেত্রে অধিক পারদর্শী। সাধারণভাবে বলা যায়—পুরুষরা পদার্থবিদ্যা এবং গণিতে পারদর্শী। আর মহিলারা ভাষাজ্ঞানে, আবেগ-অনুভূতি অনুধাবনে পারদর্শী।

মহিলাদের বিপাকীয় পদ্ধতি পুরুষদের তুলনায় ধীর। তবে হৃৎস্পন্দন কিছুটা বেশি। মহিলাদের ফুসফুস ছোট; কিন্তু কিডনি, পাকস্থলী, যকৃৎ কিছুটা বড়। সন্তান জন্ম দেওয়া, দুধ পান করানো, এসব কারণে হরমোন-সংক্রান্ত কার্যকারিতা মহিলাদের বেশি। জীবনীশক্তিও বেশি। সাধারণভাবে তারা বেশি দিন বাঁচে।'

আমার কথা শেষ হলে ফারিস বলল, 'মানসিক দিক থেকেও নারীরা পুরুষদের থেকে ভিন্ন।'

'তাই নাকি?' রফিক ভাই বেশ অবজ্ঞার সুরে বলেন।

'হুম, তাই। নারীর আবেগ-উচ্ছ্বাস বেশি উথলে ওঠে। তারা দ্রুত অস্থির হয়ে পড়ে। পছন্দনীয় বিষয়ে ও ভয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ঠাণ্ডা মেজাজের পরিচয় দেয়। নারী সৌন্দর্যচর্চা, অলঙ্কার, সাজগোজ ও বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশন পছন্দ করে। নারীর আবেগ-উচ্ছ্বাস কমস্থায়ী হয়। নারীরা অধিক সতর্ক ও ধার্মিক হয়। তারা বেশি কথা বলে। বেশি ভয় পায়। আনুষ্ঠানিকতার বেশি পক্ষপাতী। ভাষাজ্ঞান—বিশেষ করে ব্যাকরণ, বানান, বাক্যগঠনে—তারা বেশি পারদর্শী।

নারীরা মানুষের সাথে কাজ করতে আগ্রহ পায়, পুরুষরা যন্ত্রের সাথে। নারীরা বেশি আবেগতাড়িত হয়। ঋতুকালীন স্নায়ুবিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। হজমশক্তি কমে যায়। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। কাজের একাগ্রতা কমে যায়। শক্তি কমে যায়। সন্তান প্রসবকালীন তারা মানসিক চাঞ্চল্যে ভোগে। অনুভূতিশক্তি কমে যায়। আরও মজার বিষয় কী জানেন? নারী-পুরুষের এই পার্থক্যটা শিশুকাল থেকেই শুরু হয়।'

'সত্যিই?'

'হ্যাঁ ভাই, সত্যিই। জন্মের সময় থেকেই দুটি লিঙ্গের পার্থক্য স্পষ্ট হয়। ছেলে শিশু ঘূর্ণায়মান বস্তু দেখে খুশি হয়। মেয়েশিশু মানুষের মুখ দেখে খুশি হয়। মেয়ে শিশুদের স্নিগ্ধ কথা বা গান দিয়ে সহজেই ভুলিয়ে ফেলা যায়। ভাষা পুরোপুরি বোঝার আগেই, ভাষার আবেগ তারা বুঝতে পারে। মেয়েশিশুরা ছেলেশিশুদের আগে কথা বলতে শেখে। স্কুলে ভর্তির বয়সের আগেই স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে।'

'মেলা পার্থক্য তাইলে?'

'তাহলে এখন বলুন তো, ইসলাম কীভাবে এই পার্থক্যগুলো এড়িয়ে যেতে পারে? আপনাদের বিজ্ঞানই তো নারী-পুরুষকে সব ক্ষেত্রে সমান ঘোষণা করেনি।'

'ভালোই পাকনামি শিখছস দেখা যায়। বিজ্ঞান তো নারী-পুরুষের দৈহিক পার্থক্যের কথা কইছে। কাজের পার্থক্যের কথা না। ইসলাম তো কাজেরও পার্থক্যের কথা কয়।'

'দৈহিক পার্থক্যের কারণে কি কাজের পার্থক্য হয় না?'

রফিক ভাই ফারিসের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না। দৈহিক পার্থক্যের কারণে কাজের পার্থক্য ঘটবে, এটা স্বীকৃত বিষয়। দ্বিমত করার সুযোগ নেই। গাঠনিক পার্থক্যই বলে দিচ্ছে, পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষমতা এক নয়; ভিন্ন। নারীরা যেসব কর্মে পারদর্শী, পুরুষরা তার ভিন্নকর্মে পারদর্শী। নারীরা যেসব জিনিসে আনন্দ লাভ করে, পুরুষরা তার ব্যতিক্রম জিনিসে আনন্দ লাভ করে। প্রত্যেককে তার স্বভাবসুলভ কাজে নিয়োগ করাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? রফিক ভাইয়ের মতো লোকেরা যত তাড়াতাড়ি এই সত্যটা স্বীকার করবেন, ততই মঙ্গল। নয়তো সমান অধিকারের কথা বলে, নারীকে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করাটা বিপজ্জনক বৈ কি। ভাবলাম রফিক ভাইকে কিছু বলি। কিন্তু চেপে গেলাম।

এরপর ফারিস রফিক ভাইকে বলল, 'মনে করুন, ভার্সিটির সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের দায়িত্ব আপনার কাঁধে। সে প্রোগ্রামে গান গাওয়ার জন্যে আপনি কাকে নির্বাচন করবেন? যার গলা সবচেয়ে কর্কশ, নিশ্চয়ই তাকে?'

'যার গলা খারাপ হেরে দিয়া কী করমু? যার গলা ভালা হেরে নির্বাচন করুম।' রফিক ভাইয়ের তাৎক্ষণিক জবাব।

'নাচার জন্যে কাকে নেবেন? যে ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, তাকে?'

'হা হা হা। নাচার লাইগ্যা ভালো নাচ যে জানে, হেরে বাইছা নিমু।'

'অভিনয় করতে কাকে নেবেন? যে ভালো কবিতা লিখতে পারে, তাকে?'

'তোর মতলব আমি ভালোই বুজবার পারছি। তুই কি আমারে এইডাই কইবার চাস, ইসলামও নারী-পুরুষরে যোগ্যতা অনুসারে কাম ভাগ কইরা দিছে?'

'জি ভাই, আপনি ঠিক ধরেছেন।'

'তোর কথা শুইনা আবারও হাসনের ইচ্ছা অইতাছে। ইসলাম নারীরে বন্দী কইরা রাখছে। এক্কেবারে তালাবন্দ। সব কাজ-কামের সুযোগ থেইকা নারীরে বঞ্চিত করছে। আর সব বোঝা পুরুষের ওপরে চাপাইয়্যা দিছে।'

'না ভাই। আপনার ধারণা ভুল। ইসলাম নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে, কাজের ক্ষেত্রগুলো আলাদা করে দিয়েছে। নারীকে এমন কাজে বাধ্য করেনি, যা তাদের জন্যে অমানবিক। আবার পুরুষকেও এমন কাজে বাধ্য করেনি, যা তাদের জন্যে দুঃসাধ্য। নারীকে যদি শক্ত পরিশ্রমের কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে তার ফিজিক্যাল প্রবলেম হবে। আর শুধু ফিজিক্যাল প্রবলেমই নয়, তাদের গর্ভধারণেও সমস্যা হবে।'

'তুই কইতে চাস, নারীরা কোনও চাকরি-টাকরি করবার পারব না? খালি ঘরে বইয়া থাকব? আর বাচ্চা পালব?'

'আমি কখন সেটা বললাম?'

'তোর কথা শুইনা তো হেইডাই বোঝা যায়।'

'না ভাই, আপনার সে ধারণা করার সুযোগ নেই।'

'কেন?'

'আল্লাহ ﷻ বলেছেন, "অতএব তোমরা তাঁর পথেঘাটে বিচরণ করো, এবং তাঁর দেওয়া রিযিক আহার করো।"[৪৫] আর শাইখ ড. আল-আরিফি বলেছেন, "এই আয়াতের মাধ্যমে উভয়কেই (নারী ও পুরুষ) জীবিকা অন্বেষণের জন্যে চেষ্টা-তদবীর করতে বলা হয়েছে।" তবে নারীরা সে কাজই করবে যা তাদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল।'

'নারীরা চাইলে সবই করবার পারে। তারা পারে না এমন কোনও কাম নাই।'

'না ভাই, আপনার ধারণা ভুল।'

'ভুল?'

'জি ভাই। ভুল।'

'ক্যান?'

'কারণ, নারী-পুরুষের চিন্তার জগৎ থেকে শুরু করে সবটাই আলাদা।'

'তোরে কেডায় কইছে?'

'এটা মনোবিজ্ঞানীদের কথা ভাই। মার্কিন মনোবিজ্ঞানী প্রফেসর রিক্ বলেন, "নারী ও পুরুষ তাদের লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের দাবি অনুযায়ী পৃথকভাবে ক্রিয়া করে এবং ঠিক দুটি ভিন্ন অক্ষে অবস্থিত দুটি ভিন্ন নক্ষত্রের ন্যায় পথ চলে। তারা পরস্পরকে বুঝতে পারে এবং পরস্পরের পরিপূরক হতে সক্ষম। কিন্তু তারা কখনো এক বা অভিন্ন হয় না। এ কারণেই নারী ও পুরুষ একত্রে জীবনযাপন করতে পারে, পরস্পরকে ভালোবাসতে পারে এবং পরস্পরের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি থেকে ক্লান্ত ও অসন্তুষ্ট হয় না।"'

'আরে রিকের কথা বাদ দে। তাঁরে আমার ভালো লাগে না। তাঁর লেখা একটা বই আমিও পড়ছি। সে খালি পুরুষদের পক্ষ নিয়া কথা কয়।'

'আচ্ছা রিকের কথা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু উইল ডুর‍্যান্ট-এর কথাও কি বাদ

[৪৫] সূরা মুলক, (৬৭) : ১৫ আয়াত।

দেবো?'

'উইল ডুর‍্যান্ট -এর কোন বিষয়টার কথা কইতাছস?'

'*The Pleasures of Philosophy* বইটার কথা।'

বইটার নাম শুনে রকিফ ভাই কিছু বললেন না। আমি ফারিসকে বললাম, 'কী বলা আছে ঐ বইতে?'

ফারিস বলল, 'উইল ডুর‍্যান্ট বলেছেন, "নারীর সতীত্ব তার সন্তান জন্মদানের লক্ষ্যের সেবায় নিয়োজিত। কারণ, নিজেকে আড়াল বা আবৃত করে রাখার কায়দায় সে নিজেকে বিরত রাখে; তা তাকে বিপরীত লিঙ্গের সাথি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। সতীত্ব নারীকে নিজ প্রেমিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কাকে সে নিজ সন্তানদের পিতৃত্বের গৌরব প্রদান করবে, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অধিকতর সক্ষম করে তোলে। সমষ্টির ও মানবজাতির স্বার্থ নারীর মুখে কথা বলে, ঠিক যেভাবে ব্যক্তির স্বার্থ পুরুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে।"

এরপর তিনি আরও বলেছেন,"বস্তুত প্রেমের খেলায় নারী পুরুষের তুলনায় অধিকতর সুদক্ষ। কারণ, তার আগ্রহ এতটা তীব্র নয় যে, তার বিচারবুদ্ধির চোখকে বন্ধ করে দেবে।"'

উইল ডুর‍্যান্ট-এর কথা শুনে রকিফ ভাই আর কিছু বললেন না। ফারিস আবার বলল, 'সেদিন বাংলাদেশের মনোবিজ্ঞানীদের একটি জার্নাল পড়লাম। সেখানে তারা বলেছেন, নারী-পুরুষের চিন্তার জগৎ আলাদা। আলাদা বলেই স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রেও তাদের পার্থক্য ঘটে। স্বপ্নে পুরুষরা নারীদের তুলনায় আগ্রাসী বিষয় বেশি দেখে। আবার নারীরা পুরুষের চেয়ে দীর্ঘ স্বপ্ন দেখে। পুরুষেরা ৭০% স্বপ্ন দেখে অন্য পুরুষদের নিয়ে। আর নারীরা স্বপ্ন দেখে সমানসংখ্যক পুরুষ ও নারীকে নিয়ে।'

'তুই কি *মনকথা* জার্নালের কথা কইতাছস?'

'জি ভাই।'

'পাগলদের কথা বাদ দে। মনোবিজ্ঞানীরা পাগল। তাগোর কথার দাম নাই।'

রফিক ভাইয়ের কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছিল। ফারিস মুচকি হেসে বলল, 'আচ্ছা ভাই। বাদ দিলাম। যুক্তরাজ্যের একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন, নাম ক্যাথরিন ডাল্টন। আপনি কি তাঁকে চেনেন?'

'আমি কি ডাক্তারি পড়ি? আমি ক্যামনে চিনমু?'

'আচ্ছা, না চিনলে সমস্যা নেই। আমি আপনাকে উনার একটা গবেষণার কথা

শুনাই। ক্যাথরিন ডাল্টন ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতালে, হোস্টেলে, এবং জেলখানায় ঋতুস্রাবের ওপর গবেষণা করেন। সে গবেষণার ওপর ভিত্তি করে, ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। সে প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, ঋতুস্রাবের সময়ে নারীদের শারীরিক সুস্থতা কমে যায়। এ সময় উদাসীনতা, অমনোযোগিতা ও কাজে অলসতা দেখা দেয়। যেসব মেয়ে অপরাধপ্রবণ, তাদের অপরাধপ্রবণতা আরও বেড়ে যায়।

তিনি ক্লাস মনিটরকারী এগারো জন নারীর ওপর একটি গবেষণা চালান। এই এগারো জনের কাজ ছিল অপরাধের শাস্তি দেওয়া। তিনি লক্ষ করেন, এই এগারো জন ঋতুস্রাবের সময় বেশি শাস্তি দিয়ে থাকে। এসব পর্যবেক্ষণ করার পর ডাক্তার ডাল্টন একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করেন। যে প্রশ্নটা শুনলে আপনি হয়তো অবাক হয়ে যাবেন।'

'তাই নাকি? ক দেহি, আমি অবাক হই কি না।'

'ডাক্তার ডাল্টন বলেন, "যদি ঋতুস্রাবের সময় সকল মহিলাদের এ ধরনের প্রতিক্রিয়া সত্যি হয়, তাহলে মেয়েদের শিক্ষিকা, ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রশাসকের পদে নিযুক্তি কতটুকু যুক্তিসংগত?"'

ক্যাথরিন ডাল্টনের বক্তব্য শোনার পর, রফিক ভাই জবুথবু হয়ে গেলেন। কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেললেন। মনোবিজ্ঞানীদের না হয় পাগল বলে চালিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এবার কী করবেন? ডাক্তারকে তো আর পাগল বলার সুযোগ নেই। ফারিস বলল, 'ভাই, আপনারা দাবি করেন—পাশ্চাত্যের দেশগুলো নারী-পুরুষকে সমান মনে করে। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টোটা দেখা যায়।'

রফিক ভাই জবাব দিলেন, 'তোর এমনডা মনে হইল ক্যান?'

'না মনে করার কী আছে? পাশ্চাত্যের কোনও দেশেই কি উঁচু উঁচু দালান নির্মাণ, পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি, কিংবা বড় বড় সেতু-নির্মাণের কাজে মেয়েদের ব্যবহার করা হয়? কখনোই হয় না। একটু লক্ষ করলেই দেখবেন, পাশ্চাত্যের জারজ সন্তানরা যেসব চাইল্ড হোমে বড় হয়, সেখানে বেশির ভাগ সেবিকাই থাকে নারী। পুরুষের ব্যবহার একেবারেই সামান্য। যদি নারী পুরুষকে সত্যিই সমান করা হতো, তাহলে কি এ অবস্থা হতো? তারা মুখে যতই সমান অধিকারের কথা বলুক না কেন, বাস্তবে তা এখানো প্রয়োগ করতে পারেনি।'

রফিক ভাই কিছু বললেন না। চুপ রইলেন। রফিক ভাইয়ের নিস্তব্ধতা ফারিসকে আরও কিছু বলার সুযোগ করে দিলো। ফারিস বলল, 'ইসলাম মনে করে নারী-পুরুষ

মানবজাতিরই দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজ কিংবা সভ্যতানির্মাণে, উভয়ের অংশগ্রহণ দরকার। তাই নারীকে তার যোগ্যতা অনুসারে উন্নত হতে, ইসলাম কখনও বাধা দেয় না। উৎসাহিত করে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করে।'

ফারিসের কথা শুনে রফিক ভাই এবার নড়েচড়ে বসলেন। অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'অর্থনৈতিক অধিকার! অর্থনৈতিক অধিকার! এই অধিকারডা কেবল লোক দেহানো। এইডা দেওয়া না-দেওয়া সমান।'

'কেন ভাই?'

'তোদের ইসলাম মাইয়্যাগো দেয় পুরুষদের থেইকা অর্ধেক। এইডা কি অভিনয় ছাড়া আর কিছু? যদি সমান-সমান দিত, তাইলে না বুঝতাম ঠিক আছে।'

'সম্পত্তিতে সমান পেলেই অধিকার নিশ্চিত হয়ে গেল? আর কিছুর দরকার নেই?'

'আছে, থাকব না ক্যা? তবে সম্পত্তির অধিকার আগে।'

'ইসলাম পুরুষকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে দ্বিগুণ অধিকার দিয়েছে। কিন্তু কেন দিয়েছে, তা কি জানেন?'

'ক্যান আবার? ইসলাম ঠকবাজ ধর্ম। দিছে নারীদের ঠকাবার লাইগ্যা।'

'প্লিজ ভাই, একটু বুঝার চেষ্টা করুন। এভাবে অযথা বিরোধিতা করবেন না। ইসলাম পুরুষকে যতটা না সম্পত্তি দিয়েছে, তার থেকে বেশি দায়িত্ব দিয়েছে। পরিবারের ভরণপোষণ করা পুরুষের জন্যে আবশ্যক করেছে। একজন নারী যখন কন্যা, তখন তার সমস্ত দায়িত্ব পিতার ওপর। একজন নারী যখন স্ত্রী, তখন তার সব দায়িত্ব স্বামীর ওপর। একজন নারী যখন মা, তখন তার সব দায়িত্ব পুত্রের ওপর।'

'তাতে কী অইছে?'

'বলছি। ধরুন, আপনারা দু ভাই-বোন। আপনার পিতা তিন লাখ টাকা রেখে মারা গেলেন। ইসলামী বিধান অনুসারে আপনি পাবেন দু-লক্ষ টাকা, আপনার বোন পাবে এক লক্ষ টাকা। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব আপনার। বোনের নয়। পরিবারের সব খরচ আপনাকেই বহন করতে হবে, আপনার বোনকে নয়। বোনের বিয়েতে আপনাকেই খরচ করতে হবে। মাকে দেখাশুনা করতে হবে। আবার নিজের বিয়ের খরচের কথাও মাথায় রাখতে হবে। এখন বলুন তো, এত দায়িত্ব পালন করার পর আপনার কাছে কত টাকা থাকবে? আর আপনার বোনের কাছে কত থাকবে?'

'আমার কাছে তো কোনও টেহাই থাকব না। চাকরি না থাকলে আরও কয়েক লক্ষ

টেহা ধার করন লাগব।'

'আল্টিমেটলি কে লাভবান হচ্ছে?'

'আমার বৈন।'

'তাহলে তো ইসলামের বণ্টননীতি নিয়ে আপনার সমস্যা থাকার কথা নয়।'

ইসলামের সুষম বণ্টননীতির ব্যাখ্যা শুনে রফিক ভাইয়ের মুখটা যেন কালো হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও কালো মুখটা তিনি আড়াল করতে পারলেন না।

ফারিস আবার বলল, 'ইসলাম নারীকে কখনোই ঠকায়নি। নারীকে মর্যাদা দিয়েছে। নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্যের বাইরে কোনও দায়িত্ব প্রদান করেনি। স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য নারী ও পুরুষের এক নয়, ভিন্ন। নারীরা গর্ভে সন্তান ধারণ করে। সন্তানের জন্যে মায়ের স্তনেই দুধ আসে। এই দুধের মধ্যে এমন কিছু পুষ্টি-উপাদান থাকে, যা দুনিয়ার আর কোনও দুধের মধ্যে নেই। বাচ্চার বেড়ে ওঠার জন্যে, মানসিক বিকাশের জন্যে এই শালদুধ একান্ত জরুরি।

বাচ্চার জন্যে মায়ের অন্তরে বাবার চাইতেও অনেক বেশি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এই ভালোবাসা কৃত্রিমভাবে অন্তরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না। একজন মা সৃষ্টিগতভাবেই তা অর্জন করেন। তাহলে আগত সন্তানের প্রতি মাতার ভূমিকা যা হবে, পিতার ভূমিকা অবশ্যই তার ব্যতিক্রম হবে। কেউ যদি দুজনকে সমান করতে চায়, সেটা কি বোকামো নয়? দুজনকে দুজনের অবস্থান থেকে সমান করাটাই যৌক্তিক।'

রফিক ভাই বললেন, 'তার মানে তোর কথা এইডাই, নারী-পুরুষ সব জায়গায় সমান না। তাইতো?'

ফারিস বলল, 'রফিক ভাই। আসল কথা কী জানেন? ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মিলেই এ মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে। আপনি যদি জমিতে লাঙল চালাতে চান, তাহলে অবশ্যই জমিকে লাঙলের চেয়ে নমনীয় হতে হবে। নয়তো ফসল ফলানো সম্ভব হবে না। ক্ষুদ্র একটি রাসায়নিক যৌগও যদি গঠন করতে চান, তাহলে সেখানেও কাউকে দাতা হতে হবে, কাউকে গ্রহীতা। কেউ ইলেকট্রন দান করে পজেটিভ আয়ন হবে, কেউ সে ইলেকট্রন গ্রহণ করে নেগেটিভ আয়ন হবে। তারপর দুটো আয়ন মিলে একটি স্থিতিশীল যৌগ গঠন করবে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছাড়া এ মহাবিশ্ব অচল।

কাউকে না-কাউকে অবশ্যই ক্রিয়া করার যোগ্যতা থাকতে হবে। কাউকে সে প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে হবে। এটাই স্রষ্টার নিয়ম। আপনাদের ভাষায়—প্রকৃতির নিয়ম। কখনো নারী ক্রিয়া করবে, আর পুরুষ সে ক্রিয়া গ্রহণ করবে। আবার কখনো পুরুষ ক্রিয়া করবে, আর নারী সে ক্রিয়া গ্রহণ করবে। এভাবেই মহাবিশ্ব টিকে থাকবে।

দুজনকে সব সময় সমান করতে যাওয়াটা বুদ্ধিমানে কাজ নয়। আপনাদের ভাষায়, প্রকৃতিই নারী-পুরুষকে আলাদা আলাদা চিন্তা-চেতনা ও স্বভাব-চরিত্র দান করেছে। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে নিজ হাতে নিজেকে শেষ করে ফেলা।'

রফিক ভাইয়ের মতো যারা নারী-অধিকার কর্মী, তারাও কিন্তু নারী-পুরুষের পার্থক্য স্বীকার করে। ভার্সিটিতে যখন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়, তখন নারী-পুরুষ আলাদাভাবে খেলায় অংশ নেয়। নারী-পুরুষের আলাদা আলাদা টিম থাকে। নারীদের ফুটবল টিমে পুরুষরা আর পুরুষদের টিমে নারীরা অংশ নেয় না। এমনকি নারী ফুটবল টিমের সাথে পুরুষ ফুটবল টিমের প্রতিযোগিতাও হয় না কখনো।

যদি নারী পুরুষ সব ক্ষেত্রে সমানই হবে, তাহলে তাদের জন্যে আলাদা আলাদা টিম করার মানে কী? তাদের এক করে টিম বানানোর দরকার। প্রত্যেকটা ভার্সিটিতে এমনটা করা দরকার। অন্তত আমাদের ভার্সিটিতে তো অবশ্যই। যে ভার্সিটিতে রফিক ভাইয়ের মতো লোক আছে, সে ভার্সিটিতে এত বড় বিভাজন কীভাবে মেনে নেওয়া যায়? মনে মনে ভাবছিলাম এ প্রস্তাবটা রফিক ভাইকে দেওয়া যায় কি না।

আমি কিছু বলার আগেই একটা মজার ঘটনা ঘটল। আমারা যেখানে বসে ছিলাম, তার থেকে পাঁচ গজ দূর থেকে কোনও এক মেয়ের চিৎকার শোনা গেল। আমি ভাবলাম কী না কী হয়েছে। হয়তো ভয়ংকর কিছু। নয়তো এত জোরে চিৎকার দেওয়ার কথা না। কিন্তু পরে জানা গেল তেলাপোকা দেখে মেয়েটি ভয়ে চিৎকার দিয়েছে।

এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত জোরে চিৎকার করায় রফিক ভাই পর্যন্ত রেগে গেলেন। তিনি বললেন, 'নাহ! মাইয়াগো নিয়া আর পারা যায় না। এইসব ছোট খাড বিষয় লইয়া কেউ অত জোরে চিক্কুর মারে? সব মাইয়্যারা এক একটা ভীতুর ডিম। তেলাপোকা কি বাঘ, যে ঘাড় মটকাইয়্যা দিব? কী সব আউল ফাউল কারবার।'

রফিক ভাইয়ের কথা শুনে ফারিস বলল, 'মেয়েরা কি ছেলেদের থেকে ভীতু হয়?'

'অইবো না ক্যান? দেখলি না, সামান্য তেলাপোকা দেইখ্যাই কেমন বিগড়াইয়্যা গেল? পোলারা অইলে কি এমনডা করত?'

রফিক ভাইয়ের উত্তর শুনে ফারিস আমার দিকে তাকাল। আমি মনে মনে ভাবলাম, যে লোক এতক্ষণ ছেলে মেয়ে সমান বলে তর্ক করতে লাগল, সে-ই কি না মেয়েদের ভীতু হিসেবে উল্লেখ করল? স্বপ্ন দেখছি না তো?

আমি কিছু বলতে যাব এমন সময় রফিক ভাই বললেন, 'অহহো। জরুরি একটা কাজ আছে রে। ভুইলাই গেছিলাম। আজ যাই। আরেকদিন কথা অইব। ভালো থাক তোরা।'

কফির বিল দিয়ে তিনি দ্রুত প্রস্থান করলেন। রফিক ভাইয়ের দ্রুত চলে যাওয়ার দৃশ্যটা সেদিন বেশ উপভোগ করেছিলাম। বেচারা একবারও পেছন ফিরে তাকাননি। আসলে সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যা অনুমান আর কতক্ষণই-বা টিকতে পারে? মহান আল্লাহ্ সত্য বলেছেন, "তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে, সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোনও মূল্য নেই।"[৪৬]

তথ্যসূত্র :

♦ ১) সূরা আন-নাজম, (৫৩) : ২৮ আয়াত।

♦ ২) সূরা মুলক, (৬৭) : ১৫ আয়াত।

♦ ৩) সূরা হুজুরাত, (৪৯) : ১৩ আয়াত।

♦ ৪) বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আস-সহীহ,* হাদীস নং : ৫৫৪৬; (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, একাদশ সংস্করণ, ২০১৩)।

♦ ৫) বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আল-আদাবুল মুফরাদ,* হাদীস নং : ৩, ৫, ৬; (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৮)

♦ ৬) নাবাবী, মুহিউদ্দীন ইয়াহহিয়া ইবনু আশরাফ, *রিয়াদুস সালিহীন,* ১/২৭২; (হোসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, বংশাল, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, মে ২০১১ ইং)। হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

♦ ৭) নাবাবী, *রিয়াদুস সালিহীন,* ১/২৮৩, হাদীসটি ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন : হাসান সহীহ।

♦ ৮) আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, *আদাবুয যিফাফ,* পৃষ্ঠা : ১৫৮; (তাওহীদ পাবলিকেশন, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা)

♦ ৯) ড. মুহাম্মাদ আল আরেফী, *ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে,* পৃষ্ঠা : ৩০; (হুদহুদ পাবলিকেশন, বাংলাবাজার, ঢাকা, নভেম্বর, ২০১৫)

♦ ১০) *মনকথা,* দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রকাশকাল : ২০১৪।

♦ ১১) *Scientific Indications in the Holy Quran,* Written by bord of researchers; (Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka. 3rd eddition, 2012).

♦ ১২) William F. Gangong, *Medical Physiology,* (Mc Graw Hil, New York, 21th ed.).

♦ ১৩) CV Rao, *A Text Book of Immunology,* (Narosa Publishing House, New Delhi, 4th ed.).

♦ ১৪) Will Durant, *The pleasures of philosophy;* (Simon and Schuster, New York, 1953).

♦ ১৫) Ogden et al (2004). Mean Body Weight, Height, and Body Mass

[৪৬] সূরা আন-নাজম, (৫৩) : ২৮ আয়াত।

Index, United States 2002–1960 Advance Data from Vital and Health Statistics, Number 347, October 2004 ,27. http://www.cdc.gov/nchs/data/ad/ad347.pdf, Bren, Linda (July–August 2005).

♦ ১৬) "Does Sex Make a Difference?" FDA Consumer magazine. Archived from the original on March 2009 ,26,

♦ ১৭) https://web.archive.org/web/20090326023753/http://www.fda.gov/fdac/features/405/2005_sex.html

♦ ১৮) https://www.psychologytoday.com/blog/hide-and-seek/2012 07/the-battle-the-sexes

♦ ১৯) http://findarticles.com/p/articles/mi_g2699/is_0006/ai_269 9000616

♦ ২০) https://www.reference.com/science/males-physically-strong er-females-c2792a#4225417356full-answer

♦ ২১) https://www.quora.com/Are-men-generally-physically-stron ger-than-women

♦ ২২) https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/commen ts/4vcxd0/almost_all_men_are_stronger_than_almost_all_women/ ,

♦ ২৩) http://www.unz.com/gnxp/men-are-stronger-than-women-on-average/

কুম্ভিলেক ও দণ্ডিত অপুরুষ

[এক]

শাহেদ ভাই যে এমন একটা কাজ করবেন, আমি কল্পনাও করিনি। যিনি মানুষকে সততার উপদেশ দিয়ে বেড়ান, তিনি কিনা শেষমেষ চুরি করবেন! নিজেকে কোনওভাবেই বোঝাতে পারছিলাম না। মনে মনে ভাবছিলাম হয়তো কোথাও ভুল হচ্ছে। শেষমেষ খোঁজ করে জানলাম, কথা সত্যি। তিনি সত্যিই চুরি করেছেন। অবশ্যি এই চুরি সেই চুরি নয়। তিনি টাকাও চুরি করেননি, মোবাইলও চুরি করেননি; করেছেন অন্য কিছু। নিজের থিসিস পেপার নিজে না করে, অন্যের থেকে কপি পেস্ট করেছেন। অর্ধেকটা না—পুরোটা। একেবারে শুরু থেকে শেষটা। শুধু শিরোনামগুলোতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন এনেছেন। তাও আবার ভাবগত না—আক্ষরিক। কেবল ফন্ট স্টাইল পরিবর্তন করেছেন। যেদিন থিসিস পেপার জমা দিতে যাবেন, সেদিনও আমার সাথে দেখা। তাঁকে বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। আজ বাদে কাল চাকরিতে যোগ দেবেন, এই ভেবেই হয়তো খুশি ছিলেন। সে সৌভাগ্য তাঁর হলো না।

তিনি যে স্যারের অধীনে মাস্টার্স করছিলেন, তিনি অতিশয় জ্ঞানী ব্যক্তি। আমাদের ভার্সিটির মেধাবী স্যারদের একজন। পিএইচডি করেছেন অনেক আগে। এখন পোস্ট ডক্টরেট করছেন। স্যারের অধীনে যত ছাত্র স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছে, সবার থিসিস পেপার তাঁর মুখস্থ। তাই স্যারকে ফাঁকি দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। অবশ্যি শাহেদ ভাই এই প্রথম নন, এর আগেও দুজন কপি পেস্ট করে ধরা খেয়েছে। স্যার তাদের ডিগ্রি আটকে দিয়েছিলেন। ছাত্রত্ব বাতিল করার হুমকিও দিয়েছিলেন। শাহেদ ভাইয়ের যে কী হয়, আল্লাহ মালুম।

[দুই]

শাহেদ ভাই যখন স্নাতক চতুর্থ বর্ষে, সে সময়ের কথা। অ্যাসাইনমেন্ট তৈরির জন্যে আমরা কজন লাইব্রেরিতে বসা। ব্যাকটেরিওলজির অ্যাসাইনমেন্ট। ম্যাস্টাইটিস রোগ কী কী ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়, তাদের বৈশিষ্ট্য কী কী, ল্যাবে কীভাবে এই রোগ ডায়াগনোসিস করা যায়, অ্যাসাইনমেন্টটা এ নিয়ে ছিল। আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট যখন

অর্ধেক তখন শাহেদ ভাই এলেন। প্রতিদিন যে কর্নারে বসেন, সেখানে বসে গেলেন। আমরা আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে চলে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তিনি অপুকে ডাক দিলেন। অপু আমাদের গ্রুপ মেম্বারদের একজন। ডাক শুনে সে শাহেদ ভাইয়ের কাছে গেল। তারপর এসে জানালো শাহেদ ভাই আমাদের ডেকেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্ররা সিনিয়র ভাইদের একটু বেশিই ভয় করে। অবশ্যি তারও কিছু কারণ আছে। সে কারণ না হয় অন্যদিন বলব। শাহেদ ভাইয়ের ডাক শুনে আমরা তাঁর কাছে গেলাম। আমাদের কাছে পেয়ে তিনি খুশি হলেন বলেই মনে হলো।

'আয় আয়, বোস।', শাহেদ ভাই আমাদের লক্ষ্য করে বললেন।

আমরা ছিলাম চার জন। আমি, ফারিস, মামুন, অপু। আমাদের মধ্যে অপু আবার শাহেদ ভাইয়ের খুব ভক্ত। শাহেদ ভাই যে হলের 'হল সেক্রেটারি', অপুও সে হলেই থাকে। অপুর সাথে তাঁর সখ্য বেশি। অপু তাঁর ভক্তও বটে। অপুর মুখে শাহেদ ভাইয়ের গুণকীর্তন এর আগেও শুনেছি। আজ তাঁকে দেখলাম। অপু আমাদের ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

আমাদের পরিচয় শুনে তিনি বললেন, 'অহ! তোরা তাহলে সব সাইন্স ফ্যাকাল্টির ছাত্র।'

অপুর মুখে শুনলাম, শাহেদ ভাই চারুকলার ছাত্র। শাহেদ ভাইকে দেখে আমারও ঠিক তেমনি মনে হয়েছিল। চুলগুলো এত লম্বা যে, তা থোরাসিক ভার্টেব্রা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। গোঁফ তো মনে হয় কোনও দিনও কাটেননি। কাটলে কি আর তা গাল থেকেও লম্বাটে আকার ধারণ করত? নখ কাটেননি মনে হয় বছর খানেক হলো। দেখেই কেমন ঘেন্না লাগছিল। আমাদের কাছে পেয়ে তিনি বললেন, 'বই-টই পড়ার অভ্যাস আছে তোদের?'

আমরা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। এরপর শাহেদ ভাই বললেন, 'তাহলে তো ভালোই হলো। আজ তোদের এক বিখ্যাত লেখকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। যার লেখা পড়লেই তোরা চমকে যাবি।'

আমি মনে মনে ভাবলাম, এই সেরেছে! চারুকলার ছাত্রের প্রিয় বই! কী না কী অপাচ্য নিয়ে আসেন, কে জানে? চুপচাপ থাকা ছাড়া উপায় নেই। তাই চুপ রইলাম। কিছু কিছু জায়গায় চুপ থাকাই মঙ্গল।

শাহেদ ভাই শেলফ থেকে দুটো বই নামিয়ে আমাদের সামনে রাখলেন। তবে বইগুলো উল্টো করে রাখলেন। বই দুটো হলেও লেখক একজনই। শাহেদ ভাই প্রথমে

লেখক সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন। আসলে বর্ণনা বললে ভুল হবে, তিনি লেখককে নিয়ে ছোটখাটো একটা ভাষণ দিলেন। এরপর বই দুটো আমাদের সামনে মেলে ধরলেন। দুটো বইয়ের একটি হলো *বাক্যতত্ত্ব*, আরেকটি *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।* লেখক হুমায়ুন আজাদ। বাংলার বিশিষ্ট নাস্তিক। শাহেদ ভাই যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশে এই লেখকের থেকে বড় কোনও লেখকের জন্ম হয়নি।

শাহেদ ভাই প্রথমে আমাদের সামনে *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* বইটি নিয়ে কথা বললেন। অনেকক্ষণ ধরে বইটির প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, 'জানিস তোরা! ভাষাবিজ্ঞানের ওপর লিখিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই এটি। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে এই বইটার মতো বই আর দ্বিতীয়টি নেই।'

ফারিস এতক্ষণ চুপ ছিল। শাহেদ ভাইয়ের মুখে বইটির প্রশংসা শুনে বলল, 'ভাই, একটা কথা বলি?'

'কী? বল।'

'বাংলা ভাষায় এটিই যে ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম বই, এ কথা আপনি লেখকের ভূমিকা থেকে জেনেছেন, তাই না?'

'হুঁ।'

'আপনি কি লেখকের কথা মেনে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, নিয়েছি। মানব না কেন? সমস্যা কোথায়?'

'এটি কখনোই ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই নয়।'

ফারিস এই পর্যন্ত বলতেই পাশ থেকে অপু তাকে ইশারায় থামতে বলল। অপু শাহেদ ভাইকে ভয় করে। অবশ্যি শুধু অপুই নয়, সবাই করে। শাহেদ ভাই রগচটা মানুষ। অল্পতেই তাঁর রাগ উঠে যায়। আর প্রথম বর্ষের একজন ছাত্র চতুর্থ বর্ষের ছাত্রের কথার প্রতিবাদ করবে, তা কী করে হয়? তাই অপু ফারিসকে ইশারা দিলো।

ফারিসের কথা শুনে শাহেদ ভাই সত্যিই খেপে গেলেন। গলার স্বর কিছুটা মোটা করে বললেন, 'যা বলছিস বুঝেশুনে বলছিস তো? নাকি আবোল-তাবোল বকছিস?'

'না ভাই, আবোল-তাবোল বলব কেন? বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্বের ওপর তাঁর আগে এবং তাঁর সমসাময়িক যুগে—ওপার বাংলায় অনেক বই লেখা হয়েছে।'

'তুই কি রফিকুল ইসলামের *ভাষাতত্ত্ব*, আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদের *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, সুকুমার সেনের *ভাষার ইতিবৃত্ত*, এসব বইয়ের কথা বলছিস?'

'জি ভাই। আমি এগুলোর কথাই বলছি। এসব বইও তো ভাষাতত্ত্বেরই বই। তাহলে

আজাদ সাহেবের বইটি কীভাবে ভাষাতত্ত্বের প্রথম বই হতে পারে?'

'প্রথম বই না হলেও, পূর্ণাঙ্গ বইগুলোর একটি। এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই।'

'জি ভাই। তবে তাঁর বইটা ভাষাতত্ত্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই না হলেও, চন্দ্ররেণুবৃত্তিতে[৪৭] বইটা অবশ্যই প্রথম।'

এমনিতেই শাহেদ ভাই ফারিসের ওপর রেগে আছেন। আবার এই ধরনের কথা শুনে রাগের মাত্রাটা আরও বেড়ে গেল। রাগকে কিছুটা দমন করে বললেন, 'কি উল্টোপাল্টা বকছিস? তোর কথার কোনও প্রমাণ আছে?'

শাহেদ ভাইয়ের মুখ দেখে আমরা ভীত হয়ে গেলাম। কিন্তু ফারিস আগের মতোই ছিল। একটুও ভয় পায়নি। বেশ শান্ত গলায় শাহেদ ভাইয়ের প্রশ্নের জবাব দিলো, 'অবশ্যই আছে।'

'বের কর তোর প্রমাণ। বের করে আমাকে দেখা। প্রমাণ করতে না পারলে কিন্তু তোর খবর আছে!' শাহেদ ভাই বললেন।

ফারিস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মিনিট ছয়েক পর দুটি বই হাতে করে ফিরে এল। এসে বলল, 'শাহেদ ভাই, আপনি যে বই দুটো দেখালেন, সেগুলো লেখকের নিজের লেখা বই নয়, বিভিন্ন বইয়ের অনুবাদমাত্র।'

শাহেদ ভাই বললেন, 'আগে তো প্রমাণ কর! তারপর না হয় দেখা যাবে।'

ফারিস বলল, 'আপনি *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* বইটির অবতরণিকাটি একটু বের করেন তো।'

শাহেদ ভাই বইটির অবতরণিকা বের করলে ফারিস বলল, 'আজাদ সাহেব অবতরণিকায় প্রথাগত ব্যাকরণ, তুলনামূলক কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদির আলোচনা শেষে একটি চিত্র দিয়েছেন। চিত্রটা পেয়েছেন কি?'

'হুঁ।'

'এই চিত্রটি তিনি Jacobsen-এর *Transformational Generative Grammar* বই থেকে নিয়েছেন।'

'ঠিক বলছিস তো?'

'এই দেখুন!'

[৪৭] শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত। অন্যের রচনার ভাব বা ভাষা নিজের নামে চালানোকে চন্দ্ররেণুবৃত্তি বলা হয়। ইংরেজিতে যাকে বলে 'Plagiarismism' যিনি এ কাজ করে তাকে কুম্ভিলক (Plagiarist) বলা হয়ে। (বাংলা একাডেমি, *আধুনিক বাংলা অভিধান*, পৃ : ৪৪৫)।

ফারিস Jacobsen-এর বইটির ৬১ পৃষ্ঠা বের করে দেখালো। সত্যিই তো! Jacobsen-এর বইয়ের সাথে আজাদের বইয়ের চিত্রের কী অপরূপ মিল! অথচ তিনি কোথাও এর সূত্র উল্লেখ করেননি। কী আশ্চর্য বিষয়!

ফারিস আবার বলল, 'এ বইতে তিনি বিভিন্ন প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি কারণে ভাষার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনা করতে গিয়ে মোট ছ-টি চিত্র ব্যবহার করেছেন। মজার ব্যাপার হলো, এই চিত্রগুলো *Introduction to Historical Linguistics* বইটা থেকে ধার করেছেন। বইটা লিখেছেন মার্কিন লেখক অ্যান্থনি আরলোট্টো। আরলোট্টোর বইতে ঠিক একই আলোচনার ক্ষেত্রে এই ছ-টি চিত্রই দেওয়া হয়েছে। হুমায়ুন আজাদ সামান্য অদল-বদল করেছেন—চারটি চিত্রকে। বাকি দুটো হুবহু এক। একেবারে আরলোট্টোর বইতে যেমন আছে, ঠিক তেমন।'

'কই কই দেখি?'

ফারিস আরলোট্টোর বইটি বের করে দেখালো। বইটি দেখার পর শাহেদ ভাই বললেন, 'মিল আছে তাতে কী হয়েছে? এত বড় বই লেখার ক্ষেত্রে তিনি অন্য বইয়ের সাহায্য নিতেই পারেন? এতে দোষের কী আছে?'

'অন্য বইয়ের সাহায্য নিলে তার তথ্যসূত্র নির্দেশ করা কি অ্যাকাডেমিক শিষ্টাচার নয়?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'হুমায়ুন আজাদ তো এই শিষ্টাচার বজায় রাখতে পারেননি।'

'মানে?'

'তিনি যে বই থেকে চিত্রগুলো নিয়েছেন, সেটার তথ্যসূত্র উল্লেখ করেননি।'

'সত্যিই উল্লেখ করেননি?'

'বইটা তো আপনার হাতেই, একটু খুঁজে দেখুন না!'

শাহেদ ভাই বইটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন। কোথাও এর তথ্যসূত্র পেলেন না। লেখক কোথাও বলেননি যে, এই চিত্রটি আরলোট্টোর বই থেকে নেওয়া। তথসূত্র না পেয়ে ভাই কিছুটা মর্মাহত হলেন। আর হবেনই-বা না কেন? যাকে তিনি সবচেয়ে বড় ভাষাবিদ মনে করেন; তিনিই কি না চুরি করে বই লিখবেন, তা কী করে হয়? এত বড় (!) ভাষাবিজ্ঞানী কুম্ভিলক হয়ে যাবেন, এটা কি মেনে নেওয়া যায়? যায় না। তাই তথ্যসূত্র খুঁজে পাওয়া যাক বা না যাক, সে পরে দেখা যাবে। আগে তো ফারিসকে

হারানো যাক।

শাহেদ ভাই বলে উঠলেন, 'এগুলো তো সিম্পল ব্যাপার। হইচই করার কিছু নেই। হয়তো সূত্র উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। মানুষ মাত্রই ভুল। আমরাও তো অনেক কিছু ভুলে যাই।'

ফারিস বলল, 'আপনার কথায় যুক্তি আছে। তবে কথাটা কেবল তখনই মেনে নেওয়া যেত, যদি এটাই তাঁর একমাত্র ভুল হতো।'

'হা হা হা। সাইন্সে পড়ে ভাষাবিজ্ঞানী হয়ে গেলি মনে হয়? বল শুনি, আর কোথায় কোথায় ভুল আছে।'

'রাগ করবে না ভাই। আমি মিথ্যা কিছু বলিনি। বানিয়েও বলিনি কিছু। প্রমাণ দিয়েই বলেছি। আপনাকে আরও একটি প্রমাণ দেখাচ্ছি। আপনি একটু ১৩ নম্বর পৃষ্ঠা খুলবেন?'

'দাঁড়া খুলছি।'

শাহেদ ভাই পৃষ্ঠাটি খোলার পর ফারিস একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, 'এখান থেকে একটু পড়ুন তো।'

শাহেদ ভাই পড়তে শুরু করলেন—"ব্যাপারটি বোঝানোর জন্যে একটি প্রকল্পিত উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করা যাক বিশেষ ভৌগোলিক এলাকার অধিবাসীরা 'ক' নামক ভাষাটি বলে। আর মনে করা যাক ওই ভাষা এলাকাটির দুদিকে আছে সমুদ্র, একদিকে পর্বতমালা, আরেকদিকে বড় নদী।..."

শাহেদ ভাই এই পর্যন্ত পড়তেই ফারিস তাকে থামিয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ ভাই। এখন আমি পড়ছি, আপনি শুনুন—"let us consider a hypothetical case. In a particular geographical area, we find the speakers of language A. Now the region inhabited by these people is bounded by the sea on two sides, by mountains on another side, and by a large river on the fourth side."

ফারিস এতটুকু পড়ার পর শাহেদ ভাই বললেন, 'তুই তো সেই লাইনগুলোর ইংরেজি অনুবাদ বলছিস। যেগুলো আমি মাত্র পড়ে শুনালাম।'

'না ভাই। আমি আরলোট্টোর বই থেকে পড়ছি।'

'কই? দেখি দেখি।'

ফারিস ভাইকে আরলোট্টোর বইটা দেখালো। ভাই বেশ ক-বার লাইনগুলো

মেলাতে লাগলেন। হয়তো তিনি নিজেই নিজেকে বোঝাতে পারছিলেন না। কিছুটা হতভম্ব হয়ে বললেন, 'আরে বাদ দে, এই সব দু-এক লাইন মিলতেই পারে। হুমায়ুন আজাদ অনেক বড় জ্ঞানী ছিলেন। জীবনে অনেক বই পড়েছেন। আরলোট্টোর বইটাও হয়তো তাঁর পড়া ছিল, তাই মিলে গেছে।'

শাহেদ ভাইয়ের কথা মেনে নিতে আমাদের আপত্তি থাকত না, যদি না তিনি আরলোট্টোর বইটার সূত্র দিয়ে লাইনগুলো লিখতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। লেখাগুলো নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। শাহেদ ভাই যতই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করুন না কেন, লাভ নেই। আর ফারিসও এত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র না।

ফারিস বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আপনার কথা মেনে নিলাম। আপনি একটু ১৩৩ পৃষ্ঠা থেকে পড়বেন?'

ফারিস ইশারা দিয়ে কোত্থেকে পড়তে হবে তা দেখিয়ে দিলো। শাহেদ ভাই পড়তে শুরু করলেন—"কুরিলোভিকস বৃষ্টি ও পয়ঃপ্রণালির সাথে তুলনা করেছেন সাদৃশ্যকে; কেউ জানে না কখন বৃষ্টি হবে, তবে হলে বৃষ্টিধারার স্রোত কোনদিকে বইবে তা বলতে পারে যে কেউ। যার পরিচয় রয়েছে শহরের পয়ঃপ্রণালির সাথে।"

শাহেদ ভাই এই পর্যন্ত পড়তেই ফারিস বলল, 'এখন আমি বলছি, আপনি শুনুন—"In a comparison with drainage system, Kurylowick claims that analogy is like rain. Nobody can tell when it's going to rain, but when it does anyone who knows the plan of the local drainpipes and gutters can tell the way the water is going to flow."'

ফারিসের কথা শেষ হলে শাহেদ ভাই কিছুটা নিচুস্বরে বললেন, 'এটাও কি আরলোট্টোর বই থেকে বলছিস?'

'হুঁ।'

'কই দেখি?'

ফারিস তাঁকে আরলোট্টোর বইটার ১৩৫-১৩৬ পৃষ্ঠা খুলে দেখালো। হুমায়ুন আজাদ এভাবে অন্যের বই থেকে হুবহু অনুবাদ করে নিজের নামে চালাবেন, তা শাহেদ ভাই হয়তো কল্পনাও করেননি। তবে আমার কাছে ব্যাপারটা তেমন বিস্ময়কর মনে হয়নি। নাস্তিকদের প্রধান অস্ত্রই মিথ্যে। মিথ্যে দিয়েই তারা বিশ্বাসের দেয়াল ভেঙে দিতে চায়। হুমায়ুন আজাদ এর ব্যতিক্রম হবেন কেন?

শাহেদ ভাই যখন বইয়ের লাইনগুলোর দিকে নজর দিচ্ছিলেন, তখন ফারিস

আবার উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর আরেকটি বই হাতে ফিরে এল। এসে বলল, 'ভাই, আমি এ বইটা থেকে দু-লাইন অনুবাদ করছি, আপনি একটু মিলান। ২৪ পৃষ্ঠা থেকে।'

ফারিস Jankowsky-এর লেখা *The Neogrammarians* বইটা দেখে বলতে শুরু করল—"'লাইবনিৎসের মতো জোনসের কোনও দার্শনিক অভিলাষ ছিল না; তবে তাঁরা দুজনেই বিশুদ্ধ মানবিক লক্ষ্য থেকে ভাষাবর্ণনায় উৎসাহী হয়েছিলেন।" ভাই দেখুন তো লাইনটার সাথে মিলেছে কি না?'

শাহেদ ভাই কোনও জবাব দিলেন না। কেবল বইটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি উঁকি মেরে সে লাইনটা দেখতে লাগলাম। Jankowsky-এর বইটায় ইংরেজিতে ঠিক তা-ই লেখা আছে, যা হুমায়ুন আজাদ নিজের নামে চালিয়েছেন। সেখানে স্পষ্ট লেখা আছে—"In contrast to Leibnitz, Sir William Jones hardly possessed philosophical ambitions. There is, however a striking similarity between the two scholars as to the motives of their dealings with language. They both approach language for purely humanistic objectives."

শাহেদ ভাইয়ের রাগান্বিত চেহারাটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না। বেশ শান্ত হয়ে বসে আছেন। মনে মনে কী যেন চিন্তা-ফিকির করছেন। খানিক সময় পর তিনি বলে উঠলেন, 'এই বইটার আলোচনা আমরা বাদ দিই। আমরা তাঁর অন্য বইটা নিয়ে কথা বলি।'

'কোনটা, *বাক্যতত্ত্ব?'* ফারিস জিজ্ঞাসা করল।

'হুঁ। এই বইটা তাঁর অনন্য কীর্তি। তিনি যে কতটা জ্ঞানী ছিলেন, এ বইটা থেকেই অনুমান করা যায়।'

'আমি আপনার সাথে একটু দ্বিমত করছি ভাই।'

'কেন?'

অপুর পাশে বসা মামুন এতক্ষণ চুপ ছিল। ফারিসের কথা শুনেই আগ্রহভরে বলল, 'এ বইটাও কি তিনি নকল করে লিখেছেন?'

'হুঁ।' ফারিস জবাব দিলো।

মামুন জিজ্ঞেস করল, 'এটা আবার কোন বইয়ের অনুবাদ?'

'এটি Jacobsen-এর *Transformational Generative Grammar* বইটা থেকে কপি করা।'

'হুবহু কপি?'

'না, হুবহু না। এটা তিনি হুবহু কপি করেননি। হয়তো ধরা খেয়ে যাবেন, এ ভয়ে করেননি। তবে *বাক্যতত্ত্ব* বইয়ের তাত্ত্বিক আলোচনাগুলো Jacobsen-এর বই থেকে নেওয়া। মজার ব্যাপার হলো, এখানেও তিনি তথ্যসূত্র উল্লেখ করেননি। এমনকি Jacobsen-এর প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেননি।'

শাহেদ ভাইয়ের মনে হয় কোমর ধরেছে। তিনি হেলান দিয়ে বসলেন। হাতটা থুতনির কাছে নিয়ে পা দোলাতে লাগলেন। ফারিসকে কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না। অবশ্যি বলার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাই বলতে পারছেন না। ফারিসকে ধমকও দিতে পারছেন না। চুপ করে আছেন।

ফারিস জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই, আপনি কি হুমায়ুন সাহেবের *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* বইটা পড়েছেন?'

'অর্ধেকটা পড়েছি। কেন, কোনও সমস্যা?'

'অনেক বড় সমস্যা।'

'যেমন?'

'বইটা কিন্তু তাঁর নিজের লেখা না। এটি *The Dehumanization of Art* বইটা থেকে ভাবানুবাদ করা।'

'জানি। তিনি তো অবতরণিকায় বিষয়টা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বইটার পিডিএফ আছে আমার কাছে। একটু দাঁড়া, বের করে নিই।'

শাহেদ ভাই পিডিএফ বের করে বললেন, 'এই দেখ, তিনি লিখেছেন—"খুব ভালো হতো যদি এ-দীর্ঘ রচনাটির একটি বিশ্বস্ত অনুবাদ প্রকাশ করা যেত, কিন্তু সে-উদ্যমের বিশেষ অভাব আমার। তাই এখানে আমি অর্তেগার বক্তব্য-ব্যাখ্যার সারাংশ লিপিবদ্ধ ক'রেই তৃপ্তি পেতে চাই। এ-সারাংশও হবে আমার রুচি-অনুসারী, হয়তো অর্তেগার ব্যক্তিগতভাবে প্রিয় অনেক অংশ বাদ প'ড়ে যাবে, এবং কোথাও কোথাও প্রবল হয়ে উঠবে আমার নিজেরই ব্যাখ্যা।'

অপু এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। হঠাৎ বলে উঠল, 'এই সব বক্কর চক্কর বাদ দাও বন্ধু। *নারী* বই পড়ছো—*নারী?* না পইড়া থাকলে পড়ো। তারপর কথা বলতে আইসো। উনার এই বইটা পড়লেই বুঝতে পারবা, তাঁর জ্ঞান কতটা গভীর ছিল। হাজার খানেক রেফারেন্সই দিয়েছেন, বুঝলা?'

অপুর কথা শুনে শাহেদ ভাই যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। সহসা চেয়ার থেকে মাথা

তুলে বললেন, 'খুব ভালো কথা বলেছিস রে অপু। বইটা তুই পড়েছিস?'

অপু খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, 'হ্যাঁ ভাই, পড়েছি। এ বই না পড়ে থাকা যায়? বইটি পড়েই আমি বুঝেছি—হুমায়ুন আজাদ সময়ের আগে জন্মেছিলেন।'

অপুর কথা শুনে ফারিস তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করল। সে বলল, 'আমরা নিজেরাই অনেক পিছিয়ে, তাই হুমায়ুন আজাদকে অগ্রগামী মনে করি। হুমায়ুন আজাদ *নারী* বইয়ে নতুন কিছুই আনতে পারেননি। যা এনেছেন, তা নিতান্তই পুরোনো। তিনি সময়ের আগে জন্মেছিলেন, এ কথা প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়।'

'কেন? প্রলাপ হবে কেন?'

'হুমায়ুন আজাদ *নারী* বইটি লিখেছেন নব্বইয়ের দশকে। বিজ্ঞান তখন অনেক উন্নত। কিন্তু হুমায়ুন আজাদ ফেমিনিজম সম্পর্কে কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাতে পারেননি। তিনি মূলত সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিস্টদের লেখালেখি থেকেই নিজের লেখা সাজিয়েছেন। নতুন কিছুই আনতে পারেননি। অশ্লীলতাটাই নতুন। তিনি সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম-এর ক্রিটিসিজম উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফেমিনিজম নিয়ে যেসব যুক্তি এনেছেন, তাও বেশ মামুলি ধরনের।

নব্বইয়ের দশকে থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের উৎপত্তি হয়। থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের সাথে সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের অনেক পার্থক্য। থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজম নিয়েও তিনি আলোচনা করেননি। নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণাও আনতে পারেননি। তিনি সময়ের আগে জন্মাননি, অনেক পিছিয়ে ছিলেন। তিনি যদি সিপাহী বিপ্লবের আগে কোলকাতায় জন্মাতেন, তাহলে ঠিক ছিল। আর *নারী* বইতে তিনি নিজের বক্তব্য ও অন্যের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করেছেন খুব কম।'

'মানে?'

'মানেটা খুব পরিষ্কার। তিনি বইটার শেষে বিশাল গ্রন্থতালিকা দিয়েছেন। কিন্তু বইয়ের মধ্যে সবার বক্তব্য এমনভাবে মিশিয়ে ফেলেছেন যে, কোনটা তাঁর বক্তব্য আর কোনটা অন্যের বক্তব্য, তা বোঝা মুশকিল। যদি পাশ্চাত্যের কোনও দেশে এই কাজ করতেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে চন্দ্ররেণুবৃত্তির অভিযোগ আসত। আর তিনি বইটায় ইসলাম নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন। না বুঝেই ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন।'

শাহেদ ভাই বললেন, 'না বুঝেই তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন! না বুঝেই! বাহ, বাহ!'

শাহেদ ভাইয়ের কথা শেষ হলে অপু বলল, 'আমার কাছে বইটার পিডিএফ আছে। তিনি কোথায় কোথায় মিথ্যাচার করেছেন, একটু বল তো। আমি মিলিয়ে দেখি?'

ফারিস বলল, 'বইটার *পিতৃতন্ত্রের খড়্গ : আইন বা বিধিবিধান* অধ্যায়টা বের কর তো?'

অপু মোবাইলটি শাহেদ ভাইয়ের হাতে দিলো। শাহেদ ভাই অধ্যায়টি বের করলেন। ফারিস বলল, 'ভাই, ৮১-পৃষ্ঠায় একটু নজর দেন।'

শাহেদ ভাই পৃষ্ঠাটি বের করলে ফারিস বলল, 'এই পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, ইসলামপূর্ব আরবে নারীদের মর্যাদা বেশি ছিল। ইসলাম আসার পর নারীদের মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়।'[৪৮]

শাহেদ ভাই বললেন, 'উনি কি মিথ্যা কিছু বলেছেন?'

ফারিস বলল, 'শুধু মিথ্যা! একেবারে জঘন্য মিথ্যা। এটা ইসলামের ওপর মিথ্যা অপবাদ।'

'ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন?'

'ইয়েস ব্রাদার! হোয়াই নট? ইসলামপূর্ব আরবের ইতিহাস থেকেই উনার দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* অথবা যেকোনও প্রসিদ্ধ সীরাত পড়ুন। আপনিই বিষয়টা ধরতে পারবেন।'

'তুই কি পাগল!'

'হঠাৎ এ কথা!'

'তুই যে বইগুলোর নাম বললি, এগুলো মুসলিমদের লেখা না অমুসলিমদের?'

'মুসলিমদের।'

'তাহলে কীভাবে তোর কথা মেনে নিই? মুসলিমরা তো বানিয়েও লিখতে পারে।'

'তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই, মুসলিমরা বানিয়ে ইতিহাস লিখেছে, তবুও কিন্তু লেখক মিথ্যাচারের দায় থেকে মুক্তি পেতে পারেন না।'

'কেন?'

'কারণ, অমুসলিমদের লেখা ইতিহাসগ্রন্থ পড়লেও তাঁর দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়।'

অপু এতক্ষণ চুপ ছিল। কিন্তু ফারিসের কথা শুনে বলে উঠল, 'সস্তা কথায় চিড়ে ভিজে না, জানিস তো? কোন অমুসলিম লেখক তোর পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন?'

[৪৮] হুমায়ুন আজাদ বলেন : "আরব নারীদের নানা ইতিহাস লিখা হয়েছে; সবগুলোতেই স্বীকার করা হয় যে ইসলামপূর্ব আরবে অনেক বেশী ছিলো নারীদের স্বাধীনতা ও অধিকার। তারা অবরোধ থাকত না অংশ নিত সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে; এমনকি তাদের প্রাধান্য ছিলো সমাজে।" ... "প্রচারের ফলে মুসলমানদের মধ্যে জন্মেছে এমন এক বদ্ধমূল ধারণা যে ইসলামপূর্ব আরবে নারীদের অবস্থা ছিলো শোচনীয়; ইসলাম উদ্ধার করে তাদের। প্রতিটি ব্যবস্থা পূর্ববর্তী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়; তবে ঐতিহাসিকভাবে সাধারণত সত্য হয় না।" (*নারী,* পৃষ্ঠা : ৮১)।

অপু এমনভাবে কথাটি বলল, যেন ওর কথা শুনে ফারিস ভয় পেয়ে যাবে, কথা বলা বন্ধ করে দেবে। অপু জানেও না ফারিস কতটা জ্ঞানী। ওর মতো দু-একটা চুনোপুঁটি—ফারিসের কাছে কিছু না। ফারিস ওর প্রশ্নের জবাবে হাসিমুখে বলল, 'রবার্ট স্পেন্সারের নাম শুনেছিস?'

'হুঁ।'

'তিনি কেমন ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন তা বলার প্রয়োজনবোধ করছি না। স্পেন্সারের ইসলামবিদ্বেষ ছিল প্রকাশ্য। কমবেশি আমরা সবাই তা জানি।'

'এই তোদের সমস্যা। কেউ সত্যি কথা লিখলেই তাঁকে ইসলামবিদ্বেষী মনে করিস।'

'সে না হয় পরে দেখা যাবে। আগে বল, রবার্ট স্পেন্সারের কথা মেনে নিতে আপত্তি নেই তো?'

'তিনি কী বলেছেন আগে সেটা বল।'

'The Truth About Mumammad বইতে তিনি লিখেছেন—"পৌত্তলিক আরব ছিল রুক্ষ ভূমি। সেখানকার লোকজন মরুভূমির মতো অত্যন্ত একরোখা ও কর্কশ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠত, রক্তগত শত্রুতা ছিল পুনরাবৃত্তিমূলক। সেখানকার নারীদের অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বাল্যবিবাহ (যেসব নারীদের বয়স ৭ অথবা ৮) এবং কন্যাশিশু হত্যা ছিল তাদের কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার। নারীরা সমাজে আর্থিক দায়বদ্ধতার বস্তু হিসেবে বিবেচিত হতো।"'[৪৯]

স্পেন্সারের কথা শুনে শাহেদ ভাই আর অপু দুজনেই একটা ধাক্কা খেলেন। অবশ্যি এটা আমার অনুমান নয়, তাঁদের চোখেমুখেই তা ফুটে উঠেছে। কিন্তু ত্যানাপ্যাঁচানো যাদের স্বভাব, তারা কি করে এত সহজে সত্যকে মেনে নিতে পারে? তাই তো শাহেদ ভাই বলে উঠলেন, 'এক স্পেন্সারের কথায় কিছু আসে যায় না। আজাদের বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণ করতে হলে, আরও প্রমাণ হাজির করতে হবে।'

এতক্ষণ আলোচনা স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। শাহেদ ভাইয়ের এ কথায় আলোচনা অন্যদিকে মোড় নিল। এ যেন আস্তিক-নাস্তিকের তর্কের লড়াই। সে লড়াইয়ে শেষমেষ কে জয়ী হয়, তা এখনো বলা যাচ্ছে না। ফারিস বলল, 'এর বাইরেও যদি আমি প্রমাণ দেখাতে পারি, তাহলে কি আমার কথা মেনে নেবেন?'

'সোর্স যদি অথেনটিক হয়, তাহলে আপত্তি থাকার কথা নয়। কী বলিস অপু?'

---

[৪৯] "Pagan Arabia was a rough land. Blood feuds were frequent, and the people had grown to be as harsh and unyielding as their desert land. Women were treated as chattel; child marriage (of girls as young as seven or eight) and female infanticide were common, as women were regarded as a financial liability."

অপু মাথা নেড়ে শাহেদ ভাইয়ের প্রতি সমর্থন জানাল। এরপর ফারিস বলতে লাগল, 'স্যার উইলিয়াম ম্যুর তাঁর লেখা *Life of Mahomet* গ্রন্থে বলেছেন, "আদিম সমাজ ও জঘন্য পরিস্থিতির মধ্যে আইন-কানুন, ভাষা ও জ্ঞানবিবর্জিত সমাজ নামের অযোগ্য এই নররূপী পশুদিগকে অন্যান্য ইতর জীব হতে পৃথক করা যায় না।"[৫০]

উইকিপিডিয়ায় এই চিত্রটা আরও বাস্তবভাবে ফুটে ওঠে। উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে—আরবসমাজ ছিল বর্বর। এতটাই বর্বর ছিল যে, তারা নারীদের মানুষ বলেই মনে করত না। অভিজাত শ্রেণির নারীরা ছাড়া অন্য নারীদের কোনও মর্যাদা দেওয়া হতো না। নারীরা ধর্মীয় কাজে অংশ নিতে পারত না। তাদের ছাগল কিংবা ভেড়ার মতো মনে করা হতো। সমাজে তারা মতামত প্রকাশ করতে পারত না। বিয়ে কিংবা তালাকের ব্যাপারেও তাদের মতামত নেওয়া হতো না। উত্তরাধিকারসূত্রে তারা সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। এমনকি কোনও মহিলার স্বামী যদি মারা যেত, তাহলে সৎ ছেলে উত্তরাধিকারসূত্রে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করত। মূলত নারীরা ছিল পুরুষের দাসী। কিন্তু ইসলাম আসার পর এ অবস্থা পরিবর্তিত হয়।'

'উইকিপিডিয়ার বক্তব্যটা দেখাতে পারবি?'

ফারিস উইকিপিডিয়া থেকে Women in pre Islamic Arabia আর্টিকেলটা দেখাল।

শাহেদ ভাই ফারিসের মোবাইলটা হাতে নিয়ে একধ্যানে তাকিয়ে রইলেন। দৃষ্টি যেন তাঁর ফিরতেই চাচ্ছে না।

[তিন]

শাহেদ ভাইয়ের আজ মন খুব খারাপ। তাঁকে দেখেই সেটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। কদিন ধরে সবার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। খাদ্যগ্রহণে তাঁর অনীহা লক্ষ করা যাচ্ছে। হয়তো রাতে ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটেছিল, তাই চোখগুলো রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। চুলগুলো বেশ উশকোখুশকো দেখাচ্ছে। শুনেছি তাঁর থিসিস-পেপার বাতিল করা হয়েছে। ছাত্রত্ব বাতিল হবে কি না, এই নিয়ে সিন্ডিকেটের মিটিং হবে। তারপর জানা যাবে।

এই কঠিন মুহূর্তেও তিনি একটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরে আছেন—বই। লাইব্রেরির এক কোনায় একটি বই সামনে নিয়ে বসে আছেন। হুমায়ুন আজাদের বই। *আমার অবিশ্বাস।* শাহেদ ভাইয়ের সবচেয়ে প্রিয় বই।

[৫০] "In this primitive and abject state, which will deserves the name of society, this human brute, without arts and lows, almost without sense and language, is poorly distinguished from the rest of the animal creation".

অনেক আগে তাঁর কাছে বইটির নাম শুনেছিলাম। আগ্রহ করে ক-পাতা উল্টিয়ে দেখেছিলাম। কিন্তু বমি বমি ভাব হচ্ছিল। তাই আর পড়া হয়নি। অবশ্যি বমিভাব পরিপাকতন্ত্রের সমস্যার কারণে হয়নি, হয়েছিল লেখকের লেখা দেখে। বইটির কভার পেইজ এখনো আমার মনে আছে। তাই ভাইয়ের হাতে বইটা দেখে, চিনতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। শাহেদ ভাইকে দেখলাম খানেক সময় পর পর একটি করে পাতা উল্টাচ্ছেন। এরপর অনেকক্ষণ নীরব থাকছেন। আবার পাতা উল্টাচ্ছেন।

মিনিট পাঁচেক পর যা ঘটল, তা দেখে আমি অবাক! নিজেকে বিশ্বাস করাতে কষ্ট হচ্ছিল। কষ্ট হবে না কেন বলুন? যে ভাই সারা জীবন হুমায়ুন আজাদের পুজো করে এসেছেন, তিনি কিনা এমন কাণ্ড ঘটাবেন! স্বপ্ন দেখছি না তো! শরীরে চিমটি কাটলাম। নাহ! সব তো ঠিকই আছে। এটা স্বপ্ন নয়, সত্যি। সত্যিই শাহেদ ভাই বইটির পাতা ছিঁড়ে ফেলছিলেন, আর বলছিলেন, 'তুই আমাকে শেষ করেছিস; আজ আমি তোকে শেষ করব।'

তথ্যসূত্র :

◆ ১) Robert Spencer, *The Truth About Muhammad;* (An Eagle Publishing Company, Washington, DC, 2006).

◆ ২) *চতুরঙ্গ,* ৫০ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই, ১৯৮৯, শিল্পপরিকল্পনা : রনেন আয়ন দত্ত, নির্বাহী সম্পাদক : আবদুর রউফ, পৃষ্ঠা : ২৮১-২৮৭; (অন্তরঙ্গ প্রকাশনী, ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা, ১৯৮৮)

◆ ৩) Sir William Muir, *Life of Mahomet;* (london, 1858)

◆ ৪) হুমায়ুন আজাদ, *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান;* (আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪)

◆ ৫) হুমায়ুন আজাদ, *বাক্যতত্ত্ব;* (আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪)।

◆ ৬) হুমায়ুন আজাদ, *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ;* (আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৫)।

◆ ৭) হুমায়ুন আজাদ, *নারী;* (আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ২০০৯)।

◆ ৮) Jacobsen, B., *Transformational Generative Grammar,* 1977.

◆ ৯) Arlotto, A., *Introduction to Historical Linguistics,* 1972.

◆ ১০) Jankowsky, K.R., *The Neogrammarians,* 1972.

◆ ১১) Jose Ortega Y Gasset, *The dehumanization of art*

♦ ১২) Wikipedia থেকে Women in pre Islamic Arabia আর্টিক্যালের চুম্বকাংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

"Before Islam, women experienced limited rights, except those of high status. They were treated like slaves and were not considered human. Women were not considered "worthy of prayer" and played no role in religious life. It is said that women were treated no different from "pet goats or sheep". Women could not make decisions based on their own beliefs and had little control over their marriages. They were never bound by contract for marriage or custody of children and their consent was never sought. Women were seldom allowed to divorce their husbands and their view was not regarded for either a marriage or divorce. If they got divorced, women were not legally allowed to go by their maiden name again. They could not own or inherit property or objects, even if they were facing poverty or harsh living conditions. Women were treated less like people and more like possessions of men. They, however, could be inherited and moved from home to home depending on the wants and needs of their husband and his family. Essentially, women were slaves to men and made no decisions on anything, whether it be something that directly impacted them or not. If their husband died, his son from a previous marriage was entitled to his wife if the son wanted her. The woman had no choice in the matter unless she was able to pay him for freedom, which was impossible in most cases. It was common for a new father to be outraged upon learning that his baby was a female. It was believed that girls ensured a bad omen and men thought that daughters would bring disgrace to the family. Because baby girls were thought to be evil, many of them were sold or buried alive."

(https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_pre-Islamic_Arabia).

বি.দ্র. : অনেক খোঁজাখুঁজির পর চতুরঙ্গ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. মৃণাল নাথের "ভাষাবিজ্ঞানীর এ কোন শোচনীয় পরিণতি"—প্রবন্ধটি আমার হস্তগত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি হুমায়ুন আজাদের চন্দ্ররেণুবৃত্তির দলিলভিত্তিক আলোচনা করেছেন। আমি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং মৃণাল নাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অজানা অধ্যায়ের সুসমাচার - (১)

[এক]

ব্যতিক্রমের প্রতি সবারই আকর্ষণ থাকে। আমারও আছে। একটু বেশিই আছে। ছেলেবেলা থেকেই ব্যতিক্রম জিনিসের খোঁজ করে চলেছি। এখনো করি। খুঁজতে খুঁজতে মাঝেমধ্যে এমন-সব ব্যতিক্রম জিনিস পেয়েছি, যা কল্পনাও করিনি কোনও দিন। আমার জীবনে তেমনই এক কল্পনাতীত ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্বের নাম—ফারিস। কথা-কাজে, মেধা-মননে, চিন্তা-চেতনায় ওর থেকে ব্যতিক্রম কেউ আমার নজরে পড়েনি।

ও কেমন ব্যতিক্রম, তার একটা উদাহরণ দিই। কিছুদিন আগে আমরা একটা জায়গায় বেড়াতে গেলাম। সময় কম লাগবে বলে বাসে রওনা দিলাম। বাস থেকে নেমে রিকশা নেব, এমন সময় একটা ছেলে এসে হাজির। বয়স বারো কি তেরো এর বেশি হবে না। ছেলেটা কিছু সাহায্যের আবেদন করল। আমি হলে হয়তো কিছু টাকা দিয়েই কেটে পড়তাম। কিন্তু ফারিস তা করল না। সে ছেলেটার সাথে পরিচিত হলো।

ছেলেটার নাম বরকত আলী। বরকতের সাথে কথাবার্তার মাধ্যমে জানা গেল, ওর বয়স যখন সাত তখন ওর বাবা আরেকটা বিয়ে করে তার মাকে ফেলে চলে যায়। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে বরকতই সব থেকে বড়। ওদের মা বাসায় কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালায়। এখন ওর মা-ও অসুস্থ। তাই বাধ্য হয়েই পড়াশোনা ছেড়ে ভিক্ষা করতে নেমেছে। ফারিস বরকতের মাথায় হাত বুলিয়ে এক হাজার টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিলো। টাকাটা দেওয়ার সময় বলল, 'আজ থেকে আর ভিক্ষা করা চলবে না। এই টাকা দিয়ে ছোট্ট একটা ব্যবসা শুরু করবে। পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে যাবে। কী? মনে থাকবে?'

বরকত বেশ খুশি হয়ে বলল, 'জি আইচ্চা স্যার। কিন্তু আপনার টেহাডা শোধ করুম কেমনে?'

'খুবই সহজ। তুমি তোমার মতো আরেক জনকে সাহায্য করবে। তাহলেই হবে।'

ফারিসের ব্যতিক্রমধর্মিতা আমাকে রীতিমতো অবাক করত। আমরা যখন ভার্চুয়াল

জগতে কল্পনার ডানা মেলে হারিয়ে যেতাম দূরে, বহুদূরে, ও তখন জায়নামাজে দাঁড়িয়ে স্রষ্টার প্রশংসায় বিভোর থাকত। প্রাত্যহিক ঝামেলায় আমরা যখন স্রষ্টার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকতাম, ও তখন নিজের জিহ্বাকে স্রষ্টার স্মরণে আর্দ্র রাখত। দুনিয়ার ভালোবাসায় আমরা যখন স্রষ্টার দেওয়া দায়িত্বে অবহেলা করতাম, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ফারিস সে দায়িত্বপালনে সচেষ্ট থাকত।

সেদিন শুক্রবার। সবেমাত্র জুমুআর নামায পড়ে বাড়িতে এসেছি। এমন সময় ফারিসের ফোন। তার সাথে দেখা করতে হবে বলে জানাল। দ্রুত খাওয়া শেষ করে বাসা থেকে বের হলাম। গন্তব্য ভার্সিটির বটতলা।

[দুই]

আমি পৌঁছার আগেই ফারিস চলে এসেছে। তবে বিগত দিনের তুলনায় ওকে আজ একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে। সালাম-বিনিময় শেষে আমি বললাম, 'এত জরুরি তলব? ব্যাপার কী বন্ধু?'

ফারিস উত্তর দিলো, 'আর বলিস না। মাইকেলকে নিয়ে বেশ যন্ত্রণায় আছি। ও আবার বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।'

মাইকেল ছেলেটা খ্রিষ্টান। আমাদের ভার্সিটিতেই পড়ে। পুরো নাম মাইকেল ডি রোজারিও। খ্রিষ্টান মিশনারিদের সাথে থাকে। আমাদের ভার্সিটিতে যারা খ্রিষ্টধর্মের দাওয়াত দেয়, তাদের মধ্যে মাইকেলই প্রধান। মাইকেলের সমস্যা হলো, ও প্রায়ই ইসলামকে আক্রমণ করে কথাবার্তা বলে থাকে। বানিয়ে বানিয়ে অনেক মিথ্যেও বলে। টাকার লোভ দেখাতেও দ্বিধা করে না। ফারিসের বিষণ্ণ চেহারাই বলে দিচ্ছে, মাইকেল আবারও এই ধরনের কাজই করেছে। আমি বললাম, 'মাইকেল কি আবারও উল্টোপাল্টা কিছু বলেছে?'

'হুঁ।'

'কাকে বলেছে?'

'রাহাতকে।'

'কী কী বলেছে, কিছু শুনেছিস?'

'হুঁ। রাহাতের সাথে কথা হয়েছিল। ফোনে সব জানিয়েছে।'

'কী কী বলেছে, শুনি?'

'আর কী? পুরাতন রেকর্ডই আবার বাজিয়েছে। রাহাতকে বলেছে—'ইসলাম

সন্ত্রাসী ধর্ম। ইসলাম যুদ্ধ-বিগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে। অমুসলিমদের নির্বিচারে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে। খ্রিষ্টধর্ম এসব থেকে মুক্ত। খ্রিষ্টধর্মে মারামারি নেই, হানাহানি নেই, যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই। খ্রিষ্টধর্ম মানবতার ধর্ম, শান্তির ধর্ম।' মাইকেলের কথা শুনে রাহাত তার দীন নিয়ে বেশ সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেছে মনে হলো।'

ফারিসের মুখে মাইকেলের মিথ্যাচার শুনে আমারও খারাপ লাগল। মাইকেল সত্যিই বাড়াবাড়ি করে। মাঝে মাঝে ওর বাড়াবড়ি চরমে পৌঁছায়। আর ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় কেন নিতে হবে, তা আমার বুঝে আসছিল না। পাশাপাশি রাহাতকে নিয়েও চিন্তা হচ্ছে। আমি বললাম, 'এখন কী করা যায়? মাইকেলের সাথে কথা বলবি?'

'হুঁ। মাইকেলকে ফোনে আসতে বলেছি, সাথে রাহাতকেও।'

কিছুক্ষণ পর মাইকেল পৌঁছাল। এরপর রাহাত। আমরা পারস্পরিক কুশলাদি বিনিময় করে চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। আমি চায়ের অর্ডার দিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই চা চলে এল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফারিস বলল, 'আচ্ছা মাইকেল, তোর প্রব্লেমটা কোথায়, একটু বলবি?'

মাইকেল বেশ জোরগলায় বলল, 'প্রব্লেম মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'তুই কাল রাহাতকে কী বলেছিস?'

'কী বলেছি আবার? যা সত্য তা-ই বলেছি। নিজ থেকে বানিয়ে তো কিছু বলিনি। তোদের ধর্ম যা বলেছে, আমি তা-ই বলেছি। ট্রাস্ট মি।'

'আমাদের ধর্ম কী বলেছে?'

'যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বলেছে, মারামারির কথা বলেছে, অমুসলিমদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছে। কী, বলেনি?'

'সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু তোদের ধর্ম?'

'আওয়ার রিলিজিয়ন ইজ ফ্রি ফ্রম অল অফ দিজ। খ্রিষ্টধর্ম মানবতার কথা বলে, শান্তির কথা বলে।'

'রিয়েলি? আর ইউ শিওর?'

'হোয়াই নট? অ্যাবসোলিউটলি।'

'তোর সাথে বাইবেল আছে?'

'হুম, আছে। থাকবে না কেন, সব সময়ই থাকে।'

'গুড, ভেরি গুড। বের কর।'

মাইকেল ব্যাগ থেকে বাইবেলটি বের করলে ফারিস বলল, 'বাইবেলের নতুন নিয়মের মথির দশম অধ্যায়টি বের কর।'

মাইকেল বলল, 'আচ্ছা, বের করছি।'

'আমি এই অধ্যায়ের ৩৪ থেকে ৩৫ ভার্সগুলো পড়ছি, তুই মিলিয়ে দেখ।'

'ওকে, বল।'

'যিশু বলেছেন,"মনে করিও না আমি পৃথিবীতে শান্তি দান করিতে আসিয়াছি; শান্তি নয় বরং খড়গ দান করিতে আসিয়াছি। কারণ পিতা-পুত্রে, মাতা-কন্যায়, শাশুড়ী-বধূতে বিচ্ছেদ জন্মাইতে আসিয়াছি।"'[৫১]

'কী? মিলেছে?'

মাইকেল মাথা নাড়ল। ফারিস মাইকেলকে লক্ষ্য করে বলল, 'তাহলে বল তো, খ্রিষ্টধর্ম কীভাবে শান্তির ধর্ম হলো? যেখানে যিশু নিজ মুখে বলেছেন, তিনি শান্তির জন্যে আসেননি; বরং খড়্গ দান করতে এসেছেন। আমি কি তোর কথা বিশ্বাস করব, নাকি যিশুরটা?'

মাইকেল ভেবেছিল ফারিসকে নয় ছয় বুঝিয়ে দিলেই—কাজ হয়ে যাবে। ওর ধারণা একেবারেই ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ওরা যাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করে, তিনিই নিজ মুখে বলেছেন, তিনি শান্তি দিতে আসেননি। এই কথা শোনার পর মাইকেলের আর কীই-বা বলার আছে? তাই মাইকেল বলল, 'আই'ম সরি। এই অধ্যায়টা আমার পড়া ছিল না। কিন্তু তাই বলে কি এটা প্রমাণিত হয় যে খ্রিষ্টধর্ম যুদ্ধ-বিগ্রহের ধর্ম?'

ফারিস মাইকেলের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'নে। চা নে।'

ফারিসের কথা শুনে মাইকেল চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে চুমুক দিলো। এরপর ফারিস বলল, 'আচ্ছা, তুই কি বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ওপর আস্থা রাখিস?'

'কেন রাখব না? অবশ্যই রাখি। ঈশ্বরের বাণী কি কখনো পরিবর্তিত বা রহিত হতে পারে ? তাই পুরাতন ও নতুন নিয়মে যা রয়েছে, তার সবটাই বিশ্বাস করি। আর শুধু আমিই না, সব খ্রিষ্টানই বিশ্বাস করে।'

'পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণের ২০ অধ্যায়টি বের কর। আমি ২০ অধ্যায়ের ১ম ভার্সটি বলছি, তুই মিলিয়ে দেখ তো ভুল হয় কি না। আর হ্যাঁ, ভুল হলে অবশ্যই বলবি।'

[৫১] অনুবাদের ক্ষেত্রে 'বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি' কর্তৃক প্রণীত বাইবেলের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তাই ভাষার ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন করা হয়নি।

মাইকেল অধ্যায়টি বের করে বেশ মনোযোগ-সহকারে দেখতে লাগল। আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, মাইকেলের উত্তরটা ফারিস কেন দিলো না। আমি চা পান করতে লাগলাম।

ফারিস বলল,'"তুমি তোমার শত্রুদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে গিয়া যদি আপনার অপেক্ষা অধিক অশ্ব, রথ ও লোককে দেখ, তবে সেই সকল হইতে ভীত হইও না, কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিশর দেশ হইতে তোমাকে উঠাইয়া আনিয়াছেন, তিনিই তোমার সহবর্তী।" কী, ঠিক আছে?'

মাইকেল মাথা নাড়ল। ফারিস জিজ্ঞাসা করল, 'তোদের ধর্মও তো যুদ্ধের কথা বলছে। কী? বলেনি? বলেছে। তাহলে তুই যে বললি, খ্রিষ্টধর্মে যুদ্ধের কথা নেই, কেবল ইসলাম ধর্মেই আছে?'

মাইকেল মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'আই'ম রিয়েলি সরি। এই অধ্যায়টাও পড়া ছিল না। সরি। যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে তো কী হয়েছে? ইসলামের মতো তো আর অমুসলিমদের ধরে ধরে হত্যা করতে বলেনি। যুদ্ধের অবশ্যই রুলস রেগুলেশন দিয়েছে। হুট করে তো আর কাউকে ধরে মেরে ফেলতে বলেনি।'

আমি ভাবলাম—এ তো মহাযন্ত্রণা। মাইকেল কেবল কথা পেঁচিয়েই যাচ্ছে। ফারিসের কোনও কথার উত্তর না দিয়ে, সব কথা ঘুরিয়ে ফেলছে। আর ঘুরাবেই-বা না কেন? ওর তো এ ছাড়া উপায়ও নেই। ও হয়তো ভেবেছে, ফারিসের চোখে ধুলো দিয়ে কোনওরকমে কেটে পড়বে। তা কি আর হয়? ফারিস কি এত সহজে ওকে ছেড়ে দেবে? আমি ফারিসকে বললাম, 'চল, চলে যাই। ওর সাথে কথা বলে লাভ নেই। ও কেবল কথা প্যাঁচাচ্ছে।'

ফারিস শান্ত গলায় বলল, 'আরে বস না। এত তাড়া কিসের? চা তো আগে শেষ করে নে। নাকি চা ফেলেই চলে যাবি?'

ফারিসের কথায় বসে গেলাম। এরপর ফারিস মাইকেলকে লক্ষ্য করে আবার বলল, 'দ্বিতীয় বিবরণের এই অধ্যায়েরই ১২ নম্বর ভার্স থেকে পড়। একটু জোরে জোরে পড়বি, যাতে সবাই শুনতে পারি।

মাইকেল এবার পকেট থেকে চশমাটা বের করে চোখে লাগিয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করল—"কিন্তু যদি সন্ধি না করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তবে তুমি সেই নগর অবরোধ করিবে। পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা তোমার হস্তগত করিলে তুমি তাহার সমস্ত পুরুষকে খড়গধারে আঘাত করিবে, কিন্তু স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও পশুগণ প্রভৃতি নগরের সর্ব্বস্ব, সমস্ত লুটদ্রব্য আপনার জন্য লুট স্বরূপে

গ্রহণ করিবে, আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত শত্রুদের লুট ভোগ করিবে।”

মাইকেল এই পর্যন্ত পড়তেই ফারিস তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘এটাই তো বাইবেলের যুদ্ধাবস্থার রুল, তাই না?’

মাইকেল মাথা নিচু করে আছে। রাহাত এতক্ষণ পর্যন্ত চুপই ছিল, কিন্তু বাইবেলের এই বক্তব্য শোনার পর ফারিসকে বলল, ‘সমস্ত পুরুষকে মেরে ফেলা হবে! কিন্তু নারী, শিশুদের লুট করা হবে!’

রাহাতের প্রশ্ন শুনে ফারিস মুচকি হেসে বলল, ‘গণনাপুস্তকের কথা শুনলে তো আরও অবাক হবি।’

‘সত্যিই?’

‘হুঁ। শুনবি?’

‘অবশ্যই। বল, বল।’

ফারিস মাইকেলের হাত থেকে বাইবেলটা নিয়ে রাহাতের হাতে দিয়ে বলল, ‘ধর। গণনাপুস্তকের ৩১ অধ্যায় খোল। আমি ১৭ নম্বর ভার্স থেকে বলছি, তুই মিলিয়ে দেখ।’

রাহাত পুরাতন নিয়মের গণনাপুস্তক অধ্যায়টি খোলার পর ফারিস বলল, ‘“অতএব তোমরা এখন বালকবালিকাদের মধ্যে সমস্ত বালককে বধ কর এবং শয়নে পুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত সমস্ত স্ত্রীলোককেও বধ কর; কিন্তু যে বালিকারা শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নাই, তাহাদিগকে আপনাদের জন্য জীবিত রাখ”। আর দ্বিতীয় বিবরণের ১৩/১৫ থেকে আরও জানা যায়, মানুষের সাথে সাথে শত্রুপক্ষের সব পশুসহ বধ করতে হবে।’

ফারিসের কথা শুনে মাইকেল আর কিছু বলল না। চুপটি করে বসে রইল। দেখে মনে হচ্ছে ওর মতো লাজুক ছেলে আর দ্বিতীয়টি নেই। আমি বললাম, ‘সবাইকে বধ করতে হবে। নিরীহ পশুগুলোকেও? কিন্তু বেছে বেছে রেখে দিতে হবে কুমারী মেয়েদের?’

আমার কথা শেষ না হতেই মাইকেল বলে উঠল, ‘যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করতে হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এটা তো যুদ্ধনীতির বাইরের কিছু না।’

আমি বললাম, ‘মানলাম এটা যুদ্ধনীতি। শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করতে হবে। কিন্তু তাই বলে নির্বিচারে সব মানুষকে মেরে ফেলতে হবে? আচ্ছা মানুষ না হয় মারা গেল, কিন্তু তাদের নিরীহ পশুগুলো কী দোষ করল? তাদের কেন পুড়িয়ে মারতে হবে?

আবার কুমারী মেয়েদের আলাদা করে কেন লুট করতে হবে?'

মাইকেল জবাব না দিয়ে আবার কথা ঘুরিয়ে বলল, 'খ্রিষ্টধর্ম যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যার অনুমতি দিয়েছে মেনে নিলাম। তোদের নবীও যে শত শত পুরুষকে হত্যা করেছিলেন, এটা নিশ্চয় জানা আছে?'

ফারিস এবার নড়েচড়ে বসল। মাইকেল মনে হয় মিথ্যার গোলকধাঁধায় ফেলে ফারিসকে বোকা বানাতে চাচ্ছে। কিন্তু ও জানেও না, ফারিস বাইবেলের জ্ঞান ওর থেকে বেশি রাখে। বাইবেলের যতগুলো ভার্স ফারিসের মুখস্থ, তার অর্ধেকটাও ওর মুখস্থ নেই। এবার ফারিস রাহাতকে ইশারা দিলো—বাইবেলটা মাইকেলের হাতে দিতে। এরপর ফারিস বলল, 'তুই কি জানিস, কেবল গো-বৎস পূজা করার অপরাধে মোশি কতজন লোককে হত্যা করেছিলেন?'

মাইকেল কিছু বলছে না, তার মানে সংখ্যাটা তার জানা।

ফারিস বলল, 'বাইবেলটা তো তোর হাতেই আছে। মিলিয়ে দেখ। ভুল বললে ধরিয়ে দিস। যাত্রাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ের ২৫ থেকে ২৮ ভার্স অনুসারে, মোশি গো-বৎস পূজা করার অপরাধে তিন হাজার মানুষকে হত্যা করেন। যদিও রহমাতুল্লাহ কিরানবী বলেছেন, আরবি বাইবেলে সংখ্যাটা ২৩ হাজার ছিল। পরবর্তীতে কেটেকুটে তিন হাজার করা হয়েছে। গণনাপুস্তকের ৩১ অধ্যায় থেকে জানা যায়, মোশি ইলিয়াসর যাজকের পুত্র পীনহসের নেতৃত্বে, মিদিয়নীয়দের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, সে যুদ্ধে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার মেষ, ৭২ হাজার গরু, ৬১ হাজার গাধা এবং শয়নে পুরুষের পরিচয় পায়নি এমন ৩২ হাজার বালিকাকে লুণ্ঠন করেন। এরপর বাকি সবাইকে হত্যা করেন। যদি ৩২ হাজার কুমারীকে জীবিত রেখে, বাকি সবাইকে মেরে ফেলা হয়, তাহলে মৃতলোকের সংখ্যা কত হাজার ছিল, তা আল্লাহই ভালো জানেন।'

মাইকেল কিছুই বলছে না। তবে চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, আরও কিছু বলতে চায়। আমি বললাম, 'কী রে? আরও কিছু বলবি?'

মাইকেল ওর শেষ টোপটা মনে হয় ফারিসকে গেলাতে চাচ্ছে। তাই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। মাইকেলের হয়তো জানা নেই, ও যে বিলের চুনোপুঁটি, ফারিস সেই বিলের বক। মাইকেল ফারিসকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমার যে এক জায়গায় একটু খটকা ছিল?'

ফারিস বলল, 'বল তো শুনি।'

'তোদের ধর্মে কোনও এলাকা বিজিত হলে, সেখানে প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেন?'

'ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। ওপেন দ্যা বাইবেল। যাত্রাপুস্তকের ৩৪ নম্বর অধ্যায়টা খোল।'

মাইকেল বেশ উৎসাহ নিয়ে যাত্রাপুস্তকের ৩৪ অধ্যায়টা খুলল। আর ফারিস বলতে শুরু করল, 'যাত্রাপুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ের ১২ থেকে ১৩ ভার্সগুলোতে বলা হয়েছে—"সাবধান যে দেশে তুমি যাইতেছ, সেই দেশ-নিবাসীদের সহিত নিয়ম স্থির করিও না, পাছে তাহা তোমার মধ্যবর্ত্তী ফাঁদস্বরূপ হয়। কিন্তু তোমরা তাহাদের বেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল খণ্ড খণ্ড করিবে, ও তথাকার আশেরা-মূর্ত্তি সকল কাটিয়া ফেলিবে।"'

ফারিসের কথা শুনে রাহাত বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'অনেক হয়েছে। আর না। মাইকেলের সাথে আর কথা নেই। ও মিথ্যাবাদী। আমার সাথে প্রতারণা করেছে।'

ফারিস মুচকি হেসে বলল, 'বি কুল ম্যান। সামান্যতেই এতটা উত্তেজিত হলে চলে? আরেকটু দাঁড়া। তুই চা শেষ কর, আমিও শেষ করে দিচ্ছি।'

মাইকেল চুপিচুপি কেটে পড়তে চাচ্ছে দেখে ফারিস ওর হাত ধরে বলল, 'আচ্ছা মাইকেল, তুই কি সত্যিই বাইবেলে বিশ্বাস করিস?'

'কেন করব না? অবশ্যই করি।'

'যিশুর কথার ওপর তোর আস্থা আছে?'

'অবশ্যই আছে।'

'তাহলে একটা পরীক্ষা হয়ে যাক।'

'কী পরীক্ষা?'

'গসপেল অফ মার্কের ১৬/১৬-১৭ তে আছে—"যে বিশ্বাস করিবে ও যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিবে সে পরিত্রাণ পাইবে, এবং যে বিশ্বাস করিবে না সে দোষী সাব্যস্ত হইবে, এই লক্ষণগুলি বিশ্বাসীদের অনুবর্তী হইবে; তাহারা আমার নামে মন্দ আত্মা দূর করিবে, নূতন নূতন ভাষায় কথা বলিবে, তাহারা সর্প তুলিবে এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাদের কোনো ক্ষতি হইবে না।"'

এই পর্যন্ত বলে ফারিস যখন থামল, তখন মাইকেলের চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপটা লক্ষ করা গেল। ফারিস বলল, 'তাহলে বাইবেল অনুসারে তোর একটি পরীক্ষা হয়ে যাক। তুই আমাদের সামনে বিষ পান করে দেখা। যদি সত্যিই যিশুর অনুসারী হয়ে থাকিস, যিশুকে বিশ্বাস করে থাকিস, তাহলে তোর কিছু হবে না। আর আমরাও মেনে নেব—তুই যিশুর বক্তব্যের ওপর আস্থা রাখিস।'

মাইকেল এবার নিচু গলায় বলল, 'আমার একটা জরুরি কাজ আছে। এখনই যেতে হবে। তোর সাথে পরে এই বিষয় নিয়ে কথা হবে। আজ যাই। বাই। বাই, ফ্রেন্ডস। সি ইউ।'

মাইকেল বেশ দ্রুতগতিতেই প্রস্থান করল। ওর তড়িঘড়ি করে চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখে রাহাত হো হো করে হাসতে হাসতে বলল, 'ভালো হয়েছে। ওর উচিত শিক্ষা হয়েছে।'

রাহাতের জবাবে ফারিস কিছু না বলে কেবল একটি আয়াত বলল। আয়াতটি এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে :

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ [٢:٧٩]

তথ্যসূত্র :

♦ ১) অর্থ : "অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ,যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্যে এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে।" [সূরা বাকারাহ, (০২) : ৭৯ আয়াত]

♦ ২) দ্বিতীয় বিবরণ, ২০/১। (বাইবেল, অনুবাদ : বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ৩৮-ইটাখোলা রোড, ঢাকা, ৩রা মার্চ, ১৯৭২)

♦ ৩) দ্বিতীয় বিবরণ, ২০/১২-১৪

♦ ৪) গণনাপুস্তক, ৩১/১৭

♦ ৫) দ্বিতীয় বিবরণ, ১৩/১৫

♦ ৬) যাত্রাপুস্তক, ৩২/২৫-২৮

♦ ৭) গণনাপুস্তক, ৩১/১-৫৪

♦ ৮) যাত্রাপুস্তক, ৩৪/১২-১৩

♦ ৯) মার্ক, ১৬/১৬-১৭

♦ ১০) কীরানবী, রাহমাতুল্লাহ ইবনে খলীলুর রাহমান, ইযহারুল হক্ব, অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ জাহাংগীর, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮)

আগ্রহী পাঠকগণ যদি একটু কষ্ট করে তাদের বাইবেলের—The Book of Joshua (যিহোশূয়ের পুস্তক), The Book of Judges (বিচারকর্তৃগণের বিবরণ), The First Book of Samuel (শমূয়েলের প্রথম পুস্তক), The Second Book of Samuel (শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক), The First Book of Kings (রাজাবলির প্রথম খণ্ড), The Second Book of Kings (রাজাবলির দ্বিতীয় খণ্ড), The First book of the Chronicles (বংশাবলি প্রথম খণ্ড), The Second Book of Chronicles (বংশাবলি দ্বিতীয় খণ্ড) ইত্যাদি গ্রন্থগুলো পাঠ করেন, তাহলে আরও এই ধরনের অনেক কর্ম আপনার নজরে পড়বে।

বাইবেলের বৈপরীত্য - (১)

[এক]

কৈশিকের সাথে শেষবার দেখা হয় শীতের বন্ধের আগের রাতে। সে রাতে আমরা অনেকক্ষণ কাটিয়েছি। এরপর ভার্সিটি বন্ধ হয়ে যায়—চৌদ্দ দিনের জন্যে। ভার্সিটি যেদিন খুলল, সেদিন বিকেলের কথা। ক্লাস শেষে বাসায় ফিরছিলাম। হেঁটে নয়, রিকশায়। রিকশা খুব দ্রুত চলছিল। হঠাৎ কৈশিককে দেখে আমার চোখ ছানাবড়া। রিকশা থামালাম। ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না।

কৈশিককে এ অবস্থায় দেখে খুব খারাপ লেগেছিল। দূর থেকে একধ্যানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। অবশ্যি ও আমাকে দেখতে পায়নি। কৈশিককে চিনতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। হিসেবটা কোনওভাবেই মিলছে না। নাহ, থাক! এর কূলকিনারা পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। ভাবলাম ফারিসকে কল করি। এক্ষুনি। বিষয়টা খুলে বলি। কিন্তু মাত্র ক্লাস শেষ হলো। ফারিসকে এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

রাতে ফারিসকে সব খুলে বললাম। ফারিসও শুনে অবাক হলো। নিজের বন্ধুর খ্রিষ্টান হওয়ার কথা শুনে অবাক হবে না? অবশ্যই হবে। অবাক হওয়ার মতোই বিষয়। ফারিস বলল, 'রাতে তো ওর সাথে দেখা করা সম্ভব না। ইনশাআল্লাহ কাল দেখা করব। তুইও যাবি।'

আমি রাজি হলাম। আমাকে যে যেতেই হবে। কৈশিক আমার খুব কাছের বন্ধু। কোনওরকমে রাতটা পার হলেই হয়। কালই ওর সাথে দেখা করব। ওর পরিবর্তন হয়ে যাওয়াটা আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছিল। রাতে ভালো ঘুম হলো না। সারা রাত ওর চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেলো।

[দুই]

কৈশিকের সাথে দেখা হলো ফুচকা চত্বরে। আমি, সারাফ, ফারিস, ক্লাস শেষে যখন বাসায় ফিরছিলাম—তখন। কৈশিক আর মাইকেল ফুচকা খাচ্ছিল। কদিনেই দুজনের মধ্যে অনেক ভাব জমে গেছে। কাল ওর কথা বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। আমার কল রিসিভ করেনি। বার বার কেটে দিয়েছে। আজ এত সহজেই ওকে পেয়ে যাবো—ভাবিনি। ফারিসকে ইশারা দিলাম।

আমাদের দেখে ওরা দ্রুত উঠে পড়তে চাইলো। আমি আটকে দিলাম। এরপর বললাম, 'কই যাচ্ছিস? ফুচকা খাওয়াবি না?'

কৈশিক কোনও জবাব দিলো না। মাইকেল ফুচকার অর্ডার দিলো। আমরা প্লাস্টিকের টুল টেনে ওদের সামনাসামনি বসলাম। কৈশিক আমাদের দেখে বেশ ইতস্তত বোধ করছিল। ওর চেহারার মধ্যে তা ফুটে উঠছিল।

কিছুক্ষণ পর ফুচকা এল। ফুচকা খেতে খেতে ফারিস বলল, 'কিরে মাইকেল! দাওয়ার কাজ ভালোই চলছে তাহলে।'

মাইকেল কিছুটা অপ্রস্তুত গলায় জবাব দিলো, 'কেন, কোনও সমস্যা?'

'না, সমস্যা হবে কেন?'

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে কেটে গেল। ফারিস আবার বলল, 'আচ্ছা মাইকেল! তোর মিথ্যাচার কি কখনোই বন্ধ হবে না?'

মাইকেল মুখটা কালো করে বলল, 'তুই কী বলতে চাস?'

'কী বলতে চাই, তা তুই ভালোই জানিস।'

'মানে?'

'মানেটা খুব পরিষ্কার। কৈশিককে যা যা বলে তোর দলে ঢুকিয়েছিস, তা কি মিথ্যা ছিল না?'

কৈশিক বলে উঠল, 'মাইকেল আমাকে মিথ্যা কিছু বলেনি। ও সত্যকে আমার সামনে তুলে ধরেছে। বাইবেলকে আমার বিশুদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বলে মনে হয়েছে। সবকিছু বোঝার পর, আমি স্বেচ্ছায় খ্রিষ্টান হয়েছি।'

কৈশিকের এমন কথাবার্তা আমাকে সত্যিই অবাক করল। স্বল্প সময়েই এত পরিবর্তন! এতটা! খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমার ভুলের কারণেই এমনটা হয়েছে। কৈশিকের কথা শুনে মাইকেলকে প্রসন্ন দেখাল। ফারিস বলল, 'বাইবেল

সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব! বাইবেলে কোনও ভুল নেই?'

কৈশিক দ্রুত বলে উঠল, 'না।'

ফারিস বলল, 'সত্যিই তো?'

'মিথ্যা হবে কেন?'

'তাহলে একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। তারপর না হয় আমরা সিদ্ধান্ত নিই—বাইবেল বিশুদ্ধ কি না।'

'আচ্ছা। তবে আমার পক্ষ নিয়ে মাইকেল কথা বলবে।'

'মাইকেল কেন? তুই চাইলে গির্জার ফাদারকেও ডেকে আনতে পারিস। আমার কোনও আপত্তি নেই।'

প্রস্তুতি পর্ব শুরু হলো। মাইকেল ব্যাগ থেকে ওর ডায়রিটা বের করল। এরপর বাইবেল। ফারিস যেমন আছে, তেমনই রয়ে গেল। এরপর বলল, 'তোর প্রস্তুতি শেষ?'

মাইকেল হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। ফারিস বলল, 'বাইবেল সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আগে আমাকে সেগুলো ক্লিয়ার করতে হবে। তারপর অন্যকথায় যাব। রাজি?'

মাইকেল বলল, 'ওকে।'

'যিশুর যে বংশতালিকা বাইবেলে আছে, তার মধ্যে কি কোনও বিপরীত ভাব আছে?'

'কিছু জায়গায় আছে। যেমন : মথির বর্ণনা অনুযায়ী যিশু পর্যন্ত ছাব্বিশ প্রজন্ম। আর লূক অনুযায়ী একচল্লিশ প্রজন্ম।'

'এ ছাড়া আর সমস্যা নেই?'

'আমার জানামতে নেই।'

'মথি আর লূক যিশুর যে বংশতালিকা দিয়েছে, তার মধ্যেও তো অনেক অমিল আছে।'

সারাফ বলল, 'কী সমস্যা আছে রে ফারিস?'

ফারিস বলল, 'মথি থেকে জানা যায়, যোষেফের পিতা যাকোব। কিন্তু লূক বলছে, যোষেফের পিতা এলি। মথি বলছে, যিশু দাউদের পুত্র শলোমনের বংশধর। কিন্তু লূক থেকে জানা যায়, তিনি দাউদের পুত্র নাথনের বংশধর। মথির বর্ণনায়, দাউদ থেকে যিশুর পূর্বপুরুষরা সবাই রাজা ছিলেন। লূকের বর্ণনায় দাউদ ও নাথন ছাড়া কেউই

রাজা ছিলেন না। আবার মথিতে আছে—যিশুর পূর্বপুরুষ শল্টীয়েলের পিতার নাম যিকনিয়। কিন্তু লূক বলছে, শল্টীয়ের পিতার নাম নেরি। মথিতে সরুব্বাবিলের পুত্রের নাম অবীহূদ বলা হয়েছে। লূকের বর্ণনায় তাকে রীষা বলা হয়েছে।'

ফারিসের কথা শুনে মাইকেল বলল, 'যিশুর বংশতালিকায় সামান্য হেরফের হতেই পারে। এই নিয়ে হইচই করার কিছুই নেই। যিশুর বংশতালিকার সমাধান অনেক আগেই করা হয়েছে।'

'কীভাবে?'

'দু-বংশ সমাধান। মথি যোসেফের বংশতালিকা দেখেছেন। আর লূক মরিয়মের বংশতালিকা দেখেছেন। আর যোষেফ এলির ছেলে নয়, জামাতা।'

'কিন্তু মথির দিকে তাকালে যে তোর কথা মেনে নেওয়া যায় না।'

'কেন?'

'মথিতে তো বলাই হয়েছে, তিনি পরের ব্যক্তিকে জন্ম দিয়েছেন। মথির প্রথম অধ্যায়ের ১৬ নম্বর ভার্সে বলা হয়েছে—"এবং যাকোবের পুত্র যোষেফ; ইনি মরিয়মের স্বামী; এই মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হয়।" তাহলে তোর কথা কীভাবে মেনে নিই?'

মাইকেল কিছু বলল না। ফারিস আবার ওকে জিজ্ঞেস করল, 'বাইবেল যে ঈশ্বরের কথা বলেছে, তিনি কি করুণা করেন, না করেন না?'

'অবশ্যই করেন। গীতসংহিতা, যাকোব, ইউহোন্না এসব অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে এ বিষয়ে।'

'কিন্তু যিরমিয়তে যে বলা হয়েছে—"আর আমি একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে, আর পিতাদিগকে ও পুত্রদিগকগে একসঙ্গে আছড়াইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন; আমি মমতা করিব না, কৃপা করিব না, করুণা করিব না।"'

'ঈশ্বর তো এটা অপরাধীদের লক্ষ্য করে বলেছেন।'

মাইকেলের কথা শুনে কৈশিক খুশি হলো। দেখে মনে হলো যেন—মাইকেল অনেক কিছু করে ফেলেছে। সে খুশি মনে ফুচকা খেতে লাগল। কিন্তু ফারিস এত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ফারিস আবার মাইকেলকে বলল, 'সৃষ্টিগজগৎ কি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মঙ্গলময়?'

'হ্যাঁ। আদিপুস্তকে ঈশ্বর তো মঙ্গলময় বলেই উল্লেখ করেছেন।'

'কিন্তু আদিপুস্তকের ৬ অধ্যায়ে যে অন্যরকম বক্তব্য পাওয়া যায়। সেখানে ঈশ্বর বলেছেন—"আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা বড়, এবং তাহার

অন্তকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ। তাই সদাপ্রভু পৃথিবীতে মনুষ্যের নির্ম্মাণ প্রযুক্ত অনুশোচনা করিলেন, ও মনঃপীড়া পাইলেন।"'

'ঈশ্বর প্রথমে সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু মানুষের খারাপ কাজ দেখে অসন্তুষ্ট হন।'

'তার মানে ঈশ্বর আগে জানতেন না, মানুষ দুনিয়াতে এসে খারাপ কাজ করবে?'

সারাফ বলল, 'বাইবেলের ঈশ্বর এত দুর্বল!'

এক ফালি হেসে নিয়ে ফারিস বলল, 'শমূয়েলে কী বলা হয়েছে জানিস?'

'কী?'

শমূয়েলের ১৬ অধ্যায়ের ৩৪-৩৫ ভার্সে বলা হয়েছে—"পরে শমূয়েল রামাতে গেলেন, এবং শৌল শৌলের গিবিয়াস্থিত আপন বাটীতে গেলেন। আর মরণ দিন পর্য্যন্ত শমূয়েল শৌলের সহিত আর সাক্ষাৎ করিলেন না। শমূয়েল শৌলের জন্য শোক করিতেন। আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে শৌলকে রাজা করিয়াছেন বলিয়া অনুশোচনা করিতেন।"'

'ঈশ্বর কি কখনো নিজের কাজের জন্যে অনুশোচনা করবেন?'

'বাইবেলের ঈশ্বর করবেন। আর শুধু অনুশোচনাই নয়; বাইবেলের ঈশ্বর তো মানুষের সাথে রেসলিংও করেন।'

'তাই!'

'আদিপুস্তকের ৫০ অধ্যায়ের ২৩-২৮ ভার্সগুলোতে বলা আছে, ঈশ্বর যাকোবের সাথে রেসলিং করেছেন। সারা রাত ধরে। শেষরাতে যাকোব তাঁকে ছেড়ে দেন। যাকোবের ঊরু ভেঙে ঈশ্বর জয়ী হন। এর স্মৃতি ধরে রাখার জন্যে, ঈশ্বর যাকোবের নাম পরিবর্তন করে ইস্রায়েল রাখেন।'

'কী ভয়ানক কথাবার্তা! ঈশ্বর কি কখনো মানুষের সাথে কুস্তি খেলতে পারেন? তাও আবার সারা রাত ধরে! একজন মানুষ কি ঈশ্বরকে সারা রাত আটকে রাখতে পারে? ইস! কী উল্টোপাল্টা কথাবার্তা!'

'বাইবেলে তো ঈশ্বর সম্পর্কে আরও উল্টোপাল্টা কথা আছে।'

'যেমন?'

ফারিস সারাফের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মাইকেলকে বলল, 'ঈশ্বর একবার বনী ইসরাইলদের মিশর থেকে কোথায় যেন নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ঘটনাটা কি তোর জানা আছে? আমি ভুলে গেছি।'

মাইকেল বলল, 'জানব না কেন? ঈশ্বর তাদেরকে মিশর থেকে তাদের অন্য দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এমন জায়গায়, যেখানে দুধ ও মধুর প্রবাহ আছে। কিন্তু বনী-ইসরাইলের অবাধ্যতার কারণে তাদের সেখানে নেননি। ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নেন—বিশ বছরের ওপরে যারা আছে, তারা মরুভূমিতেই মারা যাবে। তাই দুজন ছাড়া সবাই মারা যায়। কেউই সেখানে যেতে পারেনি। ঈশ্বরের সবচেয়ে অনুগত মোশি, হারোণ কিংবা মরিয়মও না। যাত্রাপুস্তক, গণনাপুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণে—এই ঘটনা উল্লেখ আছে।'

'তার মানে শেষমেশ ঈশ্বর তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেননি?'

'ঈশ্বর তো বলেছেন-ই, অবাধ্যতার কারণে তিনি বনী-ইসরাইলের শাস্তি দেন। দুধ ও মধু প্রবাহিত হয় এমন দেশে না নিয়ে, মরুভূমিতে মৃত্যু দেন।'

মাইকেলের উত্তর শুনে আর কেউ খুশি না হলেও, কৈশিক ঠিকই খুশি হলো। তবে খুশিটা কতক্ষণ থাকে, তা-ই দেখার বিষয়। ফারিস মাইকেলকে বলল, 'তুই কি বলতে চাস, ঈশ্বর কথা দেওয়ার আগে জানতেন না, তারা অপরাধ করবে?'

সারাফ এবার বলল, 'বাইবেলের ঈশ্বরের কি তাহলে ভবিষ্যতের জ্ঞান নেই?'

ফারিস বলল, 'চিন্তার বিষয়। বাইবেলের ঈশ্বরকে তো শয়তান পর্যন্ত প্রতারিত করতে পারে।'

ফারিসের প্রশ্ন শুনে মাইকেল কিছুটা খেপে গিয়ে বলল, 'এ কথা বাইবেলের কোথাও নেই।'

'আমি যদি বলি আছে?' ফারিস দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলো।

মাইকেল বলল, 'কোথায় আছে?'

'ইয়োবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একেবারে শুরু থেকে পড়ে দেখ।'

মাইকেল ওর কাছে থাকা বাইবেলটা বের করল। এরপর পড়তে লাগল—'"আর এক দিন ঈশ্বরের পুত্রগণ সদাপ্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে শয়তানও সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপস্থিত হইল। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিলে? শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর করিয়া কহিল, আমি পৃথিবী পর্য্যটন ও তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, আমার দাস ইয়োবের প্রতি কি তোমার মন পড়িয়াছে? কেননা তাহার তুল্য সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বর ভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক পৃথিবীতে কেহই নাই; সে এখনও আপন সিদ্ধতা রক্ষা করিতেছে, যদিও তুমি অকারণে তাহাকে বিনষ্ট করিতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছ।"'

মাইকেল এই পর্যন্ত পড়তেই ফারিস বলল, ‘এই তো! তোদের ঈশ্বর নিজ মুখে স্বীকার করেছেন—শয়তান তাঁকে প্রতারিত দিয়েছে। তাই তিনি ইয়োবের প্রতি অন্যায় করেছেন।’

‘সরি! আমার এ অধ্যায়টা জানা ছিল না।’

‘বাইবেল অনুসারে বিশ্ব কীভাবে হলো, এটা নিশ্চয় জানা আছে?’

‘হ্যাঁ, আছে। প্রথমদিন ঈশ্বর আকাশ, পৃথিবী এবং আলো সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়দিন ঈশ্বর জলকে আলাদা করলেন। তৃতীয়দিন জল ও স্থলকে পৃথক করলেন। জলের নাম সমুদ্র ও স্থলের নাম পৃথিবী রাখলেন। এরপর সকল উদ্ভিদ সৃষ্টি করলেন। চতুর্থদিনে ঈশ্বর সূর্য, চাঁদ ও তারা সৃষ্টি করলেন...।’

‘তার মানে ঈশ্বর আগে উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন—পরে সূর্যের আলো?’

‘হুঁ।’

‘আমরা তো জানি উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্যে সূর্যের আলো প্রয়োজন। তাহলে উদ্ভিদগুলো সূর্যের আলো সৃষ্টির আগে বেঁচে ছিল কীভাবে?’

ফারিসের কথা শুনে মাইকেল কিছুটা হকচকিয়ে গেল। এরপর বলল, ‘এটাই তো ঈশ্বরের ক্ষমতা। তিনি সূর্যের আলো ছাড়াও গাছপালা বাঁচিয়ে রাখতে পারেন।’

ফারিস মুচকি হেসে বলল, ‘হ্যাঁ, তা পারেন। তবে আমার মনে হয় না—বাইবেলের ঈশ্বর সব করতে পারেন?’

মাইকেল মাত্র ফুচকা মুখে দিয়েছে। খেতে খেতে বলল, ‘পারবেন না কেন? তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী।’

‘কিন্তু বাইবেলে যে বলা আছে—লোহার রথ থাকার কারণে ঈশ্বর শক্তিশালীদের হারাতে পারেননি।’

কৈশিক এতক্ষণ চুপই ছিল। এবার বলে উঠল, ‘ঈশ্বর কোথায় এ কথা বলেছেন?’

‘বাইবেলে বলেছেন।’ ফারিস জবাব দিলো।

‘বাইবেলের কোথায়?’

‘বিচারকর্তৃগণ অধ্যায়ে বলেছেন।’

‘দেখাতে পারবি?’

‘কেন না? বাইবেলটা হাতে নে।’

কৈশিক মাইকেলের কাছ থেকে বাইবেলটা হাতে নিলে ফারিস বলল, 'বিচারকর্তৃগণ থেকে প্রথম অধ্যায়ের ১৮-১৯ নম্বর ভার্সগুলো পড়।'

কৈশিক পড়তে লাগল—'"আর যিহূদা ঘসা ও তাহার অঞ্চল, অস্কিলোন ও তাহার অঞ্চল, এবং ইউক্রোণ ও তাহার অঞ্চল হস্তগত করিল। সদাপ্রভু যিহূদার সহবর্তী ছিলেন, সে পর্বতময় দেশের নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিল; কারণ সে তলভূমি-নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিতে পারিল না, কেননা তাহাদের লৌহরথ ছিল।"'

কৈশিক এই পর্যন্ত পড়তেই ফারিস বলল, 'এবার বিশ্বাস হয়েছে তো?'

কৈশিক এ প্রশ্নের কোনও জবাব দিলো না। অবশ্যি জবাব দেওয়ার মতো ওর কাছে কিছু নেইও। ও যে ঈশ্বরের প্রতি ঈমান এনেছে, তিনি লোহার রথ থাকায় তাদের পরাজিত করতে পারেননি। এ কথা সে নিজমুখেই পড়েছে। এখন তার কীই-বা বলার আছে? মাইকেলের দিকে তাকালেও হাসি আসছে। ও খুব কষ্ট করে ফুচকা হজম করছে। ফারিস মাইকেলকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মাইকেল! যিশু কীভাবে দুনিয়াতে এসেছিলেন?'

মাইকেল বলল, 'পাক রূহের শক্তিতে।'

'কিন্তু বাইবেলে তো এও বলা আছে, তিনি পিতার ঔরসে জন্ম নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তাও বলা যায়। কারণ, প্রেরিত অধ্যায়ে বলা হয়েছে—"তিনি ভাববাদী ছিলেন, এবং জানিতেন, ঈশ্বর দিব্যপূর্বক তাহাঁর কাছে এই শপথ করিয়াছেন যে, তাহাঁর ঔরসজাত একজনকে তাহাঁর সিংহাসনে বসাইবেন।"'

ফারিস আবার প্রশ্ন করল, 'যিশুর একটা বিখ্যাত অলৌকিক ঘটনা ছিল না—মাইকেল?'

মাইকেল জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, ছিল। তিনি ৫টা রুটি ও ২টা মাছ দিয়ে ৫০০০ মানুষকে খাইয়েছিলেন।'

'এই অলৌকিক ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল?'

'কোথায় আবার? বৈৎসৈদায়।'

'কিন্তু মার্ক যে লিখেছেন এটা নির্জন স্থানে হয়েছিল?'

'আরে নির্জন স্থানটাই তো বৈৎসৈদা।'

'তার মানে মার্ক এক্সাক্ট জায়গার নাম জানতেন না?'

মাইকেল কোনও জবাব দিলো না। ফারিসের কথাগুলো শুনে বেশ অদ্ভুত

লাগছিল। বাইবেলকে ওরা ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করে। তাহলে ঈশ্বরের বাণীতে এত হেরফের হয় কীভাবে? একজন একটা বললে—অন্যজন আরেকটা বলেন। নাহ, থাক।! এসব ভেবে আমার কাজ নেই। তারচেয়ে ফারিসের কথায় মনোযোগ দিই। ফারিস মাইকেলকে লক্ষ্য করে বলল, 'এই অলৌকিক ঘটনার পর যিশু আর তাঁর শিষ্যরা কোথায় চলে যান?'

মাইকেল বলল, 'মার্কে তো বলাই আছে, তিনি গিনেষরৎ চলে যান।'

'কিন্তু যোহনে যে বলা আছে, তিনি কফরনাহূমেদ দিকে যান?'

মাইকেল হয়তো ভার্সটা জানে, তাই আর শব্দ করল না। কিন্তু নতুন খ্রিষ্টান হওয়া কৈশিক যেন ফারিসের কথাটা মেনে নিতে পারল না। তাই ফারিসের কাছে প্রমাণ চাইলো। ফারিস বলল, 'বাইবেলটা তো তোর কাছেই, মিলিয়ে দেখ না।'

'কোন অধ্যায়ে দেখব?' কৈশিক জিজ্ঞেস করল।

'যোহনের ৬ অধ্যায়ের ১৬ থেকে ২৫ ভার্সগুলো দেখ।'

কৈশিক খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। আমিও উঁকি মেরে দেখলাম। সেখানে স্পষ্ট লেখা—"সন্ধ্যা হইলে তাহাঁর শিষ্যেরা সাগরের তীরে গেলেন। আর নৌকায় উঠিয়া কফরনাহূমে যাইবার জন্য সাগর পার হইতে লাগিলেন।"'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাইকেল বলল, 'যিশু প্রথমে গিনেষরৎ যান, এরপর কফরনাহূমে।'

কৈশিক হয়তো মনে মনে মাইকেলের ব্যাখ্যাটা যৌক্তিক মনে করেছে। তাই কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে। আমিও হয়তো মাইকেলের কথা মেনে নিতাম। কিন্তু ফারিসের কথা শোনার পর ব্যাপারটা আরও ঘোলাটে হয়ে গেল। ফারিস মাইকেলকে বলল, 'যিশুর সময়ে সবাই তো পায়ে হেঁটেই যাত্রা করতেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।' মাইকেল ঝটপট উত্তর দিলো।

'যিশু গিনেষরৎ কী দিয়ে যান?'

'নৌকা দিয়ে।'

'যিশু অলৌকিক কাজটা তিবিরিয়া হ্রদের উত্তর পশ্চিম তীরে দেখান। জায়গাটার নাম ছিল তাবাঘা।'

'হ্যাঁ, সমস্যা কোথায়?'

'সমস্যা তো অন্য জায়গায়। তাবাঘা থেকে দক্ষিণে হলো গিনেষরৎ, আর উত্তরে

কফরনাহূম। তাহলে যিশু কি উত্তরে যান, না দক্ষিণে?'

মাইকেল এবারও প্রশ্নের জবাব দিলো না। কোনও বোকা লোকও তো একবার উত্তরে গিয়ে, আবার ফিরে এসে দক্ষিণে যাবেন না। সেখানে যিশুর মতো অলৌকিক ক্ষমতাধর ব্যক্তি তো—নিশ্চয়ই না। ফারিসের দেওয়া প্রতিটি তথ্য মাইকেলের গায়ে কাঁটার মতো বিঁধছিল। কিন্তু জবাব দিতে না পেরে হজম করে নিচ্ছিল। অবশ্যি ফারিসের উদ্দেশ্য মাইকেলকে পরাজিত করা নয়। ফারিস চায় কৈশিক ও মাইকেল সত্যটা জানুক। কথা বলার সময় ফারিস একবারও ফুচকার দিকে নজর দেয়নি। এবার কিছুটা খেয়ে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা মাইকেল! যিশু তাঁর অলৌকিক কাজগুলো গোপনে করতেন, না প্রকাশ্যে?'

মাইকেল এবারও কিছুটা অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'প্রকাশ্যে। মথি, মার্ক, যোহনের অধ্যায়গুলোতে তা-ই বলা আছে।'

'কিন্তু মথি কিংবা মার্কে তো এর বিপরীত কথাও বলা আছে।'

মাইকেল জবাব দিলো না। হয়তো ও জানে, ফারিস যা বলছে তা ঠিক। তাই আর কথা বলছে না। সারাফ বেশ উৎসুক গলায় বলল, 'মার্ক-যোহনে কী বলা আছে রে?'

ফারিস, কৈশিকের কাছ থেকে বাইবেলটা নিয়ে, সারাফের হাতে দিয়ে বলল, 'কী আছে, তুই পড়ে দেখ।'

'কোথা থেকে পড়ব?'

'মার্কের ৭ অধ্যায়ের ৪১-৪৪ ভার্সগুলো বের কর। একটু জোরে পড়বি।'

সারাফ পড়ল—'"একজন কুষ্ঠ-রোগী তাহাঁর নিকট আসিল, সে নতজানু হইয়া তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বলিল, আপনি যদি চান তবে আমাকে শুচি করিতে পারেন। যিশু করুণাবিশিষ্ট হইলেন, আর হাত বাড়াইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, আমি চাই তুমি শুচি হও। তখনই সে কুষ্ঠ রোগ হইতে মুক্ত হইল এবং শুচি হইল। তখন যিশু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তাহাকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন, দেখ, কাহাকেও কিছু বলিও না।"'

এই পর্যন্ত পড়তেই ফারিস বলল, 'লূকের ৮ অধ্যায়ের ৪০-৪৬ ভার্সগুলো থেকে আরও জানা যায়—একবার এক কিশোরী অচেতন হয়ে যায়। লোকজন ভেবেছিল সে মারা গেছে। তাই কান্নাকাটি করছিল। যিশু সেখানে উপস্থিত হলেন। মেয়েটির ঘর থেকে সবাইকে বের করে দিলেন। এরপর তাকে সুস্থ করেন। তিনি এই ঘটনা গোপন রাখার কড়া নির্দেশ দেন।'

ফারিসের কথাগুলো শুনে মাইকেল কিছুটা জবুথবু হয়ে গেল। ফারিসকে কিছু বলতেও পারছে না, আবার ওর নতুন শিষ্যকে খুশিও করতে পারছে না। এ যেন

শাঁখের করাত। ফুচকার প্লেটটা সম্পূর্ণ খালি করে ফারিস বলল, ‘যিশু তো তাওরাত বাতিল করতে এসেছিলেন, তাই না?’

ফারিসের প্রশ্ন শুনে মাইকেল কিছুটা প্রসন্ন হলো। এরপর বলল, ‘তুই কি পাগল হয়েছিস? যিশু নিজ মুখে বলেছেন, তিনি তৌরাত সংরক্ষণ করতে এসেছেন। বাতিল করতে আসেননি।’

‘কিন্তু পল যে অন্য কথা বলেছেন?’

মাইকেল কিছু বলতে যাবে, কিন্তু সারাফের জন্যে আর কিছু বলতে পারল না। মাইকেল কিছু বলার আগেই ও বলে উঠল, ‘ফারিস! আমাকে অধ্যায় বল, আমি পড়ে শুনাই।’

ফারিস বলল, ‘থাক না।’

কৈশিক বলে উঠল, ‘থাকবে কেন? নাকি ধরা পড়ার ভয়ে বলতে চাচ্ছিস না?’

‘কে ভয় পাচ্ছে, তা পরে দেখা যাবে। সারাফ! জলদি ইফিষীয় এর দ্বিতীয় অধ্যায় খুল। খুলে ১৪ ভার্স থেকে পড়।’

সারাফ অধ্যায়টা বের করে পড়তে লাগল—“তিনিই আমাদের শান্তি; তিনি উভয়কে এক করিয়াছেন; যাহা শত্রুতাস্বরূপ ছিল, সে মধ্যবর্ত্তী প্রাচীর তিনি নিজ দেহে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, বিধিবদ্ধ আজ্ঞাকলাপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়াছেন।”

সারাফ এই পর্যন্ত পড়তেই ফারিস বলল, ‘এবার ইব্রীয়ের ৭ অধ্যায়টা বের কর। বের করে ১৮ ভার্স থেকে পড়।’

সারাফ আবার পড়তে লাগল—“পূর্ব্বকালীন নির্দ্দেশ হীনবল ও নিষ্ফল হওয়াতে তাহা বাতিল করা হইয়াছে, কারণ বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা কিছুই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই; কিন্তু এমন এক শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, যাহা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পারি।”

সারাফের পড়া শেষ হলেই মাইকেল বলল, ‘এটা তো সেন্ট পলের বক্তব্য।’

ফারিস বলল, ‘হ্যাঁ, সেন্ট পলের বক্তব্য। যেটা তোদের বাইবেলেই আছে। যেটাকে তোরা ঈশ্বরের বাণী মনে করিস।’

ভার্সিটির মসজিদে মাগরিবের আজান শোনা গেল। আজান শেষ হলে মাইকেল বলল, ‘তোরা নামাজে যা। অন্যদিন কথা হবে তাহলে।’

তথ্যসূত্র :

♦ ১) যাকোব, ৫/১১।
♦ ২) গীতসংহিতা, ১৫৪/৯।
♦ ৩) যিরমিয়, ১৩/১৪।
♦ ৪) আদিপুস্তক, ১/৩১, ৬/৫-৬।
♦ ৫) মথি, ১/১৬, ৫/১৭-২০।
♦ ৬) প্রেরিত, ২/৩০।
♦ ৭) ইয়োব, ২/১-৩।
♦ ৮) লূক, ৯/১০-১১, ৮/৪০-৪৬।
♦ ৯) মার্ক, ৬/৪৫, ৭/৪১-৪৪।
♦ ১০) ইফিষীয়, ২/১৪-১৫।
♦ ১১) ইব্রীয়, ৭/১৮-১৯।
♦ ১২) বিচারকর্ত্তৃগণ, ১/১৮-১৯
♦ ১৩) যোহন, ৬/১৬-২৫।
♦ ১৪) ইউহোন্না, ৪/১৬।
♦ ১৫) শমূয়েলের ১৬/৩৪-৩৫।
♦ ১৬) যাত্রাপুস্তক, ৩/১৭, ১৩/৫, ৩৩/৩
♦ ১৭) গণনাপুস্তক, ১৩/২৭
♦ ১৮) দ্বিতীয় বিবরণ, ৫/৩, ২৬/৯, ২৭/৩।

রোজনামচা

[এক]

'আসসালামু আলাইকুম!'

'ওয়ালাইকুমুস সালাম।'

'মেসের দিকে একটু আসবি?'

ফারিসের কণ্ঠই বলে দিচ্ছে—ও অসুস্থ। ফোন পেয়ে বিলম্ব না করে রওনা দিলাম। বাসার নিচে নেমে দেখি রিকশা নেই। যত রিকশা সামনে দিয়ে যাচ্ছে সব ভর্তি। একটিও খালি নেই। মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু রিকশার কোনও পাত্তা নেই। কিছু কিছু সময় আছে, যখন মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। কী করবে, না করবে, বুঝে উঠতে পারে না। আমিও তেমন অবস্থার মধ্যেই আছি। ফারিসের মেস এখান থেকে অনেক দূর। রিকশায় গেলে আধঘণ্টা লাগবে। হেঁটে গেলে কম করে হলেও ঘণ্টা খানেক লাগবে। কী করা যায়?

মনে মনে যখন এই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল, তখন একটা রিকশা পাওয়া গেল। মরুভূমিতে হারানো উট ফিরে পেলে যেমন আনন্দবোধ হয়, আমারো তেমন বোধ হচ্ছিল। রিকশাওয়ালাকে আমি চিৎকার দিয়ে ডাকলাম। বেশ জোরে। এমন জোরে, যেন কী না-কী হয়েছে! কয়েকজন তো আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল।

তারা যা ভাবার ভাবুক, আমার কোনও পরোয়া নেই। যত দ্রুত সম্ভব ফারিসের কাছে পৌঁছতে হবে। রিকশাওয়ালা আমার ডাক শুনে কাছে এল। তড়িঘড়ি করে রিকশায় উঠে পড়লাম। রিকশাওয়ালা বলল, 'মামা, কই যাবেন?'

'কই যাব সেটা পরে বলছি। তুমি সোজা চালাতে থাকো।'

রিকশা চলতে শুরু করল। আজ কয়েক মিনিট কয়েক ঘণ্টার মতো মনে হচ্ছে। সময় ফুরোতেই চাচ্ছে না। অন্তরে পেরেশানি কাজ করলে এমনই হয়। বার বার ফারিসের কথা মনে হচ্ছিল। ওর মনে হয় খুব অসুখ করেছে। হয়তো রাতে ঠিকমতো খায়নি, তাই পেটে গ্যাস করেছে। নয়তো কাল বৃষ্টিতে ভিজেছে, তাই জ্বর করেছে। নতুবা রাত জেগে বই পড়েছে, তাই মাথা ধরেছে। মনের মধ্যে এসব চিন্তা ঢেউ খেলছিল। হঠাৎ

রিকশার চেইন পড়ে গেল। রিকশাওয়ালা চেইন উঠিয়ে আবার চালাতে শুরু করল। আমি ঘড়ি দেখলাম। প্রায় পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে। অর্ধেক চলে এসেছি মনে হয়।

ও মা! কী আশ্চর্য! অর্ধেক কোথায়? অর্ধেকের অর্ধেকও আসিনি। রাস্তার মোড়টা পেরিয়েছি মাত্র। রিকশা খুব ধীরে চলছিল। আমি যতই বলি দ্রুত চালানোর কথা, ততই যেন স্লো হয়ে যায়। তারপর আবার চেইন পড়ার ঝামেলা। মনে হয় আল্লাহ ﷻ আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন।

এই নিয়ে আট বার চেইন পড়ল। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছে যেন রিকশাওয়ালাকে এক-ঘা বসিয়ে দিই। কোনওরকমে নিজের রাগ দমন করে বললাম, 'মামা, একটু দ্রুত চালাও।'

আমার কথা শুনে রিকশার গতি আরও স্লো হয়ে গেল। রিকশাওয়ালা পকেট থেকে বিড়ি বের করল। এরপর মনের সুখে টানতে লাগল। রাগের মাত্রাটা এখন চরম পর্যায়ে। বিড়ির গন্ধে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। একটা ধমক দেওয়ার পর বিড়ি টানা বন্ধ হলো।

আধঘণ্টার রাস্তা পয়তাল্লিশ মিনিট লাগল। সব ওই রিকশাচালকের দোষ। ব্যাটার কারণেই এতটা সময় নষ্ট হয়েছে। মনে হচ্ছে একটা ঘুষি মেরে এর বদলা নিই। নাহ! কাজটা তেমন ভালো দেখায় না। এমনিতেই অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে, আর না। দ্রুত আপদটার থেকে বিদায় নেওয়াই ভালো।

হায় হায়! এ কী? আমি তো মানিব্যাগ আনতে ভুলে গেছি! এখন কী হবে? এমনিতেই চালকটা একটু খাটাশ প্রকৃতির! এখন যদি মানিব্যাগ ফেলে আসার কথা বলি, তাহলে তো ও খেপে যাবে। আল্লাহর নাম নিয়ে বলেই ফেললাম, 'সরি মামা, মানিব্যাগটা বাসায় ফেলে এসেছি। বের হওয়ার সময় মনে ছিল না।'

আমার কথা শুনে লোকটা এমনভাবে তাকাল, যেন তার শরীরে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কিছুটা কটু গলায় বলল, 'ট্যাহা নাই, তাইলে রিকশায় উটছুইন ক্যা? হাইট্রা আইবার পাইলেন না?'

আমি বার বার বলছি মানিব্যাগ ভুলে ফেলে এসেছি, সে কোনওভাবেই কথা বুঝতে চাইছে না। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি টাকা এনে দিচ্ছি।'

'না, না। এইসব কইলে অইবো না। আমার ট্যাহা দেন। অক্কন দ্যান।'

কিছু কিছু লোক আছে যাদের একটা রগ জন্ম থেকেই ত্যাড়া থাকে। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েও সোজা করা দায়। এই লোকটাকেও ঠিক তেমনই মনে হচ্ছে। কীভাবে যে

আপদটার থেকে বাঁচা যায়? মাথায় একটা বুদ্ধি এল। মানিব্যাগ ফেলে এসেছি তো কী হয়েছে, মোবাইল তো আর ফেলে আসিনি। বিকাশে টাকাও আছে। মানি ট্রান্সফার করে দিলেই হয়। কিন্তু যে ঘাড়ত্যাড়া প্রকৃতির লোক, আমার কথা মানবে কি না কে জানে?

সাহস করে বলে ফেললাম, 'মামা, বিকাশে টাকা আছে। আপনার নম্বরে ভাড়াটা পে করে দিই?'

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, যেন তার রিকশাটা চেয়ে বসেছি। ধমকের সুরে জবাব দিলো, 'দ্যান। যত্তসব বিটখুইট্টা কারবার।'

[দুই]

ফারিসের কাছে পৌঁছে দেখি ও বিছানায় শুয়ে আছে। মাথায় জলপট্টি লাগানো। গায়ে কাঁথা। ওর যে জ্বর করেছে, তা বুঝতে আর বাকি রইল না। আমি কাছে যেতেই বলল, 'এত দেরি করলি যে? রিকশা পেতে দেরি হয়েছে নিশ্চয়?'

'তুই তো বাইরে যাসনি, বুঝলি কীভাবে?'

'আজ পহেলা ফাল্গুন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তো?'

'পহেলা ফাল্গুনে রিকশা পেতে কষ্ট হবে না? পেয়েছিস, এটাই তোর ভাগ্য।'

ফারিসের কথা শুনে আমার টনক নড়ে উঠল। পহেলা ফাল্গুনে রিকশা পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। এ সময় রিকশার অত্যধিক স্বল্পতা দেখা দেয়। সব রিকশা চলে যায় কপোত-কপোতীদের দখলে।

'খেয়েছিস কিছু?'

'হুঁ।' ফারিস উত্তর দিলো।

'কী?'

'চা।'

'চা! জ্বর নিয়ে কেউ চা খায়?'

'তা জানি না। আমি খাই।'

'সত্যিই বাপু, তোকে নিয়ে পারা দায়। কাল বৃষ্টিতে ভিজেছিলি?'

'হুঁ।'

'তোকে কত করে বলি, একটু সাবধানে চলতে। আমার কথা তো একটুও শুনিস না। কেন তোকে বৃষ্টিতে ভিজতে হলো?'

'বলব না।'

'না বললে আমি চলে যাব।'

'সত্যিই?'

'এই গেলাম।'

আমি বিছানা থেকে উঠতে যাব, এমন সময় ফারিস আমার হাত ধরে বলল, 'বলছি তো। বস না। এত অল্পতেই রেগে গেলে চলে?'

আমি বসলাম। ফারিস বলল, 'তামজিদের কথা মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। আমাদের ক্লাসমেট। মনে থাকবে না কেন?'

'ওর একটা সমস্যা আছে—জানিস?'

'হ্যাঁ, জানি। শ্বাসকষ্ট। জানব না কেন।'

'কাল যখন বৃষ্টি শুরু হলো, তখন ও আমাকে ফোন করল। কথা শুনেই বুঝলাম শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেছে। ফোনে জানাল তার ইনহেলার শেষ। এই মুহূর্তে না নিতে পারলে মারাত্মক সমস্যা হবে। এখন আমি কি না-যেয়ে পারি, বল? বন্ধুকে তো এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না।'

'নিশ্চয়ই হেঁটে হেঁটে ওর মেসে গিয়েছিলি?'

'হুঁ। রিকশা পাইনি, কী করব? জানিস তো, বৃষ্টির দিনে রিকশা হলো অমাবস্যার চাঁদ। দেরি করলেও সমস্যা। তাই হেঁটেই রওনা দিয়েছি। যে ছাতাটা সঙ্গে ছিল, সেটা বৃষ্টির তীব্রতার কাছে হার মেনেছে।'

ফারিসের প্রতি যা রাগ ছিল, নিমেষেই তা ভালোবাসায় পরিণত হলো। সত্যিই, ওর মতো ছেলে লাখে একটা পাওয়া দায়। নয়তো কেউ বৃষ্টিতে ভিজে বন্ধুর উপকার করতে চলে যায়? আমি বললাম, 'মাথায় পানি দিবি?'

'না। এইমাত্র দিয়েছি।'

'ওষুধ খেয়েছিস?'

'হুঁ।'

'আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।'

'না। আমার পাশে বসে থাক।'

'বসে থাকার জন্যেই ডেকেছিস?'

'তা জানি না, তবে বসে থাক। প্রিয় মানুষ কাছে থাকলে অসুখ অর্ধেক কমে যায়।'

আমি ওর পাশে বসে রইলাম। কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে অস্বস্তিকর অবস্থা আর নেই। ফারিস বলল, 'এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগবে না। তার চেয়ে বরং একটা কাজ কর।'

'কী?'

'ওই যে বুক শেলফ দেখছিস, ওখানে একটা ডায়রি আছে। ওইটা আন।'

আমি ডায়রিটা এনে দিলাম। ফারিস বলল, 'এই ডায়রিটার কথা মনে আছে?'

'হুম। প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় তুই যেদিন ফার্স্ট হলি, সেদিন তোকে এটা গিফট করেছিলাম।'

'ডায়রিটা দেওয়ার সময় তুই একটা কথা বলেছিলি, মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। আমি বলেছিলাম, এই ডায়রিতে তুই নাস্তিকদের নিয়ে কিছু লিখবি।'

'আমি কিন্তু তোর কথা রেখেছি।'

'সত্যিই!'

'এই নে।'

আমি ডায়রিটা হাতে নিলাম। এরপর বললাম, 'তুই একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর। এই সুযোগে কী লিখেছিস, তা দেখে ফেলি।'

ফারিস গায়ের কাঁথাটা নাক পর্যন্ত টেনে চোখ বন্ধ করে রইল। সত্যিই ঘুমালো কি না, কে জানে? আমি ডায়রিটা খুলে পড়তে লাগলাম। ডায়রির প্রথম পাতায় লেখা আছে...

> ডায়রিটা আমার জীবনের মূল্যবান উপহারগুলোর একটি। অবশ্য মূল্যবান এই জন্যে না যে, এটার দাম কয়েক শ ডলারের কাছাকাছি। মূল্যবান এই জন্যে যে, এটি আমার সবথেকে কাছের একজন মানুষের দেওয়া উপহার।
>
> ফারিস
>
> পহেলা মুহাররম, ১৪৩৭ হিজরি।

এর পরের পাতাটা খালি। তারপর থেকে আবার শুরু...

আজ প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির টাপুর টুপুর শব্দটা হৃদয়কে আলোড়িত করছে। বৃষ্টির দিনে একা থাকলে নাকি প্রিয় মানুষের কথা স্মরণ হয়। আমারও একজনের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে এমন একজনের কথা, যিনি আমার জন্যে তাঁর অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন। যিনি না দেখেও আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। যিনি ব্যাকুল হয়ে আমাকে দেখতে চেয়েছেন। যিনি আমাকে ভালোবেসে তাঁর ভাই বলে সম্বোধন করেছেন।[১]

আজ সে মানুষটার কথা মনে পড়ছে। বড্ড বেশি মনে পড়ছে। তাঁকে নিয়ে কিছু লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু তিনি এমন মানুষ যে, খাতা-কলমে তাঁর বর্ণনা ফুটিয়ে তোলা, আমার পক্ষে অসম্ভব। সে ক্ষমতা আমার নেই। তাঁর মর্যাদা আকাশ ও জমিনের চেয়েও বেশি। আমি চুনোপুঁটি মাত্র। নিয়ত করেছি তাঁকে নিয়ে একটু ভূমিকা লিখব। ভূমিকাটি হয়তো অনেক বড় হতে পারে। হোক না, তাতে কী? তাঁকে নিয়ে কিছু লিখতে পারাটাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

ভূমিকা : ১

তাঁর শৈশব সম্পর্কে বিস্তারিত লিখব না। লিখলে ভূমিকা আরও বড় হয়ে যাবে। যৌবনকাল থেকে লিখব। তবে তাঁর জন্মের সময়ের একটি ঘটনা না লিখে থাকতে পারছি না। ঘটনাটি বেশ বিস্ময়কর, তাই বলতে চাচ্ছি। তিনি যখন জন্ম নিলেন, তখন কিসরার রাজপ্রাসাদের চৌদ্দটি পিলার ধসে পড়ল। অগ্নি-উপাসকদের অগ্নি নিভে গেল। বোহায়রা পাদরির কূপ শুকিয়ে গেল।[২] এটুকুই তাঁর শৈশবের কথা। এর বেশি লিখব না।

তাঁর বয়স যখন চল্লিশ, সে সময়ের কথা। সত্যের সন্ধানে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন। প্রতিনিয়ত ধ্যান করে যাচ্ছেন। সত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। রাতের অন্ধকারে স্রষ্টার কাছে সত্যের দিশা চাচ্ছেন। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। একদিন হঠাৎ স্বর্গীয় দূত এলেন, স্রষ্টার পক্ষ থেকে সত্যের বার্তা নিয়ে। তাঁকে সত্যের বার্তাবাহক হিসেবে মনোনীত করা হলো। নবুয়ত প্রদান করা হলো। হেরা গুহাতেই সত্যের দেখা পেলেন। সত্যের মিশন এখান থেকেই শুরু।

সত্যের মিশনে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। অপমানিত হয়েছেন। লাঞ্ছিত হয়েছেন। ভর্ৎসনার শিকার হয়েছেন। কখনো আপোষ করেননি। ভীত

হননি। পদচ্যুত হননি। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সত্যকে আঁকড়ে ধরেছেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে সত্যের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। সত্যের ভয়ে ভীত হয়ে, মিথ্যার অনুসারীরা তাঁকে লোভনীয় প্রস্তাব দিতে লাগল।

তারা বলল, 'যদি ধন-সম্পদ চাও তবে বলো, সকলের চাইতে তোমাকে অধিক সম্পদশালী করে দেবো। যদি রাজত্ব চাও তো বলো, তোমাকে আমাদের নেতা করে দেবো। যদি সুন্দরী নারী চাও তবে বলো, রাজ্যের সবথেকে সুন্দরী নারী তোমার কাছে এনে হাজির করব। শুধু একটা শর্ত মেনে নাও। একটি শর্ত। তুমি যা প্রচার করছ, তা থেকে বিরত থাকো।'

যাকে সত্যের দিশারি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে, তিনি কীভাবে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারেন? সত্যের আহ্বান বন্ধ করে দিতে পারেন? নিজেকে ক্ষমতার কাছে বিক্রি করে দিতে পারেন?

তাই তো বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, 'তোমরা যা বলেছ, তার কোনওটিই আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমি যে বিষয়টি নিয়ে এসেছি, তা দ্বারা তোমাদের ধন-সম্পদ লাভ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমাদের মধ্যে সম্মানজনক পদ লাভ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। রাজত্বও আমি চাই না। আমার এক হাতে চন্দ্র, আর এক হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি এ সত্য প্রচার থেকে বিরত হব না।'[৩]

সত্যের দাওয়াত নিয়ে তিনি তায়েফে গেলেন। ভাবলেন, কেউ না-কেউ নিশ্চয়ই দাওয়াত কবুল করবে। কিন্তু কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিলো না। তাঁকে পাত্তা দিলো না। উল্টো অপমান করতে লাগল। পাগল বলে উপহাস করতে লাগল। গালাগাল করতে লাগল। দুষ্ট ছেলেরা পাথর হাতে রাস্তার দু-পাশে দাঁড়িয়ে গেল। তাঁর ওপর পাথরবৃষ্টি বর্ষিত হতে শুরু করল। পবিত্র দেহ ক্ষতবিক্ষত হলো। মাথার কয়েক জায়গায় কেটে গেল। দু-পা রক্তাক্ত হয়ে জুতার সাথে আটকে গেল। অসহায় অবস্থায় তিনি একটি বাগানে আশ্রয় নিলেন।

কিছুক্ষণ পর স্বর্গীয় দূত এলেন। তবে আজ একা আসেননি। পাহাড়ের ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে এসেছেন। ফেরেশতারা তাঁকে সালাম জানালেন। এরপর বললেন, 'আপনি যদি চান, তবে আমরা তায়েফবাসীকে দু-পাহাড়ের মধ্যে পিষে ফেলব।'

তাঁর অবস্থানে অন্য কেউ হলে তায়েফবাসীকে ধ্বংস করে দিতে বলতেন। তিনি তা করলেন না। ফেরেশতাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। সব কষ্ট ভুলে গেলেন। যারা তাঁকে রক্তাক্ত করেছিল, তাঁদের ক্ষমা করে দিলেন। তাঁদের জন্যে চোখের পানি ফেললেন। হিদায়াতের জন্যে দোআ করলেন। তিনি বললেন, 'আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'য়ালা ওদের বংশধরদের মধ্যে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।'[৪]

জিহাদ ব্যতীত তিনি কাউকেই স্বহস্তে আঘাত করেননি। ব্যক্তিগত কারণে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। যদি কেউ আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করত, তাহলে তিনি বদলা নিতেন। তবে ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর জন্যে নয়; আল্লাহকে খুশি করার জন্যে।[৫] একবার প্রতিপালক তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মক্কাভূমির সবটাই স্বর্ণে পরিণত করে দিলে তিনি খুশি হবেন কি না।

উত্তরে তিনি বললেন, 'না, তা করার দরকার নেই। আমি বরং একদিন তৃপ্তির সাথে আহার করব এবং একদিন উপোস থাকব। আমি তাতেই সন্তুষ্ট। যখন উপোস থাকব—তখন বিনয়-সহকারে কান্নাকাটি করব। আপনার দরবারে দোয়া করব। আপনাকে স্মরণ করব। আর যখন তৃপ্তির সাথে আহার করব—তখন আপনার প্রশংসা করব। শোকর আদায় করব।'[৬]

তিনি কখনো দুনিয়ার চাকচিক্য কামনা করেননি। ধন-সম্পদ কামনা করেননি। উঁচু উঁচু দালানকোঠা নির্মাণ করেননি। একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করেছেন। সাদামটা পোশাক পরিধান করেছেন। তিনি বলতেন—'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকিনরূপে জীবিত রাখো, মিসকিনরূপে মৃত্যুদান করো এবং মিসকিনদের দলভুক্ত করে হাশরের ময়দানে উত্থিত করো।'[৭]

ফারিস

১২ই সফর, ১৪৩৭ হিজরি।

এরপর বেশ ক-পাতা খালি। তারপর একটি কবিতা লেখা। ফারিস যে এত সুন্দর কবিতা লিখতে পারে—আমার জানা ছিল না। অবশ্যি ওর মতো মেধাবীরা সবই পারে। পারবে না কেন? মেধাবীরা তাদের মস্তিষ্ককে কাজে লাগায়। তাই পারে। কবিতাটা

এমন...

এসেছিলেন এক মহাপুরুষ এই অবনির পরে,
জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন যিনি মানবতার তরে।
সত্যের পথে আহ্বান যবে শুরু করলেন মক্কায়,
জুলুম-নিপীড়ন নেমে এল তখন অতীব মাত্রায়।
আলোকবর্তিকা হাতে পাঠানো হয়েছে যাকে,
জুলুমের পাহাড় কীরূপে অবরুদ্ধ করবে তাঁকে?
অবিশ্বাসের দেয়ালে হানলেন আঘাত বারংবার,
মিথ্যা দাম্ভিকতা যত ভেঙে হলো চুরমার।
দীর্ঘ ত্যাগ আর সাধনার পর হলেন তিনি জয়ী,
শত্রুকে মার্জনা করলেন, হলেন বিনিয়ী।
সত্যের আলোক জ্বালালেন তিনি মরুর প্রান্তরে,
সে আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে গেল দিগ্‌দিগন্তরে।

কবিতাটার পর আবার শুরু...

ভূমিকা : ২

৫ম হিজরির শাওয়াল মাস। তিনি যখন মদীনার রাষ্ট্রপ্রধান—সে সময়ের কথা। হঠাৎ শত্রুবাহিনী মদীনা আক্রমণ করল। শত্রুকে প্রতিরোধ করতে তিনি ও তাঁর সাহাবারা প্রস্তুতি নিলেন। শুরু হলো পরিখা খননের কাজ। শীতের রাত। কনকনে ঠাণ্ডা। যারা পরিখা খনন করছেন তাঁদের গায়ে ভালো শীতের কাপড় নেই। এমন কোনও দাস-দাসীও নেই—যারা তাঁদের সহায়তা করবে। তাই তিনি ও তাঁর সাহাবারা মিলে পরিখা খনন করতে লাগলেন। রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও তিনি নিজ কাঁধে মাটি বহন করতে লাগলেন। তাঁর দেহ ধুলোয় ধূসরিত হলো। মাটির আবরণে চামড়া ঢেকে গেল। শরীরের ছেঁড়া জামা বালুময় হয়ে গেল।

যারা পরিখা খনন করছিলেন, তাঁদের পেটে ছিল প্রচণ্ড খিদে। ভালো খাবার জোটেনি বেশ কদিন হলো। এক আঁজলা যব আর দুর্গন্ধযুক্ত চর্বি ছাড়া কিছুই খাননি তাঁরা। পেটের সাথে পিঠ লেগে গেছে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় পিঠ যাতে কুঁজো

হয়ে না যায়, পাথরের ঠান্ডা ক্ষুধার্ত পেটকে যেন শীতল করে, সে জন্যে পাথর বেঁধেছেন কেউ কেউ। আবু তালহা ﷺ ছিলেন তাদেরই একজন। আবু তালহা ﷺ তাঁর নিকট এলেন। পাথরবাঁধা পেটটা তাঁর সামনে মেলে ধরলেন। স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান তখন তাঁর পেট দেখালেন। সাহাবারা দেখতে পেল, তাঁর পেটে দুটি পাথর বাঁধা। এ অবস্থাতেই তিনি মাটি বহন করেছেন। পরিখা খনন করছেন। অথচ তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁর হাতে ছিল সমগ্র মদীনার শাসনক্ষমতা।[৮]

সুবহানাল্লাহ! আছেন কোনও রাষ্ট্রপ্রধান, যিনি তাঁর সমকক্ষ হতে পারবেন? আছেন কোনও নেতা, যিনি তাঁর মতো দুনিয়াবিমুখ হতে পারবেন? আছেন কোনও রাজা, যিনি তাঁর মতো নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবেন?

মাঝে মাঝে তাঁর সাথিদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, দুর্গন্ধযুক্ত চর্বি আর যব পর্যন্ত মেলাতে পারেননি। কেবল হুবলা ও সমর গাছের পাতা খেয়ে তাঁরা যুদ্ধ করেছেন। পাতা খাওয়ার কারণে তাঁদের চোয়ালে ঘা হয়ে হয়েছে। তাঁরা বকরির মতো মলত্যাগ করেছেন।[৯]

একটু চিন্তা করুন তো! বিশ্বের এমন কোনও সেনাবাহিনী কি আপনি খুঁজে পাবেন—যারা না খেয়ে দিনের পর দিন যুদ্ধ করে? অথবা গাছের পাতা খেয়ে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করে? কিংবা দুনিয়াবী উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল পারলৌকিক উদ্দেশ্যে জীবন বিলিয়ে দেয়? পেলে জানাবেন। অবশ্যই জানাবেন।

এবার তাঁর কথায় ফিরে আসি। তিনি এমন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, যাকে ভালোবেসে সবাই জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল। তিনি ওযু করলে—সে পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যেত। তাঁর থুতু কোনও সাহাবির হাতে পড়লে—সাহাবি তা মুখে আর গায়ে মেখে নিতেন। তাঁর সামনে সাহাবিরা কখনো উঁচু স্বরে কথা বলতেন না। তাঁর দিকে কেউ চোখ তুলেও তাকাতেন না। তিনি যদি কোনও নির্দেশ দিতেন, তাহলে তা পালনের জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত।[১০]

তিনি যদি তাঁর সাথিদের বলতেন, সোনার প্রাসাদ বানিয়ে দিতে, তাঁরা তা-ই করতেন। তিনি তা চাননি। কক্ষনো চাননি। আট-দশটা রাজা-বাদশাহর মতো রাজত্ব চাননি। বিলাসিতা চাননি। চাকচিক্য চাননি। চেয়েছেন মানবতার মুক্তি। সত্যের বিজয়।

তিনি এমন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, যার শত শত দেহরক্ষী ছিল না। ঘরে

মণিমুক্তার ছড়াছড়ি ছিল না। শরীরে রেশমের দামি কাপড় ছিল না। তাঁর ঘরে দামি দামি ফলমূল সাজিয়ে রাখা হতো না। তাঁর মাথায় মুকুটও ছিল না। অথচ সে সময়ের রাজা-বাদশাহদের ক্ষেত্রে এগুলো ছিল মামুলি বিষয়।

একবার তিনি সফরে ছিলেন। সে সময় একটি বকরি জবাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁর সাথিদের একজন বললেন, 'জবাই করার দায়িত্ব আমার।' আরেকজন বললেন, 'চামড়া ছাড়ানোর দায়িত্ব আমার।' অন্যজন বললেন, 'রান্নার দায়িত্ব আমার।'

তখন তিনি বললেন, 'কাঠ সংগ্রহের দায়িত্ব আমার।'

তাঁর সাথিরা বললেন, 'আমরা আপনার কাজ করে দেবো।'

তিনি বললেন, 'আমি জানি, তোমরা আমার কাজ করে দেবে। কিন্তু আমি তোমাদের চাইতে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করতে চাই না। কেননা, বান্দাহ তার আচরণে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে নিজেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মনে করবে, আল্লাহ তা পছন্দ করে না।'[১১]

ছোট্ট একটি প্রাসাদ ছিল তাঁর। যার ছাদ ছিল খেজুর পাতার তৈরি। যার দেয়াল ছিল মাটির তৈরি। কোনওমতে দুজন ঘুমানো যেত। সে প্রাসাদে ছিল না দামি খাট। ছিল না নরম তোশকের ছড়াছড়ি। নরম বিছানায় ঘুমাননি তিনি কোনওদিন। দামি খাটেও না। মাটিতে ঘুমাতেন। মাটিই ছিল তাঁর বিছানা। একটিমাত্র তোশক ছিল তাঁর। অবশ্যি সেটাও নরম তুলোর তৈরি নয়। সেটা ছিল আলখাল্লার মতো উটের কম্বলের তৈরি।[১২]

কোনও এক আনসার মহিলা তাঁর জন্যে উলভর্তি একটি তোশক পাঠাল। তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী সেটা গ্রহণ করলেন। তিনি যখন বাড়িতে এসে কম্বলটি দেখলেন—তখন বললেন, 'এটি ফেরত পাঠিয়ে দাও।'

তাঁর স্ত্রী চাচ্ছিলেন কম্বলটা রেখে দিতে। কিন্তু তিনি কোনওভাবেই রাজি হননি। অনেক অনুরোধ করার পরও রাজি হননি। তিনি বলেছেন, 'আয়িশা! এটি ফেরত দিয়ে দাও। আল্লাহর শপথ! আমি চাইলে আল্লাহ তা'য়ালা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাহাড়কে আমার সাথে চলমান করে দিতেন।'

তাঁর কথা শুনে আয়িশা ﷺ সে কম্বলকে ফেরত পাঠালেন।[১৩]

সাহাবি আনাস ইবনু মালিক ﷺ একদিন তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আনাস দেখতে পেলেন—তিনি খেজুর গাছের আঁশভর্তি একটি চামড়ার বিছানায়

শুয়ে আছেন। মাথার নিচে খেজুরের আঁশের বালিশ। কিছুক্ষণ পর উমার ﷺ প্রবেশ করলেন। উমারকে ﷺ দেখে তিনি একপাশে ফিরলেন। উমার ﷺ তাঁর পিঠে বিছানার দাগ দেখতে পেলেন। বিছানার মধ্যে চাদর না থাকায় শরীরে দাগ পড়ে গেছে। এ দৃশ্য দেখে উমার ﷺ কাঁদতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'উমার! কাঁদছ কেন?'

উমার ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি জানি, খসরু ও সিজারের তুলনায় আল্লাহর নিকট আপনি অধিক সম্মানিত। তারা দুনিয়ার প্রাচুর্যে ডুবে আছে। আর আপনি আল্লাহর রাসূল হয়েও যে অবস্থায় আছেন, তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। আমি এই জন্যে কাঁদছি।'

তিনি বললেন, '(উমার)! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও—তাদের জন্যে দুনিয়া, আর আমাদের জন্যে আখিরাত?'

উমার ﷺ বললেন, 'কেন নয়? অবশ্যই আমি তাতে সন্তুষ্ট।'

তিনি বললেন, 'তাহলে বিষয়টি এমনই।'[১৪] তিনি এমন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, যার ঘরের উনুনে আগুন জ্বলেনি। কয়েকদিন, কয়েক সপ্তাহ নয়, মাসের পর মাস। শুধু খুরমা ও পানি খেয়েই তিনি ও তাঁর পরিবার দিনযাপন করতেন।[১৫] মাঝে মাঝে খেজুর হতো তাঁর খাদ্যসামগ্রী। দামি খেজুর নয়, নিতান্তই সাধারণ মানের খেজুর। পর পর অনেক রাত তিনি অভুক্ত থাকতেন। পেটে খিদে নিয়ে বিছানার পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন। ক্ষুধার যন্ত্রণায় ন্যুব্জ হয়ে যেতেন। টানা তিন দিনও তিনি অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। ঘরে খাবার ছিল না—তাই।[১৬]

তিনি নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে—'আমাকে আল্লাহর পথে এমনভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, যা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। আমাদের ত্রিশটি রাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে, যখন বিলালের বগলের নিচে লুকিয়ে রাখা সামান্য খাদ্য ছাড়া, আমার ও বিলালের আহারের কিছুই ছিল না।'[১৭]

ফারিস

১৫ই সফর, ১৪৩৭ হিজরি।

পরের পাতায় একটি আরবি ক্যালিগ্রাফি আঁকা। আরবি ভালো বুঝি না বলে ক্যালিগ্রাফিটা কী নিয়ে ছিল, অনুমান করতে পারিনি। প্রথম অক্ষরটা 'মিম' তারপরের অক্ষরটা মনে নয় 'হা' কিন্তু তারপর যে কী লেখা আছে—বুঝতে পারছি না। ফারিসকে

জিজ্ঞাসা করলে হয়তো ভালো হতো। এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যেত। ও ঘুমুচ্ছে। ওকে বিরক্ত করতে চাই না। ঘুমাক। ডায়রিটা পড়তে বেশ রোমাঞ্চকর অনুভূতির সৃষ্টি হচ্ছে। কী আশ্চর্য সেই মানুষটার জীবনী, যার কথা ফারিস বর্ণনা করে যাচ্ছে!

আচ্ছা! রাষ্ট্রপ্রধান কি কখনো এমন হন, যিনি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন? যার ঘরের চুলোয় আগুন জ্বলা বন্ধ থাকে? যিনি থাকেন মাটির কুঁড়েঘরে! যিনি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সম্পদের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন! যিনি রাজ্যের সবচেয়ে সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করেন। যার মণিমুক্তোয় খচিত কোনও আসন থাকে না। যার রাজদরবারে কোনও জৌলুস থাকে না। যার শ খানেক দেহরক্ষী থাকে না; এ কেমন রাজা?

নাহ, চিন্তা করে লাভ নেই। আমি বরং পড়তে শুরু করি। ক্যালিগ্রাফির পরের পৃষ্ঠা থেকে পড়ছি...

ভূমিকা : ৩

অতি আদরের কন্যাকে তিনি বিয়ে দিলেন। বিয়ের অনুষ্ঠানে খুব জাঁকজমক থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল। যেহেতু তিনি রাষ্ট্রপ্রধান, তাঁর কন্যা হলেন রাজকুমারী। কিন্তু সে বিয়েতে কোনও জমকালো অনুষ্ঠান হলো না। বড় বড় রাজা-বাদশাহদের নিমন্ত্রণ করা হলো না। অর্ধশত উট জবাই করে ভূরিভোজেরও আয়োজন করা হলো না। সাদামাটাভাবে তাঁর কন্যার বিয়ে হলো। সে বিয়েতে তিনি কন্যাকে কী উপহার দিয়েছিলেন, জানেন? শুনলে হয়তো অবাক হবেন। রাজকুমারীর বিয়ের উপঢৌকন ছিল—সামান্য কিছু জিনিস। এক খণ্ড মখমল, একটি পানির মশক, আর আঁশভর্তি একটি চামড়ার বালিশ।[১৮]

রাজকুমারীর যার সাথে বিয়ে হয়েছিল—তিনিও অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। রাজকুমারী হয়েও তাঁর কন্যা স্বামীগৃহে নিজ হাতে জাঁতা ঘুরাতেন। ঘুরাতে ঘুরাতে হাতে ফোসকা পড়ে যেত। কলসে করে পানি টানতেন। পানি টানার কারণে কাঁধে দড়ির দাগ পড়ে যেত। ঘরদোর নিজেই ঝাড়ু দিতেন। ঝাড়ু দেওয়ার কারণে পরনের কাপড় নোংরা হয়ে যেত। রাজকুমারীর ঘরে কোনও চাকর-চাকরানি ছিল না। নিজের কাজ তাঁকে নিজেই করতে হতো।[১৯]

একবার তিনি প্রিয় কন্যাকে দেখতে গেলেন। ঘরের ভেতর ঢুকলেন না। বাইরে থেকেই চলে এলেন। তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, 'আমি দরজায় নকশা করা পর্দা ঝুলতে দেখেছি। দুনিয়ার

চাকচিক্যের সাথে আমার কীই-বা সম্পর্ক?'[২০]

রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও তিনি চাননি তাঁর সন্তান বিলসিতা করুক। তিনি তাঁর সন্তানদের জন্যে কোনও বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করেননি। রাজ্যের সবকিছু তাঁদের জন্যে ফ্রি করে দেননি। কিংবা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাঁদের জন্যে ভাতারও ব্যবস্থা করেননি। জাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে যখন তাঁর কন্যা ফাতিমা ﵂ এর হাতে ফোসকা পড়ে গেল, তখন ফাতিমা ﵂ তাঁর কাছে একটি খাদেম চাওয়ার জন্যে গেলেন। কিন্তু তিনি ফাতিমাকে ﵂ কোনও খাদেম প্রদান করলেন না। কেননা, ফাতিমা ﵂ এর থেকে অন্যরা খাদেম পাওয়ার বেশি হকদার ছিল। তিনি কন্যাকে খাদেমের বদলে আমল শিক্ষা দিলেন। এরপর বললেন, 'এটা তোমাদের জন্যে একটি খাদেমের চাইতেও অধিক মঙ্গলজনক।'[২১]

আমাদের সমাজের নেতারা প্রশংসা শুনে তৃপ্তি পায়। সব সময় একদল চাটুকার তাদের আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। আর তাদের প্রশংসা করে। তিনি ছিলেন এদের চেয়ে ব্যতিক্রম। কেউ তাঁর প্রশংসা করলে তিনি তৃপ্তির ঢেকুর তুলতেন না; বরং প্রশংসাকারীকে সাবধান করে দিতেন। একবার কোনও ব্যক্তি তাঁকে প্রশংসা করে বলল, 'হে আমাদের নেতার পুত্র—নেতা!'

এ কথা শোনার পর তিনি বললেন, 'হে মানুষেরা! তোমরা স্বাভাবিক কথা বলো। শয়তান তোমাদের যেন বিভ্রান্ত না করে। আমি আল্লাহর গোলামের পুত্র ও আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তোমরা আমাকে তারও ওপরে উন্নীত করবে—আমি এটা পছন্দ করি না।'[২২]

তিনি এতটাই সাধারণ জীবনযাপন করতেন যে, তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান ভাবাটা কষ্টকর ছিল। তিনি যে রাষ্ট্রপ্রধান—তাঁকে দেখে কখনো এমনটা মনে হতো না। রাষ্ট্রের একেবারে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত তাঁর কাছে আসা যাওয়া করত। তাঁর সাথে কথাবার্তা বলত। অতি সাধারণ লোকও যদি তাঁর সাথে মুসাফাহা করত, তবুও তিনি হাত গুটিয়ে নিতেন না। তিনি ততক্ষণ হাত ছাড়াতেন না, যতক্ষণ ওই ব্যক্তি না ছাড়ত। ছোট ছোট বাচ্চারা তাঁকে রাস্তায় থামিয়ে কথা বলত। এমনকি তাঁর হাত ধরে তাঁকে যেদিকে ইচ্ছে নিয়ে যেত।[২৩]

তাঁর একজন খাদেম ছিল—আনাস ﵁। ছোটকাল থেকেই আনাস ﵁ তাঁর খেদমত শুরু করেন। বাড়িতে কিংবা সফরে তাঁর সঙ্গী হন। ছোট্ট আনাস ﵁ অনেক সময়ই ভুলত্রুটি করে ফেলেছেন। কিন্তু তিনি কখনো আনাসকে ﵁ ধমক দেননি। আনাসের ﵁ ওপর রাগান্বিতও হননি।

তাঁর ঘরে আনাস ﷺ দীর্ঘ ন-বছর কাটিয়েছেন। এই দীর্ঘ সময় কাটানোর পর আনাস ﷺ নিজ মুখে বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আমি দীর্ঘ ন-বছর তাঁর খিদমত করেছি। আমার কোনও কাজে তিনি কোনওদিন এমন বলেননি যে, 'কেন তুমি এমনটি করলে?' আবার যেসব কাজ আমি করিনি, সেসব কাজ নিয়েও কোনওদিন কথা তুলেননি। এমনকি এও বলেননি, 'কেন তুমি এমনটি করলে না?'[২৪]

তাঁর সকল গোনাহ আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরেও তিনি দৈনিক এক শ বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। গভীর রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। রবের কাছে ক্ষমা চাইতেন। সে সালাত এত বেশি লম্বা হতো যে, তাঁর দু-পা ফুলে যেত। সাহাবিরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তো আপনার আগে পরের সকল পাপ মাফ করে দিয়েছেন। তবুও আপনি কেন এত কষ্ট করছেন?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আমি কি (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?'[২৫]

একটা সময় এই মানুষটা সকলকে কাঁদিয়ে দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। আমৃত্যু তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি কী রেখে গিয়েছিলেন জানেন? পরিবার-পরিজনের জন্যে কাঁড়ি কাঁড়ি কিংবা অঢেল সম্পদ রেখে যাননি। একটি খেজুর পাতার বিছানা, একটি অমসৃণ পাত্র, আর একটি চামড়ার বালিশ রেখে গিয়েছিলেন। বালিশটি দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে চুলের ছাপ লেগেছিল। তাঁর গায়ে ছিল একটি ইযার ও একটি জামা। এ ছাড়া আর কোনও পোশাক রেখে যাননি।[২৬] তাঁর কাছে মাত্র ছ-দিরহাম জমা ছিল। সেগুলোও মৃত্যুর আগে দান করে গেছেন। মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীর ঘরে এমন কোনও বস্তু ছিল না, যা খেয়ে কোনও প্রাণী বাঁচতে পারে। শুধু তাকের ওপর আধ ওয়াসাক আটা পড়ে ছিল।[২৭]

ফারিস

২০ই সফর, ১৪৩৭ হিজরি।

আমি এই পর্যন্ত পড়ে থামলাম। শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখি, লোমগুলো দাড়িয়ে গেছে। হাত-পা অদ্ভুতরকমভাবে কাঁপছে। অন্যরকম শিহরন বোধ হচ্ছে। যে মহামানবের কথা ফারিস ডায়রিতে লিখেছে—তাঁর জীবনী আমি আগেও পড়েছি। কিন্তু ফারিসের মতো এত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নয়। ফারিসের ডায়রির প্রতিটা পাতা আজ আমায় নতুন করে ভাবতে শেখাল। আমি আবার ডায়রিতে মনোনিবেশ করলাম...

ভূমিকা : ৪

এখন যদি কেউ এসে আপনাকে বলে—'আপনি যে মানুষটির কথা বললেন, তিনি একজন ক্ষমতালোভী, লম্পট, পরশ্রীকাতর, অহংকারী। ক্ষমতার মোহে তিনি অন্ধ ছিলেন। যখন ক্ষমতা পেয়েছেন, তখন মানুষের সাথে জুলুম করেছেন। মানুষকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। কেবল নিজের ভোগবিলাস নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন।'

আচ্ছা বলুন তো, এ লোকটাকে কি আপনি সুস্থ মনে করবেন?

করবেন না। অবশ্যই করবেন না। জ্ঞান থাকতে করবেন না। বরং গালে একটা কষে থাপ্পড় বসিয়ে বলবেন, 'যা ব্যাটা! ভাগ এখান থেকে। তোর মতো নির্বোধের সাথে তর্ক করার সময় আমার নেই।'

নয়তো বলবেন, 'চল, তোকে পাবনার হেমায়েতপুরে রেখে আসি। সেখানে এখনো অনেক সিট খালি পড়ে আছে।'

আমার ভূমিকা এখানেই শেষ। আল্লাহ যদি চান, অন্য কোনওদিন এই মহামানবকে নিয়ে বিস্তারিত লিখব। আজ এই পর্যন্তই।

ওয়া সল্লাল্লাহু 'আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

মাফ করবেন! একটা কথা মনে পড়েছে। না বলে থাকতে পারছি না। জানতে চান মানুষটি কেমন সুন্দর ছিলেন?

জানতে না চাইলেও বলব। প্রিয় মানুষের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে কার না ভালো লাগে—বলুন? আমি যার কথা লিখছি, তিনি তো আমার কাছে সারা দুনিয়ার চেয়েও প্রিয়। তাহলে তাঁর সৌন্দর্যের কথা না লিখেই শেষ করে দেবো!

কোনও এক চাঁদনি রাতে জাবের ইবনে ছামুরা ﷺ তাঁর সাথে বসা। তাঁর শরীরে ছিল লাল রঙের পোশাক। আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। জাবের ইবনে ছামুরা ﷺ একবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলেন, একবার তাঁর দিকে। একবার চাঁদের দিকে, একবার তাঁর দিকে। একবার চাঁদের দিকে, একবার তাঁর

দিকে। এরপর জাবের ইবনে ছামুরা ﷺ বললেন, 'ওয়াল্লাহি! তিনি চাঁদের চেয়েও অধিক সুন্দর।'[২৮]

ফারিস

পহেলা রবিউল আওয়াল, ১৪৩৭ হিজরি।

ফারিসের লেখা এখানেই শেষ। ডায়রিটার প্রতিটি কথাই জীবন্ত। মনে হচ্ছে যেন—আমি তাঁকে দেখছি। তাঁকে উপলব্ধি করছি। লেখাগুলো আমায় নতুন করে ভাবতে শেখাল। নতুন করে সে মহামানবকে চিনতে শেখাল। সত্যিই অন্যরকম এক উপলব্ধি হলো।

একটা কথা ভেবে খারাপ লাগছিল। যে মহামানবের কথা ফারিস লিখেছে, তিনি আমাদের আদর্শ। আমাদের পথপ্রদর্শক। আর আমরা তাঁরই অনুসারী। তিনি তো অল্পতেই কারও ওপর রাগ করেননি! ছোট ছোট ভুলকে বড় চোখে দেখেননি! ব্যক্তিগত কারণে কারও থেকে প্রতিশোধ নেননি! এমনকি তাঁর খাদেম আনাসকেও কখনো ধমক দেননি। আনাসের ওপর কখনো খ্যাপে যাননি। আর আমি কিনা ওই রিকশাওয়ালার ওপর খেপে গেলাম! মনে মনে বকাঝকা করলাম!

নাহ! কাজটা একদম ঠিক হয়নি। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিজের ক্ষোভকে দমন করতাম—কতই-না ভালো হতো!

'কী রে? কাঁদছিস কেন?'

ফারিসের এমন প্রশ্নের জবাবে আমার টনক নড়ে উঠল। নিজের অজান্তেই কখন যে চোখে জল এসেছে—বলতে পারব না।

তথ্যসূত্র :

- ১) মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, হাদীস : ৪৭৭
- ২) মুবারকপুরী, শফিউর রহমান, *আর রাহীকুল মাখতুম*, পৃষ্ঠা : ৭৪
- ৩) ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ৩/১২৩-১২৪; ইবনুল কাইয়্যিম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর, *যাদুল মা'আদ,* ২/১৫৬; মুবারকপুরী, *আর রাহীকুল* মাখতুম, পৃষ্ঠা : ১৩০

♦ (৪) ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ৩/২৫৪-২৫৬; মুবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম,* পৃষ্ঠা : ১৫০-১৫২
♦ (৫) ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ৬/৬১
♦ (৬) ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ৩/১০১
♦ (৭)ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ, *আস-সুনান,* হাদীস : ৪১২৬
♦ (৮) বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আস-সহীহ,* হাদীস : ২৮৩৪, ৩০৩৪; তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, *আস-সুনান,* হাদীস : ২৩৭৪; ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ৪/১৮৪-১৮৭; মুবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম,* পৃষ্ঠা : ৩০৯
♦ (৯) বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আস-সহীহ,* হাদীস : ৫০১৮; মুসলিম, *আস-সহীহ,* হাদীস : ৭১৬৪
♦ (১০) ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ৪/৩২৩; মুবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম,* পৃষ্ঠা : ৩৬৬
♦ (১১) মুবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম,* পৃষ্ঠা : ৫২৮।
♦ (১২) বুখারী, *আস-সহীহ,* হাদীস : ৬০১২; আহমাদ ইবনু হাম্বল, *কিতাব আয-যুহদ,* পৃষ্ঠা : ৫৪, অনুবাদ : জিয়াউর রহমান মুন্সী
♦ (১৩) আহমাদ ইবনু হাম্বল, *কিতাব আয-যুহদ,* পৃষ্ঠা : ৫৪
♦ (১৪) ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ, *আস-সুনান,* হাদীস : ৪১৫৩; আহমাদ ইবনু হাম্বল, *কিতাব আয-যুহদ,* পৃষ্ঠা : ১১৫-১১৬
♦ (১৫) মুসলিম, *আস-সহীহ,* হাদীস : ৭১৮০; ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ, *আস-সুনান,* হাদীস : ৪১৪৪
♦ (১৬) মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ,* হাদীস : ৭১৯২; ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ, *আস-সুনান,* হাদীস : ৪১৪৬; আহমাদ ইবনু হাম্বল, *কিতাব আয-যুহদ,* পৃষ্ঠা : ৩৬-৩৮, ৬৮, ৮৫, ৯৭
♦ (১৭) আলবানী, মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন, *সহীহ শামায়েলে তিরমিযী,* পৃষ্ঠা : ১৪১
♦ (১৮) ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ, *আস-সুনান,* হাদীস : ৪১৫২; নাসায়ী, আহমাদ ইবনু শোয়াইব, *আস-সুনান,* হাদীস : ৩৩৮৪
♦ (১৯) আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস, *আস-সুনান,* হাদীস : ২৯৮৮
♦ (২০) বুখারী, *আস-সহীহ,* হাদীস : ২৬১৩
♦ (২১) বুখারী, *আস-সহীহ,* হাদীস : ৫৮৭৯; মুসলিম, *আস-সহীহ,* হাদীস : ৬৬৬৭, ৬৬৬৮
♦ (২২) ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ৬/৭২
♦ (২৩) ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ৬/৬৬
♦ (২৪) ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ৬/৬৩
♦ (২৫) বুখারী, *আস-সহীহ,* হাদীস : ৬৪৭১; মুসলিম, *আস-সহীহ,* হাদীস : ৬৮৬৩, তিরমিযী, *আস-সুনান,* হাদীস : ৪১২; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* হাদীস : ১৪১৯
♦ (২৬) আহমাদ ইবনু হাম্বল, *কিতাব আয-যুহদ,* পৃষ্ঠা : ৩৯, ৭৭
♦ (২৭) বুখারী, *আস-সহীহ,* হাদীস : ৩০৯৭; মুসলিম, *আস-সহীহ,* হাদীস : ৭১৮২
♦ (২৮) তিরমিযী, *আস-সুনান,* হাদীস : ২৮১১; মুবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম,* পৃষ্ঠা : ৫২৪

[এক]

সেদিন বৃহস্পতিবার। যথারীতি বিকেল পাঁচটায় ক্লাস শেষ হলো। ভেবেছিলাম আসরের সালাত আদায় করে ফারিসকে নিয়ে বেড়াতে যাব। তা আর হলো না। সালাত শেষ করে মাত্র বেরিয়েছি, এমন সময় বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলছে। বড় বড় ফোঁটা পড়ছে। দৌড়ে আমরা পাশের যাত্রী-ছাউনীতে গিয়ে উঠলাম। তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো।

যাত্রী-ছাউনীতে আরও বেশ কজন লোক ছিল। এক জন লোক বার বার ফারিসের দিকে তাকাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর লোকটি আমার দিকে এগিয়ে এলেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। খানিক সময় পর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু বলবেন আংকেল?'

লোকটি জবাবে বললেন, 'আমি জোবায়ের। জোবায়ের আহমেদ খান। অনুমতি দিলে একটা প্রশ্ন করি?'

'জি, করেন।'

লোকটি ফারিসের দিকে ইশারা করে বললেন, 'আচ্ছা বাবা, ওই যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি কি ফারিস?'

'হ্যাঁ আংকেল। ওই-ই ফারিস।'

'তাঁর সাথে একটু কথা বলা যাবে?'

'জি যাবে। দাঁড়ান আমি ডাকছি। ফারিস, এই ফারিস। এদিকে একটু আয় তো।'

ডাক শুনে ফারিস এলে আমি বললাম, 'এই আংকেল তোকে খুঁজছেন। কী যেন বলবেন।'

সালাম-মোসাফাহা শেষে ফারিস বলল, 'কী জানতে চান আংকেল, বলুন?'

জোবায়ের আংকেল বললেন, 'আমি আপনাকে অনেকদিন যাবৎ খুঁজছি। এভাবে আপনার সাথে দেখা হয়ে যাবে—কল্পনাও করিনি। যাক দেখা হয়ে ভালোই হলো।'

'আপনি আমাকে কীভাবে চেনেন?'

‘অনলাইনে আপনার লেখা পড়েছি। আমার এক কলিগ আছেন যার ছেলে আপনাদের সাথে পড়ে। তার মুখে আপনার অনেক প্রশংসা শুনেছি। সে থেকেই আপনার সাথে দেখা করার অনেক ইচ্ছা। সময় করে উঠতে পারছিলাম না। কী সৌভাগ্য দেখুন, কাকতালীয়ভাবে আজ আপনার সাথে দেখা। কলিগের ফোনে আপনার একটা ছবি দেখেছিলাম। তাই চিনতে তেমন কষ্ট হয়নি।’

‘ওহ্ আচ্ছা। আংকেল আমি তো আপনার ছেলের বয়সী। তাই আমাকে তুমি করে বললেই বেশি খুশি হব। তা আমার কাছে কী মনে করে?’

‘আসলে আমি একটা বিষয় নিয়ে তোমার সাথে ডিসকাস করতে চাচ্ছিলাম। তাই।’

‘কী ধরনের বিষয়?’

‘বলব। সব বলব। তবে আজ নয়।’

‘তাহলে?’

আংকেল কিছুটা অপ্রস্তুত গলায় বললেন, ‘আমার যে একটা আর্জি ছিল?’

‘জি বলুন।’

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটি কার্ড বের করে ফারিসকে দিয়ে বললেন, ‘আমার কার্ড। এখানে আমার বাসার ঠিকানা আছে। একদিন তুমি সময় করে আমার বাসায় আসবে। অবশ্যই আসবে।’

ফারিস বলল, ‘কথা তো দিতে পারছি না। তবে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব।’

জোবায়ের আংকেলের মুখে অপ্রসন্নতার ছাপ লক্ষ করা গেল। তিনি ফারিসের হাত ধরে বললেন, ‘বাবা আমাকে কথা দাও তুমি আসবে। প্লিজ।’

লোকটি এমনভাবে মিনতি করছিল যে, হ্যাঁ করা ছাড়া কোনও গত্যন্তর ছিল না। তাই ফারিস রাজি হয়ে গেল।

ভদ্রলোকটি বেশ হাসিমুখে বললেন, ‘থ্যাংক ইউ, মাই সান। আর হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার এই বন্ধুকে সাথে নিয়ে আসবে। আমি খুব খুশি হব।’

[দুই]

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ভার্সিটি যেদিন বন্ধ ছিল—সেদিনকার কথা। আমি আর ফারিস জোবায়ের সাহেবের বাড়ির খোঁজে রওনা হলাম। ঘণ্টা খানেক পর কাঙ্ক্ষিত বাসাটি খুঁজে পেলাম। কলিংবেল চাপতেই এক পিচ্চি এসে দরজা খুলে দিলো।

এরপর বলল, 'আফনেরা কেডু? কী চান এহেনে?'

ফারিস বলল, 'জোবায়ের সাহেব আছেন বাসায়? আমরা তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছি?'

'হ আছেন। আপনেরা বাড়ি মধ্যে আইসেন। আমি বড় সাবেক ডাইহে দিতেইছি।'

ছেলেটি আমাদের বসায় ঘরে বসতে দিয়ে বিদায় নিল। মিনিট পাঁচেক পর জোবায়ের আংকেল এলেন। আমাদের দেখে তিনি বেশ খুশি হয়েছেন বলেই মনে হলো। কুশলাদি বিনিময় শেষে বললেন, 'তোমরা এসেছ, আমি বেশ খুশি হয়েছি। তবে কষ্ট দেওয়ার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী।'

ভদ্রলোকের কথা শেষ হলে ফারিস বলল, 'পাখি পালনের প্রতি আপনার বেশ ঝোঁক, তাই না আংকেল?'

জোবায়ের সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'কীভাবে বুঝলে?'

'আপনার বুক শেলফ দেখে।'

'মানে?'

'আপনার শেলফ ভর্তি পাখি-পালন, পাখির পুষ্টি, পাখির পরিচর্যা ইত্যাদি বই দিয়ে ভর্তি। আর বাসার বাইরের বড় গাছগুলোতে দেখলাম মাটির হাঁড়ি বাঁধা। ব্যালকোনিতে পাখির খাঁচা; তাই বললাম আর কি।'

'ওহহ্ আচ্ছা। তুমি দেখছি অনেক জিনিস খেয়াল করেছ।'

ফারিস যেখানেই যাক না কেন, সেখানকার অবস্থাটা অবশ্যই ভালো করে বিশ্লেষণ করবে। এটা তার চিরাচরিত অভ্যাস। আজও ব্যতিক্রম করেনি। জোবায়ের আংকেলের কথা শেষ হলে ফারিস জিজ্ঞেস করল, 'কী যেন প্রবলেম ডিসকাস করবেন বলে আসতে বলেছিলেন?'

'বলছি বলছি। এত তাড়া কিসের? আগে বলো কী খাবে? চা না কফি?'

'কফি।'

জোবায়ের সাহেব কাজের ছেলেটিকে ডেকে কফি দিতে বললেন। এরপর ফারিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। সেটার সমাধান দেবার জন্যেই তোমাকে বাসা পর্যন্ত নিয়ে এসেছি।'

'কী ধরনের সমস্যা?' ফারিসের প্রশ্ন।

'সমস্যাটা আমার ছেলেকে নিয়ে। আমার একটি মাত্র ছেলে—জনি। ক্লাস টেনে

পড়ে। ছাত্র হিসেবে ভালো। ইন্টারনেটের প্রতি তার খুব ঝোঁক। সময় পেলেই ফেসবুক, গুগল, ইমো ইত্যাদি নিয়ে পড়ে থাকে। খুব আদরের ছেলে বলে ওর কোনও কাজে আমি বাধা দিইনি। যা চেয়েছে তার থেকেও বেশি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সেই ছেলেটাই আমার হারিয়ে যেতে বসেছে।'

জোবায়ের সাহেবের কথা শেষ হলে আমি বললাম, 'কী হয়েছে ওর? ওর কি বড় ধরনের কোনও অসুখ করেছে?'

জোবায়ের সাহেব বললেন, 'না, না বাবা। অসুখ করেনি। অসুস্থতা ওর সমস্যা নয়। সমস্যা অন্য জায়গায়।'

ফারিস বলল, 'ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন কি?'

'সে জন্যেই তো তোমাদের ডেকেছি। সমস্যাটা হচ্ছে, জনি দিন দিন সংশয়বাদী হয়ে যাচ্ছে। ইন্টারনেটে নাস্তিকদের যেসব ব্লগ রয়েছে, ওইগুলো সে নিয়মিত ব্রাউজ করে। সেখান থেকে আজগুবি সব প্রশ্ন বের করে—আমার সাথে তর্ক করে। ইসলাম সম্পর্কে আমার জানাশোনা খুবই কম। আমি কখনো কখনো ওর সাথে তর্কে হেরে যাই। আমার হারাটা মেজর প্রবলেম নয়। মেজর প্রবলেম হলো—তর্কে ওর সাথে পারি না বলে সে ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করে। ওর কাছে মনে হয় কোরআনে অনেক স্ববিরোধী আয়াত আছে। বৈজ্ঞানিক ভুল আছে। তাই কোরআন কখনো স্রষ্টার বাণী হতে পারে না। ভেবেছিলাম ওকে কোনও আলেমের কাছে নিয়ে যাব। কোনওভাবেই রাজি করাতে পারিনি। তাই তোমাদের এতটা পথ কষ্ট দিয়ে বাসায় নিয়ে এসেছি। সরি মাই সান।'

'ইট'স ওকে। জনি আছে বাসায়? কথা বলা যাবে ওর সাথে?'

'আসলে কী ভাগ্য আমার, তোমরা এসেছ আর জনিও কিছুক্ষণ আগে বাসায় এসেছে। একটু বসো। আমি দেখছি।'

ভদ্রলোক বাড়ির ভেতরে গেলেন। মিনিট দশেক পর ফিরে এলেন। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন কফি, বিস্কুট আর চানাচুর। কফির কাপ আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি সবেমাত্র কাপে চুমুক দিয়েছি, এমন সময় ভেতর থেকে একটি ছেলে এল। পরনে গেঞ্জি, হাতে ট্যাবলেট ফোন, কানে ইয়ারফোন। জোবায়ের সাহেব আমাদেরকে ছেলেটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই ছেলেটাই জনি। জোবায়ের সাহেবের একমাত্র সন্তান। জনি ফারিসের মুখোমুখি বসল।

ফারিস জনিকে লক্ষ্য করে বলল, 'কেমন আছো, ভাইয়া?'

জনি জবাব দিলো, 'ভালো। আপনি?'

'আলহামদুলিল্লাহ। ভালো। পড়াশোনা কেমন হচ্ছে তোমার?'

‘এই তো চলছে কোনওরকম।’

‘জনি, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি?’

‘হ্যাঁ করেন।’

‘ধরো, তোমাকে একটি ইংলিশ নভেল বই গিফট করলাম। এরপর বইটা পড়ে মতামত জানাতে বললাম। তুমি পড়লে না। এমন একজনের কাছ থেকে বইটি সম্পর্কে ধারণা নিলে, যে ইংরেজি জানে না। ইংলিশ গ্রামারের রুলস জানে না। সম্পূর্ণ বইটি সে পড়েওনি কোনওদিন। এরপর আমাকে জানালে, বইটিতে অনেক সমস্যা আছে। স্ববিরোধী বক্তব্য আছে। গ্রামাটিক্যাল ভুল আছে। ব্যাপারটা কি ঠিক হবে?’

‘না, না।’

‘কোনটা করলে ভালো হতো?’

‘বইটি নিজে পড়ে মতামত দেওয়া। নিজে না পারলে যে ভালো ইংরেজি জানে—তার কাছ থেকে ধারণা নেওয়া। এরপর মন্তব্য করা।’

‘এক্সাক্টলি মাই ব্রাদার। এবার আমাকে বলো, কেউ যদি নিজে কোরআন না পড়ে—মুক্তমনা ব্লগ থেকে এর ভুল খুঁজতে যায়, সেটা কি ঠিক হবে?’

জনি কিছুক্ষণ চুপ রইল। এরপর বলল, ‘তারা তো ভুল কিছু প্রচার করছে না। কোরআনের যেসব জায়গায় সমস্যা রয়েছে, সেগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরছে। আমাদের সতর্ক করছে।’

জনির মাথাটা যে বেশ খারাপ হয়েছে, তা ওর কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। নচেৎ যে ব্লগের লেখকদের বাংলা ভাষাজ্ঞানই ঠিক নেই, তারা আবার আরবি গ্রামারের ভুল ধরে কী করে? ফারিস জনির বক্তব্য শুনে মুচকি হেসে বলল, ‘আচ্ছা জনি, আমরা খোলাখুলি কথা বলি। কোরআনের কোন কোন জায়গাতে তুমি সমস্যা খুঁজে পেয়েছ? আই মিন মুক্তমনা থেকে জেনেছ?’

‘অনেক জায়গায়।’

‘যেমন?’

‘একটু দাঁড়ান আমি বলছি।’

জনি ট্যাব থেকে একটি পিডিএফ ফাইল বের করল। এরপর ফারিসকে বলল, ‘কোরআনের ৫১ অধ্যায়ের, ৫৬ আয়াতে মানুষ সৃষ্টির কারণ বলা হয়েছে—কেবল আল্লাহর ইবাদত। কিন্তু অধ্যায় ৭-এর ১৫৮-তে বলা হয়েছে মুহম্মদের সুন্নত অনুসরণ। সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? আল্লাহর ইবাদত, নাকি মুহম্মদের সুন্নত অনুসরণ?’

ফারিস জনির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করল, 'সত্যি করে বলো তো, তুমি কি কোরআন পড়েছ?'

'কিছুটা।' জনির উত্তর।

'কিছুটা কোরআন আর মুক্তমনা ব্লগ থেকেই কি কোরআন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়?'

জনি কিছু বলল না। চুপ করে রইল। ফারিস বলল, 'এবার তোমার প্রশ্নে আসি। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? স্রষ্টার ইবাদত? নাকি মুহাম্মাদের ﷺ সুন্নাহ অনুসরণ? আমাদের সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর ইবাদত করা। সৃষ্টির ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এককথায় নিজেকে শত ইলাহের গোলামি থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামিতে লিপ্ত করা।'

'কিন্তু কোরআন তো অন্যকিছু বলছে।'

'লেট মি ফিনিশ ব্রাদার। সূরা নাজমের ২-৪ আয়াতে বলা আছে, "তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়। এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এটা তো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" এ ছাড়া সূরা আহকাফের ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।"

এসব আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি, রাসূল ﷺ নিজে থেকে বানিয়ে কিছু বলেননি। মনগড়া কথাও প্রচার করেননি। তিনি যা প্রচার করেছেন, যা বলেছেন— তা আল্লাহ ﷻ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ সূরা হাক্কাহ-র ৪৪-৪৬ আয়াতে বলেছেন, "সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনি।" এখন আমাকে বলো তো, মুহাম্মাদের ﷺ সুন্নাহ সত্যিকার অর্থে কার শিক্ষা?'

'আল্লাহর।'

'হ্যাঁ, মহান আল্লাহর শিক্ষা। কোরআন পড়লে দেখবে, বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ ﷻ মুহাম্মাদের ﷺ সুন্নাহ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা আলি 'ইমরানের ৩১ আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেছেন, "তুমি বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

একটা জায়গায় তোমার মারাত্মক ভুল হয়েছে। তুমি কোরআন সম্পূর্ণ পড়োনি। পড়লে অবশ্যই মতিভ্রম হতো না। আমরা মুহাম্মাদের ﷺ সুন্নাহ এই জন্যে অনুসরণ

করি না যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। করি এই জন্যে যে, আল্লাহ ﷻ আমাদের তার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ যদি মুহাম্মাদের ﷺ সুন্নাহ অনুসরণ করার নির্দেশ না দিতেন, আমরা কখনোই করতাম না।'

'ভাইয়া, কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েই গেল।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি সহজ করে বলছি। মনে করো, তুমি তোমার কোনও প্রিয় লোককে ট্রেইনার হিসেবে কোথাও পাঠালে। তাকে সেখানে গিয়ে কী কী করতে হবে, সব নিজ হাতে শিখিয়ে দিলে। এরপর বললে, আমি যেভাবে বললাম ঠিক সেভাবেই মানুষকে শিক্ষা দিবি। লোকটি তার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে চলে গেল।

নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে সে মানুষকে বলল, আমাকে জনি সাহেব এখানে পাঠিয়েছেন। আর তোমাদের এই এই জিনিস শিক্ষা দিতে বলেছেন। সেখানকার মানুষ তার কথাগুলো ঠিক সেভাবেই মানল, যেভাবে তুমি তাকে শিখিয়েছিলে। লোকজন যদি লোকটার কথা অনুসরণ করে, তাহলে আলটিমেটলি ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়? লোকজন কি ঐ লোকটার অনুসরণ করছে? নাকি ইনডিরেক্টলি তোমার আনুগত্য করছে?'

'অবশ্যই আমার কথার আনুগত্য করছে। লোকটাকে তো আমিই শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছি। সে তো আমার শিক্ষার বিপরীতে কোনও কিছু করতে বলেনি।'

'আমরা মুসলিমরাও মুহাম্মাদের ﷺ সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ পালন করি। কেননা, আল্লাহ ﷻ তাঁকে অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত—সত্যেরই দাওয়াত দিয়েছেন। নিজে থেকে বানিয়ে কিছু প্রচার করেননি। তিনি তা-ই বলেছেন, যা আল্লাহ ﷻ তাঁকে বলার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তা-ই করতে বলেছেন, যা আল্লাহ ﷻ তাঁকে শিখিয়েছেন। তাই তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ মানে, আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ। আর আল্লাহর হুমুক পালনের জন্যেই আল্লাহ ﷻ আমাদের সৃষ্টি করেছেন।'

ফারিসের কথা শেষ হলে জনি আবার মোবাইলের দিকে নজর দিলো। আমি চানাচুর খাচ্ছিলাম আর ফারিস ও জনির কথোপকথন শুনছিলাম। জোবায়ের আংকেল বেশ চুপচাপ হয়ে বসে আছেন আর চা পান করছেন। মনে হচ্ছে যেন পিন-পতন-নীরবতা বিরাজ করছে। এভাবে কিছু সময় যাওয়ার পর জনি আবার প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা ভাই, কোরানকে আপনারা মানবজাতির জীবন-বিধান হিসেবে বিশ্বাস করেন?'

'কেন করব না? অবশ্যই করি।' ফারিসের ঝটপট উত্তর।

'কোরআনের অনেক আয়াতে মুহম্মদের পার্সোনাল সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে। সমগ্র মানবজাতির জন্যে পাঠানো বিধানে একজন নবীর জন্যে এত মাথাব্যথা

থাকবে কেন? এ থেকে কি প্রমাণ হয় না, কোরআন সমগ্র মানবজাতির জন্যে পাঠানো কোনও বই নয়?'

জনির শিশুসুলভ প্রশ্ন আমাকে বেশ বিরক্ত করছিল। অবশ্যি ফারিসের মুখে কোনও বিরক্তির ছাপ নেই। খুব মনোযোগ দিয়ে সে জনির কথাগুলো শুনছিল। জনির প্রশ্ন শুনে বেশ হাসিমুখে বলল, 'আমি তো তোমাকে খুব ব্রিলিয়ান্ট ভেবেছিলাম। তুমি আমাকে আশাহত করলে ভাই। এমন প্রশ্ন করলে, যা প্রশ্ন হবারই যোগ্য নয়। তবুও উত্তর দিচ্ছি। আল্লাহ ﷻ কোরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহকে ﷺ আমাদের সকল কাজের মডেল বানিয়েছেন।

সূরা নূরের ৫৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেছেন, "বলো, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎ পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।" আরও অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ রাসূলের ﷺ আনুগত্য করার, তাঁর সুন্নাহকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।'

ফারিসের কথা শেষ না হতেই জনি বলে উঠল, 'তাতে কি আমার অভিযোগ খণ্ডন হয়?'

'আগে তো আমাকে বলতে দাও। তারপর না হয় মন্তব্য কোরো?'

'আচ্ছা বলুন।'

'ইসলাম এমন একটা দীন, যা থিয়োরীর পাশাপাশি প্র্যাক্টিক্যাল শিক্ষা দেয়। ইসলাম শুধু কোনও বিধান বর্ণনা করেই শেষ করে দেয়নি। প্রত্যেকটি মৌলিক বিধান হাতেকলমে শিক্ষা দিয়েছে। এ জন্যে আল্লাহ ﷻ রাসূলকে ﷺ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যিনি একাধারে মানুষকে ওহীর জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছেন। পাশাপাশি নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করেছেন। সকল কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ রাসূলকে ﷺ মডেল বানিয়েছেন। আদর্শ পুরুষ বানিয়েছেন।

কোরআনের মধ্যে রাসূলের ﷺ পার্সোনাল সমস্যার সমাধান এ জন্যে দিয়েছেন, যাতে মানুষ তাদের মডেলের জীবনী থেকে শিক্ষা নিতে পারে। যাতে মানুষ জানতে পারে, তাদের আদর্শ পুরুষ সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করেছেন। মানুষ যাতে আল্লাহকে এই অপবাদ না দিতে পারে—আল্লাহ ﷻ যাকে মডেল বানালেন, তার কর্মগুলো সামনে আনলেন না কেন?

মনে করো, আমি কোনও সমস্যায় পড়লাম। সে সমস্যার সমাধান তাঁর মধ্যে খুঁজে পেলাম না, যাকে আল্লাহ ﷻ আমার জন্যে আদর্শ বানিয়েছেন। তাহলে ব্যাপারটা

কেমন হতো? এ জন্যেই রাসূলের ﷺ পার্সোনাল কিংবা পারিবারিক সমস্যার সমাধানগুলোও কোরআনে তুলে ধরা হয়েছে। আর আমাদের সমস্যার সমাধানও সেভাবে করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেভাবে রাসূল ﷺ করেছেন।'

ফারিস এই পর্যন্ত বলে থামতেই আংকেল জনিকে বললেন, 'কিরে, মাথার জট খুলেছে? নাকি সব গুলিয়ে ফেলেছিস? ভালো করে জেনে নে তোর ফারিস ভাইয়ার কাছ থেকে। আমাকে যেন আর জ্বালাতন করতে না দেখি।'

ফারিস সবেমাত্র কফির কাপটা হাতে নিয়েছে এমন সময় জনি বলে উঠল, 'ভাইয়া, আমার আরেকটি প্রশ্ন ছিল।'

ফারিস বলল, 'হ্যাঁ, বলো।'

'আপনি কি জানেন, কোরআনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভুল আছে?'

'যেমন?'

জনি তাঁর মোবাইল ঘেঁটে আরেকটি প্রশ্ন বের করে বলল, 'লুকমানের ৩৪ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে—মায়ের পেটে কী আছে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু এখন আমরা জানি, ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলে দিতে পারে, বাচ্চা ছেলে না মেয়ে। এটা কি কোরআনের বৈজ্ঞানিক ভুল নয়?'

'না, অবশ্যই না।' ফারিসের উত্তর।

'কেন না?'

'মানুষ কি কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই বাচ্চা ছেলে না মেয়ে, এটা শিওরলি বলে দিতে পারবে?'

'তা হয়তো পারবে না। কিন্তু পরীক্ষা করে তো অবশ্যই পারবে।'

'এরপরেও কিন্তু কোরআনের আয়াত ভুল প্রমাণিত হয় না।'

'কেন হবে না? এটা তো আলটিমেটলি ভুল হয়েই আছে।'

'হাসালে ভাই। এ বয়সে জ্ঞানের থেকে আবেগটা একটু বেশিই থাকে। তুমিও তার ব্যতিক্রম নও। আয়াতটি সত্যিকার অর্থে কী বোঝাতে চাচ্ছে, তুমি তা অনুধাবন করতে পারোনি।'

'তাহলে আপনিই বলেন, আয়াত কী বুঝিয়েছে।'

'শাইখ আল উসাইমীন ﵀ বলেন, "আয়াতটি গায়েবী বিষয়-সংক্রান্ত। এখানে আল্লাহ ﷻ মোট পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহ ﷻ ছাড়া কেউ জানে

না। তার মধ্যে মাতৃগর্ভে কী আছে, তা একটি। শিশু মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় গায়েবী বিষয়গুলো হলো—সে কত দিন মায়ের পেটে থাকবে, কত দিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে, কী রকম আমল করবে, সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগ্যবান হবে, গঠন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ছেলে না মেয়ে হবে, এ সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর গঠন পূর্ণ হওয়ার পর মাতৃগর্ভে ছেলে না মেয়ে—এ সম্পর্কে অবগত হওয়া ইলমে গায়েবের বিষয় নয়। কেননা, গঠন পূর্ণ হলে তা আর গায়েব থাকে না, দৃশ্যমান হয়ে যায়। আর এ আয়াতে মাতৃগর্ভে ছেলেসন্তান বা মেয়েসন্তান হওয়ার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে—এ কথা বলা হয়নি। হাদীসেও এই মর্মে সুস্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত নেই।"'

'আমার আরও একটা প্রশ্ন আছে।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'কোরআনে বলা আছে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দিয়ে। এটা . উদ্ভট তথ্য নয়?'

'না, কখনোই না।'

'কেন? আমরা তো জানি মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট না।'

'মানুষের দেহের যেসব উপাদান আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো—অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, ফেরাস, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি। এগুলো আমাদের দেহে আয়ন আকারে থাকে। মাটির নমুনা বিশ্লেষণ করেও এসব উপাদানই পাওয়া যায়। আমাদের দেহ আর মাটির উপাদান একই। তবে হ্যাঁ, এ উপাদানগুলো এক করে মানুষের পক্ষে একটি মানুষ বানানো করা সম্ভব নয়। এটা স্রষ্টার কাজ।'

ফারিস এই পর্যন্ত বলে থামল। এরপর কফির কাপে চুমুক দিলো। আমি চুপ করে বসে রইলাম। আংকেল চায়ের কাপটা হাত থেকে নামিয়ে বেশ বড়গলায় জনিকে বললেন, 'কিরে, এমন চুপসে গেলি কেন? খুব তো পট পট করিস আমার সাথে। আমি কিছু জানি না বলে আমার সাথে তো ভালোই ভাব নিস। এখন কেন চুপ করে আছিস? আরও কিছু বলার থাকলে বল। কাল থেকে যেন আর ব্লগ ব্রাউজ করতে না দেখি। মনে থাকে যেন।'

আংকেলের কথা শেষ হলে জনি কিছু না বলে চলে গেল। ধুমধাম বাসার ভেতর ঢুকে গেল। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। ও চলে যাওয়ার পর আংকেল কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'একটি মাত্র ছেলে আমার। ওর এই অবস্থা। নিজেকে কোনওভাবেই বোঝাতে পারছি না। কোনওদিন ধারণাও করিনি, ছেলেটা এমন হবে।'

আংকেলের চোখে পানি দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিল। ছেলেকে উনি অনেক ভালোবাসেন। তাই হয়তো জনির অন্যায় দাবিগুলোও তিনি মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছেন। আংকেল চোখের পানি মুছে বললেন, 'জানি না ওর বুঝ হবে কি না। হলে তো আলহামদুলিল্লাহ। আর আমাকে ক্ষমা করবে, তোমাদের দুজনকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। এতদূর নিয়ে এসেছি। তোমাদের ঋণ আমি কোনওদিন শোধ করতে পারব না। তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। সময় পেলে অবশ্যই এই বুড়ো আংকেলে একবার দেখে যাবে।'

প্রায় মাস খানেক পর জোবায়ের আংকেলের একটা মেইল এল ফারিসের কাছে। যেখানে তিনি লিখেছিলেন,

> স্নেহের ফারিস। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছো। আমি যে আজ কতটা আনন্দিত, তা তোমাকে লিখে বোঝাতে পারব না। আল্লাহ সত্যিই আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার ছেলের প্রতি তিনি করুণা করেছেন। ছেলেটা অন্ধকার থেকে ফিরে এসেছে। সত্যকে চিনতে শিখেছে। নিয়মিত নামাজ পড়ছে। দাড়িও রেখেছে। তুমি ওর জন্যে প্রাণখুলে দোয়া করবে। আল্লাহ যাতে দীনের ওপর অটল রাখেন। আর আমিও আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন তোমার মতো ফারিস ঘরে ঘরে তৈরি করেন। আল্লাহ তোমাকে জাজায়ে খায়ের দান করুন।
>
> তোমার বুড়ো আংকেল।

তথ্যসূত্র :

♦ ১) সূরা আয-যারিয়াত, (৫১) : ৫৬ আয়াত।
♦ ২) সূরা আল-আ'রাফ, (০৭) : ১৫৭ আয়াত।
♦ ৩) সূরা আল-মু'মিন, (৪০) : ৬৭ আয়াত।
♦ ৪) সূরা আন-নাজম, (৫৩) : ২-৩ আয়াত।
♦ ৫) সূরা আহকাফ, (৪৬) : ৯ আয়াত।
♦ ৬) সূরা আল-হাক্কাহ, (৬৯) : ৪৪-৪৬ আয়াত।
♦ ৭) সূরা আলি 'ইমরান, (০৩) : ৩১ আয়াত।
♦ ৮) আন-নূর, (২৪) : ৫৪ আয়াত।
♦ ৯) *Scientific Indications in the Holy Quran,* Written by bord of researchers; (Islamic Foundation, 3rd eddition, 2012)
♦ ১০) উসাইমীন, মুহাম্মাদ বিন সালেহ, *ফতোওয়া আরকানুল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ৩৫।

স্বপ্নলোক

[এক]

সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। উদ্দেশ্য—একটা সিগনেচার। ডিন স্যারের সিগনেচার। সুযোগই হচ্ছে না। চেম্বারে সমানেই লোকজন আসা-যাওয়া করছে। ডিন বলে কথা। ফ্যাকাল্টি যার কথায় চলে। লোকজন তো আসা-যাওয়া করবেই। কত মানুষ কত প্রয়োজন নিয়ে আসছে। কখনো চেয়ারম্যান স্যাররা আসছে, কখনো কর্মকর্তারা আসছে, কখনো স্টুডেন্টরা। মানুষ যত বড় হতে থাকে, তার পেছনে লোকজনের যাতায়াত তত বাড়তে থাকে। সমানুপাতিক সম্পর্ক কিনা—তাই। তবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটা কথা বুঝে আসল। যারা স্যারের কাছে আসছে, তাদের কাছে স্যারের থেকে স্যারের সিগনেচারের মূল্য বেশি। বেশি বলেই তারা সিগনেচার পেলে খুশি হচ্ছে, না পেলে বিরক্ত হচ্ছে। যদি ডিন স্যারেরই মূল্যই বেশি থাকত, তাহলে তো স্যারকে দেখেই খুশি হতো, সিগনেচার দেখে না।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা করছে। নাহ! এভাবে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? ইচ্ছে হচ্ছে স্যারের চেম্বারে ঢুকে পড়ি। জীবনের সব ইচ্ছেই কি পূর্ণ হয়? হয় না। হয় না বলেই দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাছি গুনছি। মনে হচ্ছে যেন মাছিমারা কেরানি। মোবাইলটাও সাথে আনতে ভুলে গেছি; না হলে কিছুক্ষণ ফেসবুকে কাটানো যেত। ফেসবুকে থাকলে সময় ঘোড়ার গতিতে কেটে যায়। অবশ্যি ঘোড়ার গতি না বলে, চিতাবাঘের গতিও বলা যায়। চিতাবাঘ না বলে উসাইন বোল্ট বললে আরও ভালো। অনেকেই বলে—উসাইন বোল্ট নাকি চিতাবাঘের চেয়েও দ্রুত দৌড়ায়। অবশ্যি তাদের দাবি শতভাগ সত্যি নয়।

ফারিসও আমার সাথে এসেছে। দিব্যি মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ক্লান্তির কোনও ছাপ নেই। আসার সময় যেমনটা ছিল, এখনো তেমনই আছে। মোবাইলটা হাতেই। ও যে বই পড়ছে, তা আর কাউকে বলে দিতে হবে না। চুপ করে বই পড়ছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছে যেন 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি'। মোবাইল থাকায় এখন বেশ সুবিধেই হয়েছে। হার্ডকপির ঝামেলা পোহাতে হয় না। মোবাইলেই শত শত সফটকপি বয়ে বেড়ানো যায়। ইচ্ছেমতো পড়া যায়। ঝামেলা অনেক কম। সবই প্রযুক্তির অবদান।

প্রযুক্তি একদিকে যেমন পরিশ্রমীকে আরও পরিশ্রমী করেছে, তেমনই অলসকে আরও অলস করেছে।

'স্যার আপনাদের ভেতরে ডেকেছেন।' হঠাৎ ডিন স্যারের পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট আমাকে বলল।

লোকটার কথা শুনে বেশ খুশি হলাম। অবশ্যি খুশি এ জন্যে হইনি যে, লোকটা মিষ্টি ভাষায় সংবাদ এনে দিয়েছে। খুশি হয়েছি অন্য কারণে। নয়তো লোকটা যেভাবে ধমকের সুরে বলেছে, তাতে রাগ হবারই কথা। ভার্সিটির কর্মকর্তাগুলো এমনই হয়। স্টুডেন্টদের সাথে খামাখাই মেজাজ খারাপ করে কথা বলে। বলার ভাব এমন থাকে, যেন কথা বলতে টাকা খরচ হচ্ছে। আর সব কাজে দেরি করাটা তো তাদের অভ্যাস। পাঁচ মিনিটের কাজ পাঁচ দিন লাগাবে।

আমি আর ফারিস চেম্বারে ঢুকলাম। এসি রুমে ঢুকলে প্রথমে কিছুটা ঠাণ্ডা লাগে। এরপর ঠিক হয়ে যায়। তবে আমার তেমনটা মনে হলো না। গরমে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এখন বেশ স্বস্তি লাগছে। আমাদের দুজনকে দেখে স্যার বললেন, 'কী চাই?'

ফারিস বলল, 'স্যার আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে এসেছি।'

'কিসের অ্যাপ্লিকেশান?'

'একটা সেমিনার করতে চাই স্যার। ফ্যাকাল্টির গ্যালারিতে। সে জন্যে।'

'ওহ আচ্ছা। তা বসো, দাঁড়িয়ে কেন?'

'থ্যাংকয়্যু স্যার!'

'কী বিষয়ক সেমিনার?'

'নাস্তিকতা-বিষয়ক।'

'লেকচারার কে?'

ফারিস এ প্রশ্নের জবাব দিলো না। লেকচারার যে ও নিজেই, এ কথা বলতে হয়তো লজ্জা পাচ্ছে। তাই আমিই স্যারের উত্তরটা দিলাম। উত্তর শুনে স্যার খুশি হলেন, না বেজার হলেন—তা বোঝা গেল না। বড় বড় মানুষরা অনেক সময় নিজের প্রকাশভঙ্গিকে আড়াল করে রাখেন। অন্যকে বুঝতে দিতে চান না। হয়তো এর মধ্যে কোনও বিশেষত্ব আছে। যে বিশেষত্ব উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব না।

আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা হাতে নিয়ে স্যার লাল কালি দিয়ে বেশ ক-জায়গা চিহ্নিত করলেন। খুঁজে খুঁজে একটি ভুল বের করলেন। অবশ্যি ভুলটা তেমন গুরুতর নয়। এরপর বললেন, 'তোমরা কোন ইয়ারে?'

'লেভেল থ্রি সেমিস্টার টু।' ফারিস জবাব দিলো।

'গুড। তোমাদের মতো আমারও একটা ছেলে আছে। নাম অর্ণব। অর্ণব চৌধুরী। নামটা অবশ্য ওর মা রেখেছিল। জন্মের আগেই। কিন্তু ছেলেটার মুখ আর দেখে যেতে পারেনি। ও কুয়েটে পড়ে। তোমাদের ইয়ারেই। বুয়েটের শখ ছিল। পসিবল হয়নি। ওয়েটিং-এ ছিল। সিরিয়াল ওর পর্যন্ত যায়নি। দুজন আগে শেষ হয়ে গেছে।'

এ পর্যন্ত বলতেই স্যার আবেগাপ্লুত হলেন। না চাইতেও স্যার গড়গড় করে অনেক কথাই বলে দিলেন। এরপর বললেন, 'তোমাদের প্রোগ্রাম কবে?'

'১৫ই ডিসেম্বর স্যার।'

'তুমি কি ফারিস?'

ফারিস মাথা নাড়ল। ফারিসের নাম যে ডিন-অফিস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তা আমার জানা ছিল না। অবশ্যি পৌঁছানোরই কথা। ওর মতো মেধাবীদেরই স্যাররা মনে রাখেন। পর পর দুবার 'স্টুডেন্ট অব দ্যা ইয়ার' হয়েছে। ডিন স্যার ওর নাম জানবে না তো আমার নাম জানবে?

স্যার বললেন, 'শুনেছি তুমি নাস্তিকদের নিয়ে কাজ করো? অনেক নাস্তিককে নাকি তর্কেও পরাজিত করেছ? মাহফুজ মুনির স্যারকেও। সত্যিই?'

ফারিস কোনও জবাব দিলো না। স্যার বললেন, 'তুমি অনেক বুদ্ধিমান। নয়তো মাহফুজ স্যারকে পরাজিত করাটা চাট্টিখানি কথা নয়।'

ফারিস নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সুন্দর মানুষ লজ্জায় পড়লে যেমন হয়, ঠিক তেমন। নিচের দিকে তাকিয়ে রইল। ডিন স্যার বললেন, 'আমি যখন পিএইচডি করতে যাই, তখন হামজা যর্তযিসের সাথে দেখা হয়েছিল। তাঁর একটা প্রোগ্রামে আমি অ্যাটেন্ড করেছিলাম। তিনিও নাস্তিকদের নিয়ে কাজ করেন। ভালো কথা বলেন। ফিলোসোফিক্যাল আলোচনা। খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। সে অনুষ্ঠানে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। জানো কী?'

আমরা এসেছি একটা সাইন নিতে। আর স্যার আমাদের পিএইচডির গল্প শোনাচ্ছেন। স্যার যে বেশি কথা বলেন, তা বন্ধুদের থেকে শুনেছিলাম। আজ বুঝলাম। স্যারের কথা শুনে আমরা বললাম, 'কী স্যার?'

স্যার বললেন, 'সেখানে একটা মেয়ের সাথে আমার পরিচয়। মেয়েটা বাঙালি। আমাদের ভার্সিটির এক্স-স্টুডেন্ট। ওর ব্যাচটা ঠিক মনে নেই, তবে নাম মনে আছে—আনিকা। সেও স্কলার্শিপ নিয়ে পড়তে এসেছে। আমাকে দেখে নিজে থেকেই পরিচয় দিলো। পরিচয় মারফত জানা গেল—মেয়েটির একবার ইয়ার ড্রপ হয়েছিল। শুনেই তো

আমি অবাক! ইয়ার ড্রপের স্টুডেন্ট ইউকে-তে। তাও আবার স্কলার্শিপ নিয়ে? ওকে দেখে আমার কী মনে হয়েছিল, জানো?'

স্যারের কথায় হ্যাঁ বা না কিছুই বললাম না। স্যার হড়বড় করে বলেই যেতে লাগলেন,

'ওকে দেখে আমার গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেলের কথা মনে পড়ল। ম্যান্ডেল নিজেও ভার্সিটিতে পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি। ১৮৫১ সালে তাঁকে ইউনিভার্সিটি অব ভিয়েনায় পাঠানো হলো। দু-বছরের মাথায় তিনি ফেরত এলেন। অবশ্য এলেন বললে ভুল হবে, ফেরত পাঠানো হলো। পরীক্ষায় ফেইল করেছিলেন—তাই। এরপর তিনি প্রিস্টের কাজ শুরু করলেন। পাশাপাশি গবেষণা। মটরশুঁটি নিয়ে। *Pisum sativum.* তাঁর সে গবেষণার ওপরেই মডার্ন জেনেটিক্স দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মতো একটা ফেল্টু ছাত্র যদি ফাদার অব জেনেটিক্স হতে পারে, তাহলে ওই মেয়েটা তো স্কলার্শিপ পেতেই পারে। কী বলো?'

ফারিস বলল, 'জি স্যার। তা তো অবশ্যই।'

'অনেক কথাই বলে ফেললাম। কিছু মনে করোনি তো?'

'না স্যার। আমরা তো অনেক কিছু জানতে পারলাম।'

'তাহলে আরেকটা কথা বলি। মেন্ডেল গবেষণার পর একটা রিপোর্ট তৈরি করেন। ১৮৬৬ সালে তা Brno Society for the Study of Natural Science থেকে পাবলিশড করেন, Experiments in Plant Hybridization নামে। মজার ব্যাপার হলো, তাঁর গবেষণা সে সময়ে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। ফেল্টু ছাত্র ছিলেন। তাই হয়তো পাত্তা দেয়নি কেউ। সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা তাঁর এক্সপেরিমেন্ট বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর, ১৯০০ সালে, Carl Correns, Hugo de Vries, Erich von Tschermark—এ তিন জন মিলে মেন্ডেলের সূত্র সত্য প্রমাণ করেন। আসলে জ্ঞানীদের কথা বাসি হলে ফলে, তাই না?'

আগে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল, এখন বসে থাকতে থাকতে। এসির মধ্যেও যেন ঘেমে যাচ্ছি। স্যার যে গল্প শুরু করেছেন, তা যে কখন শেষ হয়—কে জানে?

হঠাৎ স্যার বললেন, 'আমি অনুমতি দিতে পারি, তবে একটা শর্ত আছে।'

ফারিস বলল, 'কী স্যার?'

'আমার সম্পর্কে তোমাকে এমন কিছু বলতে হবে যা তোমাকে আমি বলিনি। নিজ থেকে আইডিয়া করে বলবে। দেখি তুমি কতটা ব্রিলিয়ান্ট?'

স্যারের কথা শুনে আমি অবাক! কী অদ্ভুত শর্ত! আসলে যারা বেশি পড়াশোনা করে, তারা পাগল টাইপ হয়ে যায়। স্যারকে দেখে আমার তেমনই মনে হচ্ছে। নয়তো এমন শর্ত কেউ দেয়?

স্যারের প্রশ্ন শুনে ফারিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। হুইহাট উত্তর না দিয়ে, কিছুটা চিন্তা করে দেওয়াই ভালো। এদিক সেদিক হলেই সমস্যা। স্যার অনুমতি দেবেন না। আমাদের প্রোগ্রামটা হবে না। সবকিছু ভেস্তে যাবে। ফারিস কি উত্তর দেবে নাকি দেবে না—এ নিয়ে চিন্তা করছে। সে খুব ভালো চিন্তা করতে পারে। সব রকম পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখে। স্যারের প্রশ্নের উপযুক্ত একটা জবাব দেবে, এ আমার একান্ত বিশ্বাস।

ফারিস বলল, 'স্যার আপনি দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। আর আপনার একটা মেয়ে আছে।'

স্যার বললেন, 'আমার স্ত্রী মারা গেছে, তা আগেই বলেছি। তাই দ্বিতীয় বিয়ের কথাটা কাকতালীয়ভাবে মিলে যেতে পারে। কিন্তু আমার যে মেয়ে আছে, তা কী করে বুঝলে?'

'আপনার টেবিলে একটা ফুল আঁকা। ছোট্ট কাগজে। ওই যে ঠিক টেবিলটার মাঝখানে। খুব কাঁচা হাতে আঁকা। ছবিটা যে আপনার মেয়ে এঁকেছে, তা সহজেই বোঝা যায়। মেয়েরা সাধারণত ফুল, লতা এগুলো আঁকে। আর ছবিটার নিচে একটি নাম লেখা আছে—অহনা। আপনার মেয়ের নাম। অর্ণবের সাথে নামটার মিল আছে। আপনার আগের স্ত্রীকে আপনি অনেক ভালোবাসতেন। তাঁর নামও 'অ' দিয়েই ছিল। তাই আপনি উনার সাথে মিলিয়ে অহনা নামটা রেখেছেন।'

'স্ট্রেইঞ্জ, ভেরি স্ট্রেইঞ্জ!'

'মশার ব্যাপারে আপনার অ্যালার্জি আছে। মশার অত্যাচার আপনি সহ্য করতে পারেন না। তাই এসি রুমেও ইলেক্ট্রিক কয়েল জ্বালিয়ে রেখেছেন। গন্ধ আপনি পছন্দ করেন না। আতরের গন্ধও না। আমার আতরের গন্ধেও আপনি নাক কুঁচকাচ্ছিলেন। আরও একটা কথা... ।'

'কী ব্যাপার, থামলে কেন? বলো।'

'না স্যার। থাক।'

'তাহলে কিন্তু আমি সিগনেচার করব না।'

'স্যার আপনার মাথায় পরচুলা লাগানো। আপনার পিএ যখন ফ্যান ছেড়েছে, তখন থেকে বার বার মাথার দিকে হাত যাচ্ছিল আপনার। চুলগুলো ঠিক করছিলেন বার

বার। আপনার পরচুলাতে কলপ লাগানো। যাতে কেউ সন্দেহ না করে। কানের নিচে এখনো কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। কলপের দাগ।'

স্যার হয়তো আরও কিছু বলতেন। কিন্তু ফারিসের শেষ কথাটা শুনে আর কিছু বললেন না। ঘ্যাঁট ঘ্যাঁট করে অ্যাপ্লিকেশান পেপারে সাইন করে দিলেন। সাইন নিয়ে আমরা দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম। মনে হলো যেন এভারেস্ট জয় করেছি। ফারিস হলো Edmund Hillary আর আমি Tensing Norgay.

[দুই]

লেকচারের শেষটায় ফারিস বলল, 'প্রিয় উপস্থিতি! নাস্তিকতা কখনোই জীবনের সমাধান হতে পারে না। কখনো না। নাস্তিকতার পথ—অন্ধকারের পথ। এ পথ কলুষিত পথ। এ পথ মানুষকে সত্য উপলব্ধি করতে শেখায় না। মানবীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে না। অশ্লীলতা থেকে মুক্ত করতে পারে না। এ পথ মানুষকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। জীবনকে অসহনীয় করে তোলে। জীবনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করাকে বাধাগ্রস্ত করে। মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়।

হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। কিন্তু এটাই বাস্তবতা। এটাই বাস্তবতা। আশেপাশের নাস্তিকদের দিকে তাকালে, নিজেরাই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন। খুব ভালোই পারবেন। এ জন্যে টাকা খরচ করে রিচার্ড ডকিন্সের কাছে যেতে হবে না।

হুমায়ুন আজাদকে দেখুন। তার লেখা বইপত্রগুলো পড়ুন। তার সাক্ষাৎকারগুলো দেখুন। একটু ভালো করে দেখুন। দেখলেই বুঝতে পারবেন। জানতে পারবেন তার কুৎসিত লালসা সম্পর্কে। এ জন্যে অনেক জ্ঞানী হওয়ার দরকার নেই। ভার্সিটির প্রফেসর হওয়ার দরকার নেই। পিএইচডি করার দরকার নেই। তার লেখা যেকোনও একটা বই হাতে নিন। এরপর দেখুন। আমার মতো আপনাদেরও হয়তো বমি বমি ভাব হবে। একা একা তার লেখা পড়লেও লজ্জা পাবেন। নিজের কাছেই নিজের লজ্জা লাগবে।

সে এমন ছেলে, যে তার বাবার অশ্লীল জীবন নিয়ে বই লেখেছে। সে এমন নাতি, যে দাদার ব্যভিচারের কথা বর্ণনা করেছে। সে এমন বাবা, নিজের মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়েছে। সে এমন শিক্ষক, নিজের ছাত্রীকে চুষে খেতে চেয়েছে। আমি একটুও বানিয়ে বলছি না। একটুও না। তার বই থেকেই বলছি। নিজে থেকে না।

প্রিয় উপস্থিতি! তসলিমা নাসরীনের দিকে তাকান। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকান। পতিতাদের মতো একটা অশ্লীল জীবন ছাড়া আর কিছুই পাবেন না। সে এমন নির্লজ্জ ছিল যে, নিজের একান্ত গোপন কথাগুলোও বলে বেড়াত। বইপত্রে বর্ণনা দিত। নিজের

স্বামীর পতিতালয়ে যাওয়ার কাহিনিটাও তার লেখা থেকে বাদ যায়নি। বাদ যায়নি নিজের পতিতা হওয়ার গল্পটাও। এমনকি তার স্বামীর যৌনরোগটাও। এগুলো লেখে সে মজা পেত। আসলে অশ্লীলতা যার নিত্য সঙ্গী, তার তো এগুলো ভালো লাগবেই।

প্রিয় উপস্থিতি! আহমদ শরীফের দিকে তাকান। একই দৃশ্য আপনার সামনে ভেসে উঠবে। মিথ্যাচার তো বটেই, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ছড়াতেও সে পিছপা হয়নি। বাবরী মসজিদ ভাঙার পর ইন্ডিয়ায় দাঙ্গা শুরু হয়। এ দেশেও পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়। কিন্তু সচেতন নাগরিকদের কারণে সহিংস কোনও ঘটনা ঘটেনি। পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পর তা আবার উত্তপ্ত করার চেষ্টা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক সংঘাত। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। এ কুচক্রী মহল বিভিন্ন লিফলেট, ছোটখাটো বই, আর পত্রিকার মাধ্যমে সংঘাত উসকে দেওয়ার চেষ্টা করে। তেমনই একটি পত্রিকার নাম পাক্ষিক দিকপাল। পত্রিকাটির শিরোনাম ছিল 'সাম্প্রদায়িকতার শিকার হিন্দু সম্প্রদায়'। এ নামে তারা সম্পূর্ণ ভুয়া একটি খবর প্রকাশ করে। যেখানে তারা দাবি করে—নিরাপত্তার অভাবে এক শ'র অধিক হিন্দু পরিবার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে আশ্রয় নিয়েছে। অথচ এমন কিছুই হয়নি। সম্পূর্ণ ভুয়া খবর এটি। পত্রিকাটি ২৪ রাধিকা মোহন বসাক লেন থেকে প্রকাশিত হতো। যার উপদেষ্টা ছিল—আহমদ শরীফ।

এভাবে বলতে থাকলে কথা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। যেহেতু সময় শেষের দিকে, তাই আর লম্বা করতে চাচ্ছি না। যারা নাস্তিকতার দিকে পা বাড়াচ্ছেন, তাঁদের একটু সচেতন হতে বলব। একটু চৌকানা হন। বুঝেশুনে পা বাড়ান। আপনি যে পথে যাচ্ছেন, সে পথ আপনাকে কিছুই দেবে না। শুধুই অমানুষ করে দেবে। তাই ফিরে আসুন আলোর দিকে। উপভোগ করুন জীবনটাকে।'

ফারিসের কথা শেষ হলো। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব। যার জন্যে আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। অনুষ্ঠান পরিচালনটাও আমাকেই করতে হবে। কথা ছিল মারুফ করবে। রাতে হঠাৎ জ্বর উঠেছে। অবশ্যি জ্বর নিয়েও সে প্রোগ্রামে এসেছে। কিন্তু কথা বলার মতো শক্তি নেই। তাই উপস্থাপনার দায়িত্ব আমাকেই দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ মিনিট বিরতি দিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলো। ফারিস মাইকের সামনে এসে দাঁড়াল। শ্রোতাদের সারিতে দুটো মাইক দেওয়া হলো। এরপর মাইকে এ পর্বের নিয়মগুলো বলে দেওয়া হলো। প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলো।

'আমি নাজিম। অ্যাকাউন্টিং-এ আছি। ফাইনাল ইয়ার। ভার্সিটিতে এ ধরনের প্রোগ্রাম আগে কখনো হয়নি। এটাই ফার্স্ট। হলে হয়তো ভালো হতো। আমি অনুষ্ঠানটির আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মেনি মেনি থ্যাংস। আমার প্রশ্ন হলো, ইসলামে শিরশ্ছেদের বিষয় নিয়ে। এ পদ্ধতিটা বেশ অমানবিক। মৃত্যুদণ্ড যদি

দিতেই হয়, তাহলে অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। মানুষকে বেঁধে একবারে মাথা থেকে দেহকে বিচ্ছিন্ন করাটা—কেমন জানি বিশ্রী দেখায়।'

নাজিম ভাইয়ের প্রশ্ন শুনে ফারিস তার স্বভাবসুলভ হাসিটা উপহার দিয়ে বলল, 'অনেক সুন্দর একটি প্রশ্ন। আমরা অনেকেই রবের হুকুমের হিকমাহ সম্পর্কে জানি না। জানতে চেষ্টাও করি না। ফলে দেখা যায় শত্রুপক্ষের কথায় প্রভাবিত হয়ে যাই। বিভ্রান্ত হয়ে যাই। নিজের দ্বীন নিয়ে সন্দেহে পড়ে যাই। আমাদের আরেকটু সচেতন হতে হবে। শত্রুরা যে ইন্দ্রজাল পেতেছে, তা ছিন্ন করতে হবে।

এবার আপনার প্রশ্নে আসা যাক। আমরা জানি মৃত্যুদণ্ডের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেমন : ফাঁসি, ইলেকট্রিক শক, কেমিক্যাল সাবস্ট্রেন্ট প্রয়োগ ইত্যাদি। অনেক দেশেই এগুলোর মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অবশ্য মধ্যযুগে এরচেয়ে অনেক বীভৎস পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কিন্তু ইসলাম এসে তা পরিবর্তন করেছে। এখন প্রশ্ন হলো—ইসলাম কেন শিরশ্ছেদকে বেছে নিয়েছে? আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমাদের কিছু জিনিস ক্লিয়ার হতে হবে।

আমাদের দেহের পিঠের দিকে স্পাইনাল কর্ড থাকে। অবশ্য স্পাইনাল কর্ডের একটা ভালো বাংলা আছে, এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। এই স্পাইনাল কর্ড দিয়ে সেন্সরি নার্ভাস সিস্টেম কাজ করে। দেহের কোথাও ব্যথা অনুভব হলে, স্পাইনাল কর্ড দিয়েই মস্তিষ্কে পৌঁছায়। স্পাইনাল কর্ডের সাথে যদি মস্তিস্কের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে কোনও ব্যথাই অনুভব হবে না। আপনি যে পদ্ধতিতেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন না কেন, আসামির কষ্ট হবেই। যতক্ষণ স্পাইনাল কর্ডের সাথে ব্রেইনের সংযোগ থাকবে, ততক্ষণ ব্যথা হতেই থাকবে। ফাঁসি, ইলেকট্রিক শক কিংবা অন্য কোনও পদ্ধতিতে ব্রেইনের সাথে স্পাইনাল কর্ডের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় না। ফলে মারা যাওয়ার মুহূর্তগুলোতে আসামির ভয়ানক কষ্ট হয়।

কিন্তু ইসলামে আগে স্পাইনাল কর্ডের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ফলে আসামির কোনও কষ্ট হয় না। যন্ত্রণা হয় না। আর স্পাইনাল কর্ড এর ওপরে যে হাড়ের আবরণ আছে, তা এতটা শক্ত নয়। এখানে অনেকগুলো ভাগ আছে। এগুলোকে ভার্টেব্রা বলে। স্পাইনাল কর্ড বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার সময়—আসামির খুব কম কষ্ট হয়। খুবই কম। একে বিনা কষ্টে মৃত্যু বলা যায়। এখন আপনিই বলুন, ইসলামের এ পদ্ধতি কি অমানবিক? বর্বর? মধ্যযুগীয়?

ভাই হয়তো উত্তরটা পেয়েছেন। স্পাইনাল কর্ডের বাংলা মনে পড়েছে—সুষুম্নাকাণ্ড।'

এরপর দ্বিতীয় মাইক থেকে একজন প্রশ্ন করল, 'আমি সিফাত। বোটানি, সেকেন্ড

ইয়ার। আপনি বলেছেন, নাস্তিকতা মানুষকে আলোর পথ দেখায় না। এই পয়েন্টটার সাথে আমি অ্যাগ্রি করতে পারলাম না। ডেনমার্ক ও সুইডেনে নাস্তিকতার হার অনেক বেশি। কিন্তু এরা সুখী রাষ্ট্র। শুধু সুখীই না, অপরাধও অনেক কম।'

এক ফালি হেসে নিয়ে ফারিস বলল, 'আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আপনি এ তথ্যটা অভিজিৎ রায়ের বই থেকে বলছেন। তাই তো?'

সিফাত ভাই কোনও জবাব দিলেন না। ফারিস যে ঠিক বলছে, চুপ থাকাটাই এর প্রমাণ।

ফারিস বলল, 'এটা কোনও সমস্যা না। আপনি যে কারও বই পড়তেই পারেন। এটা আপনার পার্সোনাল বিষয়। তবে সে বইয়ের সব তথ্যকেই নির্ভুল মনে করবেন না। এটা মারাত্মক বিষয়। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম—এটি আপনারই দাবি। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, খোদ ইউরোপের রিপোর্টই আপনার দাবি মিথ্যে প্রমাণ করে দিচ্ছে। European Agency for Fundamental Rights তাদের ২০১৪ সালের একটি রিপোর্টে বলেছে—"Sweden and Denmark, 80 to 100 percent of people said, they were sexually harassed as adults—the highest anywhere in the continent." এখন বলুন তো আমরা কার কথা বিশ্বাস করব? যাদের দেশ তারাই যদি এ কথা বলে, তাহলে আমরা কী করতে পারি? আমরা কীভাবে আপনার কথা মেনে নিতে পারি? যে দেশের শতকরা আশি থেকে এক শ ভাগ মানুষ যৌনহেনস্তার শিকার হয়, তাদের আপনি ভালো দেশ বলে সার্টিফাই করে দিচ্ছেন? এ কেমন কথা?'

এবারের প্রশ্নটা আবার প্রথম মাইক থেকে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ছেলেটা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। বেশ হ্যাংলাপাতলা। বাচ্চা-বাচ্চা ভাব চেহারা থেকে এখনো যায়নি। ছেলেটি বলল, 'আমার নাম তাহসান। আপনার ফ্যাকাল্টিতেই পড়ি। আমার একটা প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নটা হলো, নাস্তিকতা যদি এতই খারাপ হতো, তাহলে তা বিশ্বের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং রিলিজিয়ন হতো না। বিশ্বের অনেক মানুষ নাস্তিক হচ্ছে। নাস্তিকতার গ্রোথ ইসলামের চেয়েও বেশি। থ্যাংস।'

ফারিস বলল, 'নাস্তিকতা কি ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং রিলিজিয়ন? নাস্তিকতার গ্রোথ কি ইসলামের চেয়ে বেশি? এর উত্তর হবে, না। নাস্তিকতা কখনোই ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং রিলিজিয়ন না। এথিইজমের গ্রোথ ইসলামের থেকে বেশি না। অবশ্য এটা আমাদের দাবি না। বানানো কোনও তথ্যও না। Pew Research Center তাদের প্রতিবেদনে বলেছে—Islam is the fastest growing religion in the world. শুধু ইউরোপের দিকে তাকালেই আপনার কাছে তা স্পষ্ট হবে। মুসলিমবিশ্বের দিকে

তাকানোর দরকার নেই। তুরস্ক বাদে ইউরোপে ১৯৯০ সালে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল তিরিশ মিলিয়ন। ২০১০ সালে হয়েছে ৪৪ মিলিয়ন। Pew Research Center আরও জানিয়েছে—২০১৩ সালে ইউরোপে মুসলিমদের সংখ্যা হবে প্রায় ৫৮ মিলিয়ন। তাহলে নাস্তিকতাকে যদি আমরা একটা রিলিজিয়ন ধরি, তাহলে এটা কখনোই বলা সম্ভব না যে, Atheism is the fastest growing religion in the world.

আপনি মনে হয় উত্তরটা পেয়েছেন। ধন্যবাদ।'

তাহসানের পর প্রশ্ন করার জন্যে স্পর্শ দাঁড়াল। স্পর্শ মামু স্যারের মুরিদ। একান্ত মুরিদ। অন্যদের মতো সে প্রশ্ন করল না। একটা চিরকুট লেখে আমাকে দিলো—ফারিসকে দেওয়ার জন্যে। চিরকুটটা ফারিসকে দিলাম। চিরকুটটা পেয়ে ফারিসকে কিছুটা চিন্তিত দেখাল। ফারিসের চিন্তিত মুখ দেখে স্পর্শের মুখে মিটিমিটি হাসির উদয় হলো। অবশ্যি এ হাসি মিষ্টি হাসি নয়। বদমায়েশি হাসি। সিনেমায় যাকে ভিলেনের হাসি বলে। স্পর্শের ভাব দেখে মনে হলো, ও ফারিসকে জব্দ করে ফেলেছ। পরিচালনার দায়িত্বটা আমার কাঁধে দেখে ফারিসের কাছে যেতে পারলাম না। তাই কী হয়েছে আন্দাজ করা গেল না।

পরবর্তী প্রশ্নটা এল। প্রশ্ন করলেন মাস্টার্সের বড় ভাই। আমাদের ফ্যাকাল্টির না, অন্য ফ্যাকাল্টির। তিনি বললেন, 'কেন সবাইকে মুহম্মদ সাহেবের সুন্নত ফলো করতে হবে?'

ফারিস এর জবাবে বলল, 'আপনি যদি মুসলিম হতে চান, তাহলে এটা আবশ্যক। এখানে কোনওপ্রকার ছাড় নেই। আপনাকে অবশ্যই মুহাম্মাদের ﷺ সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। আর যদি অমুসলিম হন, তাহলে আপনার ইচ্ছে। তবে মুহাম্মাদ ﷺ কেবল মুসলিমদের নবী নন। তিনি সবার জন্যে নবী হিসেবে এসেছেন। সমস্ত সৃষ্টির জন্যে। সে হিসেবে আপনি তাঁর সুন্নাহ মানতে পারবেন। আপনার নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে, আপনি সনাতন ধর্মের। তাই আপনাকে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝাচ্ছি না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বোঝাচ্ছি।

মুহাম্মাদের ﷺ সুন্নাহ অনুসরণ করলে কেবল পরকালীন মুক্তি নয়, দুনিয়াতেও আপনি শান্তিতে থাকতে পারবেন। আপনার জীবন সুন্দর হবে। এখানে তো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না, আপনাকে একটা সিম্পল উদাহরণ দিচ্ছি। মুহাম্মাদের ﷺ সুন্নাহ হলো, শিশু জন্ম নিলে তার মুখে মিষ্টিজাতীয় কিছু দেওয়া। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জানিয়েছে—জন্মের পর মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য শিশুর মস্তিষ্কের জন্যে ভালো। এর ফলে শিশুদের ব্রেইন ড্যামেজের হাত থেকে রক্ষা পায়। মুহাম্মাদের ﷺ সুন্নাহ

হলো—খাবার চেটে খাওয়া। কেন জানেন? কারণ, খাবারের কোন অংশে বারাকাহ্ থাকে, তা আমরা জানি না। এর উপকারিতাও আছে। আমরা জানি, প্রোটিনের ধর্ম হলো সেডিমেন্ট হওয়া। আপনি যদি প্লেট না চেটে খান, তাহলে প্রোটিনের আসল নির্যাস থেকে বঞ্চিত হবেন। এভাবে নবীজি মুহাম্মাদের ﷺ প্রত্যেকটি সুন্নাহ্ আপনার জন্যে কল্যাণকর। আপনি যদি তাঁর সুন্নাহ্ ফলো করতে পারেন, তবে আপনার জীবন অবশ্যই সুন্দর হবে।'

এ পর্যন্ত বলে ফারিস শেষ করে দিলো। ফারিসের কথা শেষ হলে আমি বললাম, 'ফারিসের উত্তরের সাথে আমি একটু যোগ করতে চাই। নবীজির ﷺ সুন্নাহ হলো প্রাণীকে স্পাইনাল কর্ডের বিপরীত দিক থেকে জবাই করা। মানে ইসোফ্যাগাস এবং ট্রাকিয়াল রিজিয়ন দিয়ে কাটা।

কেন? কারণ, এই রিজিয়নে ব্লাড ভেসেল থাকে। যেগুলোর কাজ হলো, মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করা। যখন এই ব্লাড ভেসেলগুলো কেটে দেওয়া হবে, তখন ব্রেইনে ব্লাড সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু স্পাইনাল কর্ড না কাটায়—নার্ভ সচল থাকবে। ফলে ব্রেইন ব্লাডের জন্যে সিগন্যাল দিতে থাকবে। এই সিগন্যাল থেকে হার্ট অনবরত পাম্প করবে। ফলে ব্লাড মস্তিষ্কে আসতে থাকবে।

যেহেতু ব্লাড ভেসেল কেটে দেওয়া হয়েছে, তাই ব্লাড বাইরে বেরিয়ে যাবে। এভাবে কিছুক্ষণ পর প্রাণীর দেহ থেকে সব ব্লাড বেরিয়ে যাবে। দেহে রক্ত জমে থাকবে না। রক্ত জমাটবাঁধা গোশত আমাদের জন্যে ক্ষতিকর। অস্বাস্থ্যকর। জবাই না করে যদি বলি দেওয়া হয়, মানে একবারে দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেলা হয়, তাহলে এই সুবিধে পাওয়া যাবে না। প্রাণিদেহে রক্ত থেকে যাবে। তাই বলি না দিয়ে জবাই করে খাওয়াটা বেশি স্বাস্থ্যকর। ফারিসের সাথে সাথে আমিও বলব, নবী মুহাম্মাদের ﷺ সুন্নাতেই আমাদের কল্যাণ।'

আমার কথা শেষ হতেই স্পর্শ গ্যালারি থেকে বের হয়ে গেল। স্পর্শ কেন চলে গেল, তা আন্দাজ করতে পারিনি।

প্রোগ্রাম শেষে আমি ফারিসকে স্পর্শের চিরকুটটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। ও আমাকে চিরকুটটা দেখাল। চিরকুটে লেখা—'ফারিস! শিরশ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া যদি কম কষ্টকরই হয়, তাহলে প্রাণী জবাই করার ক্ষেত্রে এই রুলটা ফলো করিস না কেন? পারলে জবাব দে। না পারলে তোর প্যাঁচাল এখানেই বন্ধ কর।'

ফারিস বলল, 'ওর প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল না। তাই একটু চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। মনে মনে আল্লাহর কাছে দোআ করলাম, তিনি যাতে উত্তরটা মনে করিয়ে দেন। আলহামদুলিল্লাহ। তিনি তোর মুখ থেকে উত্তরটা বের করলেন।'

ওমা! এ কী! পানি এল কোথা থেকে? হঠাৎ চোখেমুখে পানি ছিটাচ্ছে কে?

'কে কে?'

'উঠ। আর কত ঘুমাবি? ফজরের সময় হয়েছে। মসজিদে যাবি না?'

চোখ খুলে দেখি মা বসে আছেন বিছানার পাশে। প্রতিদিনের মতো মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। ডাকছেন ফজরের জন্যে। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি জামাতের আর পাঁচ মিনিট আছে। দ্রুত উঠে পড়লাম।

ফজরের সালাতের পর মনটা ফ্রেশ থাকে। দিন গড়ালে মেজাজ খিটখিটে হয়। আসরের পরে বেশি খারাপ হয়। মাগরিবের পর থেকে আবার ফ্রেশ। কিন্তু সেদিন এর ব্যতিক্রম হলো। ফজরের পরেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারণটা অবশ্যি ফারিসের ফোন। ফোনে ফারিস জানাল, আমাদের প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল্ড। মামু স্যার ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে ডিন স্যারকে ফুসলিয়েছে। ওদের দাবি—ভার্সিটিতে এ ধরনের প্রোগ্রাম হলে ধর্মান্ধের সংখ্যা বেড়ে যাবে। মুক্তচিন্তা বাধাগ্রস্ত হবে। ছেলেপুলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বে। তাই এ অনুষ্ঠান ক্যান্সেল।

তথ্যসূত্র :

◆ 1) মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : পানীয় বস্তু, হাদীস নং : ৫১৯৫।

◆ 2) Johannes W. Rohen, Chihiro Yokochi, Elke Lutjen-Drecoll, *Color Atlas of Anatomoy*; (Lippincott Williams & Wilkins, 7th ed., 2011).

◆ 3) R.K. Ghosh, *Primary Veterinary Anatomy;* (New Fine Books Centre, Kolkata, 2nd ed., 2006).

◆ 4) https://www.americanprogress.org/issues/religion/report//08/2011 10165/26/fear-inc/

◆ 5) https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/20/islamophobia-funding-cair-berkeley-report

◆ 6) "The future of the global Muslim population—Europe (excluding howeverTurkey and including Siberian Russia)" (http://www.pewforum.org/27/01/2011/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe/

◆ 7) https://www.verywell.com/how-we-feel-pain2564638-

◆ 8) http://www.livescience.com/-10767execution-science-kill-person.html

সংবিৎ

[এক]

কিছুদিন আগের ঘটনা। মিল্ক কেমিস্ট্রি ক্লাসে স্যার আমাদের Spoilage of milk সম্পর্কে পড়াচ্ছিলেন। দুধের জৈব উপাদানগুলো মাইক্রো-অর্গানিজমের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হলে, তাকে Spoilage of milk বলা হয়। স্যার বললেন, 'দুধের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা কিছু Anti-spoilage এজেন্ট দিয়েছেন, যাতে দুধ Spoil হতে না পারে। যেমন : Lactoperoxidase, Lisogyme, Aglutinine ইত্যাদি।'

অর্ক আর ফারিস পাশাপাশি বসা ছিল। ক্লাস শেষ হতে না-হতেই অর্ক বলল, 'এভাবে বলাটা স্যারের ঠিক হয়নি।'

ফারিস মুচকি হেসে বলল, 'স্যার স্রষ্টার কথা বলেছেন বলে খুব লেগেছে নাকি?'

স্যারের মুখে স্রষ্টার কথা শুনে, অর্কের মনটা বেশ খারাপ ছিল। ফারিসের এ কথা যেন—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো মনে হলো। তাই বেশ উঁচু গলায় বলল, 'তোকে বলেছি না, স্রষ্টা বলে কিছু নেই?'

ফারিস বলল, 'নেই কেন?'

'আমরা জড়বস্তু থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছি। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় স্রষ্টার কোনও আবশ্যকতা নেই।'

অর্ক আবার সেই পুরাতন টেপ বাজাতে শুরু করেছে। আমি অর্ককে কিছু বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফারিস বাধা দিলো।

অর্ক আমাদের ক্লাসমেট। ও সংশয়বাদী না নাস্তিক, তা অবশ্যি বলা কঠিন। একেক সময় সে একেক ধরনের কথাবার্তা বলে। নিজেই এখনো ঠিক করতে পারেনি ও কোন দলে। অর্ক আর ফারিসের প্রায়ই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হতো। তবে পরাজয়ের মালাটা অবশ্যি অর্ককেই বরণ করে নিতে হতো।

পরের ক্লাসটা হবে না বিধায় এক ঘণ্টা পাওয়া গেল। যে যার যার মতো কাজে ব্যস্ত

হয়ে গেল। ফারিসকে দেখলাম বারান্দায়। বসে বসে কী যেন পড়ছিল। বারান্দায় মিষ্টি রোদের হাতছানি। শীতের সকালের মিষ্টি রোদ, কার না ভালো লাগে? তাই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমিও ওর পাশে বসলাম। নাইমও আমাদের সাথে যোগ দিলো।

ফারিস *Fundamentals of Biochemistry* বইটা থেকে কী জানি নোট করছিল। কিছুক্ষণ পর অর্কও এল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছিল। আমাদের দেখে এদিকে এল। বাইরে বসার মতো কোনও চেয়ার নেই। তাই পেছনের দরজা দিয়ে একটা চেয়ার বের করে আমাদের পাশে বসল।

অর্ক বসার পর ফারিস বলল,'আচ্ছা অর্ক। তুই কি বলতে পারবি, *Fundamentals of Biochemistry* বইটা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?'

অর্ক জবাব দিলো, 'এটা কোনও প্রশ্ন হলো? এটা তো যে কেউ বলতে পারবে।

'বল তো শুনি।'

'Donald Voet, Judith G. Voet এবং Charlotte W. Pratt এই তিন জন বায়োকেমিস্ট মিলে বইটা লিখেছেন। আর John & Sons company বইটা ছেপেছে। অনেক উপকারী একটি বই। যারা বায়োকেমিস্ট্রি সম্পর্কে জানতে চায়, তাদের জন্যে খুবই ভাল একটা বই। বইটায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুন্দরভাবে জটিল বিষয়গুলো বোঝানো হয়েছে। বিশেষ করে ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো।'

ফারিস না থামালে মনে হয়, অর্ক বইটা নিয়ে একটা রচনা লিখে ফেলত। ফারিস ওকে থামিয়ে বলল, 'ইউ আর টোটালি রং। তোর উত্তরটা ঠিক হয়নি।'

'কেন? ঠিক হবে না কেন?'

'বইটা কেউ লিখেনি। কোনও কোম্পানি এটাকে ছাপায়নি। আমাদের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি যখন বানানো হচ্ছিল, তখন হঠাৎ দেয়ালের একটি ইট খসে পড়ে—বিবর্তনের মাধ্যমে বইটা সৃষ্টি হয়।'

ফারিসের কথা শুনে অর্ক এত জোরে অট্টহাসি হাসছিল যে, ক্লাসে যারা ছিল তারা চোখ বড় করে ওর দিকে তাকাচ্ছিল। আমি অর্কের হাত ধরে বললাম, 'আস্তে।'

অর্ক হাসতে হাসতে বলল, 'তোর বন্ধু পাগল হয়ে গেছে। ফারিস পাগল হয়ে গেছে। হা হা হা। বারো শ পৃষ্ঠার বই নাকি দেয়ালের ইট খসে পড়ে সৃষ্টি হয়েছে। হা হা হা। বইটা লেখার জন্যে নাকি কোনও লেখকের দরকার হয়নি। হা হা হা। এত কমপ্লেক্স ইনফরমেটিভ বইটা কি এমনি এমনি সৃষ্টি হতে পারে? হা হা হা।'

অর্কের কথা শুনে আমিও কেমন জানি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। ফারিসকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ও অর্ককে বলল, 'পারে, পারে। অবশ্যই পারে।'

অর্ক ভ্রু কুঁচকে বলল, 'মানে!'

ফারিস জবাব দিলো, 'মানেটা খুব সোজা। তুই তো DNA সম্পর্কে পড়েছিস, তাই না?'

'হ্যাঁ পড়েছি। কিন্তু হঠাৎ DNA?'

'বল তো DNA কী।'

'কী আবার? কোষের কেন্দ্রে থাকা DNA নিউক্লিয়াসের উপাদান।'

'এর আরও একটা পরিচয় আছে।'

'কী সেটা?'

'ডেটা ব্যাংক। যা বংশগতির সমস্ত তথ্য বহন করে। আর শুধু বংশগতি নয়, একজন মানুষের শারীরবৃত্তীয় যত প্রক্রিয়া ঘটবে, তার সবটাই DNA-তে কোড করা থাকে।'

'এটা তো জানি।'

'তা হয়তো জানিস। কিন্তু এর মধ্যে যে কতটা ইনফরমেশন থাকে, তা তো জানিস না।'

নাইম পাশ থেকে বলল, 'কেমন ইনফরমেশন থাকে বন্ধু?'

ফারিস জবাব দিলো, 'DNA-তে যে ইনফরমেশন আছে তা যদি লেখা হয়, তাহলে ৯০০ ভলিউমের এনসাইক্লোপিডিয়ার দরকার হবে। যেখানে প্রতিটি ভলিউমের পৃষ্ঠা হবে পাঁচ শ।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

'ইয়েস, রিয়েলি ইন্টারেস্টিং।'

'বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে বলবি? বুঝতে সুবিধা হতো।'

'আচ্ছা বলছি। DNA-র পূর্ণরূপ হলো ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড। যা অ্যাডেনিন, সাইটোসিন, গুয়ানিন ও থায়ামিন নাইট্রোজেন বেইজ দিয়ে গঠিত। এ বেইজগুলো ডি-অক্সিজেনেট রাইবোজ-এর সাথে যুক্ত থাকে। যাদের নিউক্লিওসাইড বলে।'

অর্ক কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'প্রতিটি নিউক্লিওসাইডের রাইবোজ সুগারে ফসফেট

যুক্ত হলে, গঠিত হয় নিউক্লিওটাইড। এই নিউক্লিওটাইড-ই হলো DNA-এর গাঠনিক একক। এ রকম একেকটি নিউক্লিওটাইড পাশাপাশি বসে যে পলি-নিউক্লিওটাইড চেইন গঠন করে, তাকেই DNA বলে।'

ফারিস বলল, 'এক একটি DNA মলিকুলে কতগুলো বেইজ পেয়ার থাকে?'

অর্ক জবাব দিলো, 'প্রায় তিন বিলিয়ন বেইজ পেয়ার থাকে। আর নিউক্লিওটাইডগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে ডাবল হেলিক্স গঠন করে। ডাবল হেলিক্স-এ পাশাপাশি দুটি চেইন থাকে। চেইন দুটির একটির অ্যাডেনিন অপরটির থায়ামিনের সাথে এবং একটির সাইটোসিন অপরটির গুয়ানিনের সাথে যুক্ত থাকে—হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে।'

অর্কের কথা শেষ হলে নাইম বলল, 'সেই ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছিলাম। এখন সব মনে পড়েছে।'

ফারিস নাইমকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমাকে বল, প্রত্যেকটা নিউক্লিওটাইড-এ কতগুলো এটম থাকে।'

নাইম কিছু বলতে যাবে, এমন সময় অর্ক বলল, 'ইটস ইজি আনসার। ৩৪টি এটম থাকে।'

'এবার বল, একটি DNA-তে কতগুলো নিউক্লিওটাইড থাকে।' ফারিস জিজ্ঞেস করল।

মনে হচ্ছে অর্কের উত্তরটা জানা নেই, তাই চুপ করে আছে। অর্কের নীরবতা দেখে উত্তরটা ফারিস-ই দিলো। সে বলল, 'একটি DNA-তে ছয় শ কোটি নিউক্লিওটাইড থাকে।'

'ছয় শ কোটি!' নাইম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ফারিস উত্তরে বলল, 'হুঁ, ছয় শ কোটি। আরও মজার ব্যাপার কী জানিস?'

'কী?'

'দুই শ কোটি এটমকে কেমিক্যালি কম্বাইন্ড হতে হয়, একটা সিংগেল DNA মলিকুল গঠনের জন্যে। এক একটা সিংগেল DNA মলিকুল বানাতে কত সময়ের দরকার হবে জানিস?'

'না রে। তুই বল।'

'তুই যদি একটি এটমকে এক সেকেন্ডে প্রসেস করতে পারিস, তাহলে দৈনিক আট ঘণ্টা ব্যয় করে, এ কাজ শেষ করতে সময় লাগবে—বিশ হাজার বছরের বেশি।'

'এত্ত জটিল!'

'আমার কাছে আরও জটিল তথ্য আছে। শুনবি?'

'শুনব না মানে? আলবত শুনব। তাড়াতাড়ি বল।'

'মানবদেহের একটি কোষের DNA-তে প্রায় দুই লক্ষ জিন থাকে।'

'দুই লক্ষ!'

'হ্যাঁ, দুই লক্ষ। এই জিনগুলো মিলে প্রায় দুই লাখ প্রোটিনের কোড বহন করে। এসব কোড কোষের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। একটি মাঝারি ধরনের প্রোটিন প্রায় তিন শ অ্যামাইনো এসিড বহন করে। এটাকে যে DNA জীন নিয়ন্ত্রণ করে, তার চেইনে এক হাজার নিউক্লিওটাইড থাকে। বল তো, একটি DNA চেইনে কত প্রকার নিউক্লিওটাইড আছে?'

'চার প্রকার?'

'হ্যাঁ, চার প্রকার। তাহলে আমরা বলতে পারি ১০০০ লিংক যুক্ত যে নিউক্লিওটাইড আছে, তা বিন্যস্ত হতে পারে $৪^{১০০০}$ উপায়ে।'

'ভাই রে, এটা তো ক্যালকুলেটরে ধরবে না।'

'ঠিক বলেছিস। সত্যিই ধরবে না। এর উত্তরটা হবে $১০^{৬০০}$, এই সংখ্যাটা আমাদের হিসাবের বাইরে। আরও মজার কথা কী, জানিস? এই হিসাবটা আমার না। বিশিষ্ট বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী Frank Salisbury হিসাবটা বের করে দেখিয়েছেন।'

অর্ক হয়তো ফারিসের কথার প্রতিবাদ করত। কিন্তু Frank Salisbury'র নাম শুনে কিছু বলার সাহস পেল না। ফারিস বলল, 'একের পর যদি ৬০০ শূন্য হয়, তাহলে দৈবভাবে নিউক্লিওটাইডের গঠন হওয়ার সম্ভাব্যতা কত?'

'শূন্য।' নাইমের ঝটপট উত্তর।

উত্তর শুনে ফারিস বলল, 'ভেরি গুড। তুই তো গণিতে বেশ দক্ষ। আমাদের দেহের DNA কতটুকু লম্বা তা কি জানিস?'

'একটু দাঁড়া। মনে করার চেষ্টা করি। সেদিন জেনেটিক্স ক্লাসে স্যার পড়িয়েছিলেন। না, মনে পড়ছে না।'

অর্ক বলল, 'এটা মনে নেই? ২×১০^{১০} কিলোমিটার লম্বা।'

'তুই তো বেশ ভালো মনে রেখেছিস। এই দূরত্ব এতই বিশাল যে, পঞ্চাশ বারের বেশি পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত আসা-যাওয়া করা যাবে। আরেকটা কথা। বলতে ভুলেই গেছিলাম। এক গ্রাম DNA-তে কী পরিমাণ তথ্য আছে, বলতে পারবি?'

অর্ক না-সূচক মাথা নাড়ল। উত্তরটা ওর জানা নেই। তাই ফারিস বলল, 'মাত্র এক গ্রাম DNA-তে যে তথ্য আছে, তা যদি সিডিতে নেওয়া হয়, তাহলে মোট এক ট্রিলিয়ন সিডি লাগবে। কেউ যদি এ ইনফরমেশন টাইপ করতে চায়, তাহলে কেমন সময় লাগবে?'

অর্ক একটু সময় নিয়ে বলল, 'যদি প্রতি মিনিটে ৩০০ বর্ণ টাইপ করা হয়, তাহলে দৈনিক আট ঘণ্টা ব্যয় করার পর মোট সময় লাগবে—সাতান্ন বছর।'

ফারিস বলল, 'চিন্তা করেছিস, বিষয়টা কত্ত জটিল?

ফারিসের কথা শেষ হতেই অর্ক বলল, 'তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস, Origin of life is nothing but a miracle?'

ফারিস জানে ও যা-ই বলুক না কেন, অর্ক মেনে নেবে না। বিচার মানি কিন্তু তালগাছটা আমার; অন্যান্য নাস্তিকদের মতো অর্কের অবস্থাও এমন। তাই অর্কের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুই কি Francis Crick এর নাম শুনেছিস?'

অর্ক জবাব দিলো, 'শুনব না কেন? বিখ্যাত বায়োকেমিস্ট। James Waston, Rosalind Franklin, Maurice Wilkins আর তিনি মিলে—১৯৫৩ সালে ডাবল হেলিক্স স্ট্রাকচার আবিষ্কার করেন। পরে নোবেল প্রাইজ পান।'

'Crick-এর *Life Itself* বইটা পড়েছিস?'

'নাহ, পড়িনি। *Introduction to Genetics* বইটা খুঁজতে গিয়ে, লাইব্রেরিতে বইটা দেখেছিলাম।'

'Crick অরিজিন অব লাইফ সম্পর্কে *Life Itself* বইতে বলেছেন, "যে ব্যক্তি এখন পর্যন্ত যত জ্ঞান আছে তা আয়ত্ত করেছে, সে কেবল এটাই বলতে পারবে যে, জীবনের উৎপত্তি মিরাকল ছাড়া কিছুই নয়।"'

অর্কের শেষ টোপটাও মনে হয় অকেজো হয়ে গেল। যিনি DNA-র জটিল কাঠামোর আবিষ্কারক, তিনিই স্বীকার করছেন, জীবনের উৎপত্তি মিরাকল। ফারিস বলল, 'Prof. Phillip Johnson বলেছেন, In the beginning was the Word-এর মতো একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্যও কখনো র‍্যান্ডমলি সৃষ্টি হতে পারে না। এর জন্যে স্রষ্টা থাকতে হয়। এতক্ষণ আমরা যে DNA নিয়ে আলোচনা করলাম, তার গঠন কি এই ১২৪৮ পৃষ্ঠার কেমিস্ট্রি বইটা থেকেও জটিল নয়?'

এই বলে ফারিস তাঁর হাতের *Fundamentals of Biochemistry* বইটা তুলে ধরল। অর্ক এবারও কিছু বলল না। হ্যাঁ কিংবা না, কিছুই না। ফারিস বলল, 'DNA-এর গঠন কতটা জটিল। কত কোটি কোটি ইনফরমেশন একটা DNA-তে

কোডিং করা থাকে। যদি DNA-এর ১ বিলিয়ন ৭১৯ মিলিয়ন ৩৪৮ হাজার ৬৩২তম বেস পেয়ারে কোনও লেটার মিসকোডেড থাকে, তাহলে তা কোষের জন্যে ক্ষতির কারণ হবে। যার প্রভাব পড়বে দেহের ওপর।

এই DNA-এর গঠন এতই ক্ষুদ্র যে, জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যায় না। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের দরকার হয়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে, কোটি কোটি জীবের মধ্যে, হাজার হাজার কোটি জটিলতর এসব ইনফরমেশন এনকোডেড হয়ে আছে—অতিক্ষুদ্র DNA মলিকুলের মধ্যে। এমনভাবে এনকোডেড হয়ে আছে যে, কোনও বিশৃঙ্খলা নেই। একটি বাক্যও যেখানে র‍্যান্ডমলি অর্থবোধক হতে পারে না, সেখানে এই কমপ্লেক্স DNA কি র‍্যান্ডমলি হওয়া সম্ভব? কোনও জড়বস্তু থেকে কি এমন জটিলতম জিনিস তৈরি হতে পারে?'

অর্ক কোনও জবাব দিলো না। অবশ্যি জবাব দেওয়ার মতো কোনও উত্তর ওর কাছে নেই। সত্যকে সামনে পেয়েও যে গ্রহণ করে না, তার কাছে কি এ প্রশ্নের উত্তর আশা করা যায়? ফারিস আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমাদের দেহ থেকে শুরু করে প্রকৃতি পর্যন্ত, সবকিছুই অবাক করা জিনিসে ভরপুর। যেদিকেই তাকাবি—অবাক হবি।'

আগ্রহভাব নিয়ে নাইম বলল, 'কীভাবে?'

ফারিস জবাব দিলো, 'আমরা জানি, পৃথিবী তার নিজ অক্ষে ঘুরে। ফলে চব্বিশ ঘণ্টাই পৃথিবীর কোথাও না-কোথাও রাত থাকে। আহ্নিক গতি যদি না থাকত, তাহলে পৃথিবীর একপাশ সূর্যের দিকে থাকত। অন্যপাশে ছমাস অন্ধকার থাকত। প্রায় বারো ঘণ্টা সূর্য তাপের পর—অন্ধকারের আসে। ফলে সালোক সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায়। যাতে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর অভাব না হয়, অক্সিজেন কমে না যায়। আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে এ দুটির ভারসাম্য প্রয়োজন। যদি ছমাস রাত, আর ছমাস দিন থাকত, তাহলে সালোক সংশ্লেষণে ভারসাম্য থাকত না। বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ত।'

আমাদের আলোচনা যখন এই পর্যন্ত, তখন হাসান এল। চেয়ার নেই বলে নাইমের পাশে দাঁড়াল। ফারিস অর্কের সাথে আলাপ করছে দেখে বলল, 'ওরে বুঝাইয়া লাভ নাই। যতই বুঝাস না ক্যান, কোনওদিনও সোজা হইব না। খালি প্যাঁচাইতেই থাকব।' এই বলে হাসান একটা চেয়ার এনে ফারিসের পাশে বসল।

অর্ক হাসানের কথার কোনও জবাব দিলো না। এক ফালি হেসে নিয়ে ফারিস বলতে লাগল, 'পৃথিবীটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, এরচেয়ে সামান্য কমবেশি হলেই সমস্যা হতো। পৃথিবী যদি সূর্যের আরেকটু কাছে থাকত, তাহলে শুক্রের মতো অবস্থা হতো। পৃথিবীকে মনে হতো আগুনে সেঁকা বস্তু। যদি কিছুটা দূরে থাকত, তাহলে

বরফে ঢেকে যেত। ঠিক মঙ্গলের মতো।'

হাসান বলল, 'শক্তিশালী আণবিক বল যদি সামান্য কিছুটা দুর্বল হতো, তাহলেও তো অনেক সমস্যা হতো।'

ফারিস বলল, 'কী ধরনের সমস্যা?'

হাসান জবাব দিলো, 'তাহলে পরমাণুর নিউক্লিয়াস তৈরি হতো না। হাইড্রোজেন ছাড়া অন্যান্য মৌলিক পদার্থ পাওয়া যেত না। ফলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে যেত! শক্তিশালী আণবিক বল আরও শক্তিশালী হলে কী হতো জানিস?'

চট করে অর্ক বলে উঠল, 'কী হতো আবার, সব হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হতো। কোনও হাইড্রোজেন অবশিষ্ট থাকত না।'

ফারিস জিজ্ঞেস করল, 'হাইড্রোজেন ছাড়া কি জীবকোষ গঠিত হতে পারত?'

অর্ক জবাব দিলো না। অবশ্যি উত্তরটা তার জানা। তবুও কেন যে জবাব দিলো না, তা বলতে পারব না। ফারিস বলল, 'হাসানের কথা থেকে একটা জিনিস মনে পড়ল। পরমাণুর ভর কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধর, প্রোটোনের ভর। যদি প্রোটোনের ভর ইলেকট্রনের তুলনায় এক হাজার আট শ ছত্রিশ গুণ ভারী না হতো, তাহলে কেমিস্ট্রি হতো অন্যরকম। ফলে জীবদেহের অপরিহার্য অণু, আমিষ কিংবা ডিএনএ স্থিতিশীল হতো না।'

ফারিসের কথা শেষ হলে হাসান বলল, 'ফারিস, তোর কি মনে আছে, বায়োকেমিস্ট্রি ক্লাসে স্যার পানি নিয়ে কী বলছিলেন?'

'কোন কথাটা রে?'

'ওই যে স্যার বললেন, Solid state physics একটি আমেজিং বিষয়। পানির ক্ষেত্রে এটা যদি না হইত, তাহলে পানির কণা স্পেসিফিক গ্রাভিটি উপেক্ষা করে বাষ্প হইতে পারত না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। প্রকৃতির এই সুশৃঙ্খল বিন্যাস, অনেক বিজ্ঞানীকে মুগ্ধ করেছে। যাদের মধ্যে আছেন Allan Sandage. জোতির্বিজ্ঞানে Crawford পুরস্কার বিজয়ী Sandage বলেন, "কোনও এলোমেলো অবস্থা থেকে এমন সজ্জা আসা একেবারেই অসম্ভব। অবশ্যই পরিচালনার জন্যে কোনও মূলনীতি থাকতে হবে।"'

'আচ্ছা ফারিস! বিগ ব্যাং মতবাদে বিশ্বকে প্রসারণশীল বলা হয়েছে, এটা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ, ঠিক। ১৯২৯ সালে এডুইন হাবল দেখতে পান, নক্ষত্র থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এর অর্থ হলো, নক্ষত্রগুলো আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শুধু আমাদের থেকেই নয়, পরস্পর থেকেও দূরে সরে যাচ্ছে।'

অর্ক হঠাৎ বলে উঠল, 'কিন্তু আমরা তো জানি বিশ্বের কোনও শুরু নেই। এটি অনন্তকাল ধরেই চলে আসছে।'

ফারিস অর্কের জবাবে বলল, 'তুই শিওর তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'আমি যদি বলি তোর জানাটা ভুল?'

'ভুল?'

'হ্যাঁ, ভুল। মহাশূন্যে হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেনের উপস্থিতিই—তোর কথা ভুল প্রমাণ করে। বিশ্ব যদি অনন্তকাল থেকেই অস্তিত্বে থাকত, তাহলে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যেত। Alexander Vilenkin, Arvind Borde, Alan Guth এ তিন জন বিজ্ঞানী দীর্ঘ গবেষণার পর উল্লেখ করেন—"কসমোলজিস্টরা কখনোই অসীম মহাবিশ্ব নামক সম্ভাবনার পেছনে লুকোতে পারবেন না। পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও পথ নেই; তাঁদের অবশ্যই মহাজাগতিক শুরু নামে একটা সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।"'

নাইম বলল, 'আচ্ছা ফারিস! তুই একদিন মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের হার নিয়ে কী যেন বলেছিলি? সামান্য কমবেশি হলে, কী জানি হতো?'

ফারিস ভণিতা না করে সরাসরি বলল, 'তাহলে মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসার আগেই ধ্বংস হয়ে যেত। অবশ্য এটা আমার বানানো কথা নয়। অর্কের প্রিয় বিজ্ঞানী Stephen Hawkins এ কথা বলেছেন। *A Brief History of Time* বইতে তিনি বলেন, "বিগ ব্যাং এর এক সেকেন্ড পর, মহাজাগতিক সম্প্রসারণের মান যদি এক লক্ষ মিলিয়ন ভাগের এক ভাগও কম হতো, তাহলে সমগ্র মহাবিশ্ব বর্তমান অবস্থায় আসার আগেই বিলীন হয়ে যেত।"'

ফারিসের কথা শেষ হতেই অর্ক বলল, 'তুই বলতে চাচ্ছিস, কোনও বুদ্ধিমান সত্তা এগুলো করেছে?'

হাসান একটু রেগে জবাব দিলো, 'ক্যান, তোর কী মনে হয়? প্রকৃতির এক্সাক্ট বিন্যাস—এমনি এমনি হইছে? কোনও ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনার লাগে নাই?'

অর্ক জবাব দিলো, 'তার আগে আমাদের জানতে হবে, বড় বড় বিজ্ঞানীরা বুদ্ধিমান

সত্তার কথা স্বীকার করেন কি না।'

ফারিস বলল, 'করবেন না কেন? যেসব বিজ্ঞানীরা সত্যকে খুঁজে বেড়ান, তাদের সবাই স্বীকার করেন।'

অর্ক বলল, 'দু-একজন অখ্যাত বিজ্ঞানী স্বীকার করে নিলেই কি বুদ্ধিমান সত্তা প্রমাণিত হয়ে যান?'

'দু-একজন কি না, তা পরে বলছি। আগে বল বিজ্ঞানের জগৎ নিউটনকে কীভাবে দেখে?'

'নিউটনের কথা কি আর বলে বোঝাতে হবে? তিনি মহাবিজ্ঞানী ছিলেন। তবে কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন না।'

'তিনি স্রষ্টাকে স্বীকার করেছেন, তাই বুঝি তিনি কুসংস্কারগ্রস্ত?'

অর্ক কিছু বলতে যাবে, এমন সময় হাসান বলে উঠল, 'কী বলেছেন নিউটন?'

'নিউটন বলেছেন, "সূর্য, গ্রহ ও ধূমকেতুর সর্বাধিক সুন্দরতম গঠন, কেবল একজন বুদ্ধিমান সত্তার উপদেশ এবং কর্তৃত্বের ফলেই আরম্ভ হওয়া সম্ভব।"'

হাসান কিছুটা অবজ্ঞাসুরে বলল, 'ও! এতক্ষণে বুঝতে পারছি। এই কারণেই অর্ক তারে নিয়া এই বাজে কমেন্ট করছে।'

ফারিস বলল, 'হয়তো। তবে নিউটন ছাড়াও অনেকেই এ সত্যকে স্বীকার করেছেন।'

'যেমন?'

'ব্রিটিশ মহাকাশবিদ ও তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক Dr. Paul Davis বলেন, "এতে আমার জন্যে শক্তিশালী প্রমাণ আছে যে, নিশ্চয়ই এসবের পেছনে কিছু একটা কাজ করছে। মনে হচ্ছে যেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে কেউ প্রকৃতির সংখ্যাগুলোকে একদম উপযুক্তভাবে সাজিয়েছে। এই ডিজাইনের ছাপ অসাধারণ।"'

ফারিসের কথাগুলো অবাক করার মতো! প্রকৃতি যে এতটা সুশৃঙ্খল, তা কোনওদিন ভাবিনি। আজ যেন নতুন করে ভাবলাম। আমি যারপরনাই বিস্মিত হলাম যখন ফারিস বলল, 'একবার Richard Dawkins-এর একটা সাক্ষাৎকার নেওয়া হলো। উপস্থাপক তাঁকে বলল, 'কে পৃথিবী সৃষ্টি করল?'

তিনি বললেন, 'কে প্রশ্নের দ্বারা আপনি একজন সৃষ্টিকর্তা নির্ধারণ করে ফেলছেন।'

-'তাহলে কীভাবে এল?'

-'খুব ধীর পদ্ধতিতে।'

-'কীভাবে?'

-'কেউ জানে না কোন ধরনের ইভেন্টের মাধ্যমে তা শুরু হয়।'

-'সেটা কী?'

-'Self replicating molecule-এর মাধ্যমে।'

-'এটা কীভাবে?'

-'আমি আপনাকে বলেছি, আমি জানি না।'

-'তার মানে এটা কীভাবে শুরু হয়েছিল, এ ব্যাপারে আপনার আইডিয়া নেই।'

-'না, না। এমনকি কেউই জানে না।'

-'আপনার কি মনে হয়, জেনেটিক্সের জটিল ইস্যু সমাধানের ক্ষেত্রে ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন এর উত্তর হতে পারে?'

-'হ্যাঁ, এমনটা হতে পারে।... যদি আপনি মলিকুলার বায়োলজির গভীরে ঢোকেন, তাহলে অবশ্যই আপনি একজন ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইনারের নিদর্শন খুঁজে পাবেন। সে ডিজাইনার উচ্চতর ইন্টলিজেন্ট হতে পারে। এবং সে স্পন্টেনিয়াসলি অস্তিত্বে আসতে পারে না।'

Richard Dawkins-এর কথা শুনে অর্ক বলল, 'ভিডিওটা আছে তোর কাছে?'

ফারিস বলল, 'হুঁ।'

'আচ্ছা, শেয়ার-ইট দিয়ে দিয়ে দে।'

ফারিস ভিডিওটা অর্কের ফোনে ট্রান্সফার করে দিলো। হঠাৎ হাসান পেছনে তাকিয়ে বলল, 'এই চল সবাই! ম্যাডাম আসছে।'

ম্যাডাম আসছে দেখে—বাধ্য হয়েই ক্লাসে ঢুকতে হলো।

[দুই]

আর কিছুক্ষণ পরই সূর্যটা ডুবে যাবে। নদীর জলতরঙ্গের ওপর সূর্যের কিরণটা প্রতিফলিত হবে। এরপর আসবে সেই সময়, যার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি। সময়টা যেন খুব ধীরগতিতে চলছে। আসলে অপেক্ষার প্রহর এমনই হয়, শেষ হতে চায় না। ঘড়ির দিকে তাকাতে অসহ্য লাগছে। এই নিয়ে আট বার তাকিয়েছি। আর তাকাতে চাই

না। ঘড়িটার ওপর কেমন জানি এক অজানা রাগ বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন নদীতে ফেলে দিই। কিন্তু তাতেই কি সময় দ্রুত চলে যাবে? যাবে না। তাই নিজেকে শান্ত করে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

শরৎকালে নদী যেন একটু বেশিই রূপবতী হয়। অবশ্যি এর জন্যে কাশফুলগুলো দায়ী। ওরা না থাকলে কি নদীর দুপাশ এতটা সুন্দর দেখাত? কাশফুলের সৌন্দর্য, ছোট্ট ডিঙি নৌকা, প্রবহমান স্রোত, সব মিলিয়ে পরিবেশটা অনেক রোম্যান্টিক মনে হচ্ছে। অন্যরকম শিহরন বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কল্পনার রং-তুলিতে আঁকা—একেবেঁকে বয়ে চলা কোনও নদীর ছবি। ছবিটা অবশ্যি নিপুণ হাতে আঁকা। তাই তো তার সৌন্দর্য দর্শককে বিমোহিত করছে। কিন্তু ফারিস! ওর এখনো আসার নাম গন্ধ নেই। ফারিস বলেছিল, আজ নাকি সারপ্রাইজ দেবে।

আমি আসার ঠিক পনেরো মিনিট পর ফারিস এল। তবে একা নয়, সাথে অর্কও এসেছে। ওরা দুজন একসাথে রিকশা থেকে নামল। ভেবেছিলাম ফারিস একা আসবে, অর্কও যে সাথে আসবে, ভাবিনি। আমাকে বসে থাকতে দেখে ফারিস বলল, 'আজ যে খুব দ্রুত চলে এলি!'

আমি কোনও জবাব দিলাম না। অর্ক আর ফারিস আমার পাশে বসল। অর্ককে বড্ড অচেনা লাগছে। নাস্তিক টাইপের ছেলেটার চোখে-মুখে পরিবর্তনের ঢেউ। চেহারার মধ্যে কেমন যেন এক মায়াবী ভাব ফুটে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন—নতুন অর্ককে দেখছি। আমার চোখে চোখ পড়তেই অর্ক বলল, 'কিরে, এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন? মুখে তো মাছি পড়বে।'

অর্কের কথা শুনে আমি হাসলাম। ফারিসও হাসল। আমি অর্ককে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাব এই মুহূর্তে সে বলল, 'কাল রাতে আমি কোরআন পড়েছি।'

নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। অর্ক পড়বে কোরআন! হয়তো পড়তেও পারে। অনেকেই ভুল ধরার জন্যে কোরআন পড়ে। অর্কও হয়তো তেমন ধারণা নিয়েই পড়েছে। অর্কের মুখে কোরআন পড়ার কথা শুনে যখন আমার মনে এমন ধারণার জন্ম নিচ্ছিল, তখন সে বলল, 'জানিস পড়ার পর আমার কেমন লেগেছে?'

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম। অর্ক বলল, 'কাল রাতের কথা। যখন আমি ঘুমোতে যাব—সে সময়। ফেসবুক চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ কোরআন অ্যাপটির ওপর হাতের চাপ লেগে যায়। অ্যাপটি ওপেন হয়। একটা সূরা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কত নম্বর, তা মনে নেই। ইংরেজি অনুবাদে[৫২] লেখা ছিল The Standard. আমি সেখানে ক্লিক

[৫২] ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রে মুফতি তাকী উসমানী (হাফি.)-এর অনুবাদের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। অনুবাদটি অনেক সহজ ও প্রাঞ্জল।

করলাম। এরপর পড়তে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম সেখানে লিখা, But they have disbelieved the Hour[৫৩] and for those who disbelieve the Hour, We have prepared a flaming fire. When it will see them from a distant place, they will hear it's ranging and breathing. And when they will be thrown into a narrow place therein, while they will be chained together, they will call for death. Do not call for one death today, but call for many a death.[৫৪]

এটুকু পড়ার পর কেমন জানি একটা ঝাঁকুনি খেলাম। এরপর আবার পড়তে লাগলাম। কয়েক আয়াত পড়ার পর এক জায়গায় আমার চোখ আটকে গেল। সেখানে লেখা ছিল, And the Day the wrongdoer will bite his hands saying, Would that I had taken a path along with the messenger! Woe to me! Would that I had not taken so-and-so for my friend.[৫৫]

আমি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালাম। বুকে হাত দিয়ে দেখলাম—হার্টবিট বেড়ে গেছে। রুমে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বারান্দায় গেলাম। সেখানে পায়চারি করতে লাগলাম। মোবাইলটা সাথেই ছিল। সূরাটির দিকে আমি বার বার তাকাতে লাগলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল The Standard. এই শব্দটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। এটা কি সত্যিই স্ট্যান্ডার্ড? যদি স্ট্যান্ডার্ড হয়, তাহলে তো সবকিছু মাপতে হবে এটা দিয়ে। নাহ! কোনও সমাধান মেলাতে পারছিলাম না। রাতেই ফারিসকে কল দিলাম। ও কল রিসিভ করল। কথা শুনেই বুঝলাম ও ঘুমে ছিল। আমি শুধু বললাম, কাল তোর সাথে দেখা করব। এরপর দেখা হলো। ওকে নিয়ে সোজা এখানে চলে এসেছি।'

অর্কের কথাগুলো শুনে আমার লোম দাঁড়িয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সেও চোখ ফেরাল না। এভাবে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর অর্ক বলল, 'ফারিসের সাথে কিছু বিষয় নিয়ে ডিসকাস করব বলে এসেছি।'

অর্কের কথা শেষ হলে ফারিস বলল, 'সেই তো কখন থেকে এ কথা বলে যাচ্ছিস। বলছিস না তো কিছু।'

অর্ক কিছুটা অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'খুব তৃষ্ণা পেয়েছে। একটু পানি হলে ভালো হত। গলাটা কেন জানি শুকিয়ে যাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'জুস খাবি, তাজা ফলের জুস?'

অর্ক বলল, 'হ্যাঁ, খাওয়া যায়। অনেক দিন হলো খাই না।'

---

[৫৩] The day of Judgment
[৫৪] সূরা ফুরকান, (২৫) : ১২-১৪ আয়াত।
[৫৫] সূরা ফুরকান, (২৫) : ২৭-২৮ আয়াত।

আমাদের থেকে ক-গজ সামনেই এক চাচা জুস বিক্রি করছে। ফলের জুস। অর্ডার দেওয়া হলো। মিনিট পাঁচেক পর দোকানি এসে জুস দিয়ে গেল—ওয়ান টাইম গ্লাসে। দোকানি আমাদের দেখে বলল, 'হুজুররা কি বড় মাদরাসার ছাত্র?'

উনার কথা শুনে আমার বেশ হাসি পেল। ফারিস বলল, 'না চাচা। আমাদের অত বড় সৌভাগ্য হয়নি।'

দোকানি বলল, 'বুজবার ফারি নাই। দেইখ্যা মনে হয়—মাদ্রাসার ছাত্র। আফনারা কি বার্সিটিত পরুইন?'

'জি চাচা।'

'আমার একটা ইচ্চা পূরণ করবাইন?'

'কী?'

'আমি আফনারারে ফিরিতে জুস খাওয়াইবার চাই।'

'না চাচা, আমাদের খাওয়াতে হবে না। খাওয়ার মতো টাকা আছে, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কোনও গরিব মানুষকে ফ্রি দিয়েন, তাহলেই হবে।'

ফারিসের কথা শুনে লোকটি চলে যেতে লাগল। ফারিস বলল, 'টাকা নিয়ে যান।'

'আগে খাইয়্যা দেহুইন। ভালো লাগলে দিয়েন। আমি তো আছিই।' এই বলে লোকটি চলে গেল।

জুসের গ্লাসে চুমুক দিয়ে অর্ক বলল, 'আচ্ছা ফারিস! বিশ্বাস কি খুব ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস?'

'অবশ্যই।' ফারিসের ঝটপট উত্তর।

'ক্যান ইউ ইলাবোরেট প্লিজ?'

'বিশ্বাস মানুষকে এমন পথ দেখায়, যা আর কোনওভাবেই অর্জন করা যায় না।'

'যেমন?'

ফারিস এ প্রশ্নের জবাব দিলো না। সে একটি প্রশ্ন করল। ফারিস বলল, 'আচ্ছা অর্ক! তুই কি জানিস, আমেরিকায় এক সময় অ্যালকোহল নিষিদ্ধ ছিল?'

অর্ক বলল, '১৯২০ সালের দিকে, তাই না?'

'হ্যাঁ। নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর কী হয় জানিস?'

'কী?'

'আমেরিকায় অ্যালকোহল গ্রহণ বেড়ে যায়। আগের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে। ১৯২০ সালের আগে আমেরিকায় প্রকাশ্যে যত কারখানা ছিল, ২০-এর পর তা আরও বেড়ে যায়। গোপনে বড় বড় আস্তানা গড়ে উঠে। এসব আস্তানা ক্ষতিকর অ্যালকোহল ও বাজে ড্রিংকস বিক্রি করতে থাকে। যুবকরা এবং টিন এইজাররা এসব আস্তানাতে যাতায়াত শুরু করে। আস্তে আস্তে গোপনে অ্যালকোহল বেচাকেনা অনেক লাভজনক ব্যবসা হয়ে যায়।

লাখ লাখ লোক এই ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। নিষিদ্ধ হওয়ার আগে আমেরিকায় সরকার অনুমোদিত অ্যালকোহল কোম্পানি ছিল চার শ-র মতো। কিন্তু নিষিদ্ধ হওয়ার পর ৭৯ হাজারের বেশি অ্যালকোহল কোম্পানির মালিক গ্রেপ্তার হয়। এত বেশি গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও, অ্যালকোহল গ্রহণ কমেনি। প্রতিবছর বিশ কোটি গ্যালন অ্যালকোহল বিক্রি হতে থাকে। যা আগের সব রেকর্ড ভেঙে ফেলে। সেসব অ্যালকোহল ছিল বিষের মতো। যার কারণে আমেরিকানদের স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। ১৯২৬ এর মধ্যে অ্যালকোহল-এর কারণে কত লোক মারা যায়, জানিস?'

'না।'

'প্রায় এগারো হাজার। আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে দুই শ ব্যক্তি মারা যায়।[৫৬] সাড়ে পাঁচ লক্ষের মতো লোককে জেলে বন্দী করা হয়। এক কোটি ষাট লক্ষ পাউন্ডের ওপরে জরিমানা নেওয়া হয়। চল্লিশ কোটি পাউন্ড মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপরেও জনগণ অ্যালকোহল ছেড়ে দেয়নি!'

'সত্যিই?'

'হ্যাঁ, সত্যিই। জনগণ অ্যালকোহলের নেশায় এতটাই বুঁদ হয়ে যায়, নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তা আটকে রাখা যায়নি। একসময় সরকার নেশাগ্রস্ত জনগণের কাছে মাথানত করে। ১৯৩৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, অ্যালকোহল নিষেধাজ্ঞার আইনটি বাতিল করেন। ফলে শত প্রচার-প্রচারণা, গবেষণাপত্র বিফলে যায়। ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল, অ্যালকোহলের ক্ষতিকর দিক প্রচার করা। এইসব প্রচারণার পেছনে কত ডলার খরচ হয়েছিল জানিস?'

'না রে।'

'শুধু প্রচারের জন্যেই খরচ হয় সাড়ে ছয় কোটি ডলার। আর অ্যালকোহলের বিরুদ্ধে যেসব বইপত্র ছাপা হয়, তার মোট পৃষ্ঠা ছিল প্রায় নয় শ কোটি।'

[৫৬] ১৯২০ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত।

'আচ্ছা ফারিস, তুই আমাকে এসব কাহিনি শুনাচ্ছিস কেন?'

'সেটা পরে বলছি। আগে তোকে চৌদ্দ শ বছর আগের একটা সমাজের কথা বলি। তুই মনোযোগ দিয়ে শোন। সে সমাজের স্ট্যান্ডার্ড ছিল কোরআন। আর রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। সে সময়ে জনগণ ততটা শিক্ষিত ছিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের মতো এতটা উন্নত ছিল না। কিন্তু জনগণ ছিল অ্যালকোহল প্রেমিক। তাদের ভাষায় অ্যালকোহলের প্রজাতি ছিল প্রায় আড়াই শ-র মতো।

অ্যাকোহলের প্রতি তারা এতটাই আসক্ত ছিল যে, সাহিত্যের মধ্যেও এর প্রভাব লক্ষ করা যেত। অ্যালকোহল নিয়ে বিশাল বিশাল কবিতা বানানো হতো। এমন পরিস্থিতিতে সেখানে মদ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল। কোরআন থেকে উত্তর এল, "তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে? বলে দাও এ দুটোর মধ্যে আছে গুরুতর পাপ। অবশ্য লোকদের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে। কিন্তু ও দুটোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক গুরুতর।"[৫৭] এ কথা শোনার পর কী হলো জানিস?'

'কী?'

'সমাজের একটি অংশ—সাথে সাথে অ্যালকোহল ছেড়ে দিলো। একেবারে চিরদিনের জন্যে। এরপরেও বিশালসংখ্যক তা ধরে রাখল। কিছু কিছু লোক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতে আসতে লাগল। ফলে সালাত পড়তে গিয়ে ভুল হতে লাগল। তাই আবার অ্যালকোহল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। কোরআন থেকে জবাব এল, "হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেয়ো না, যতক্ষণ নিজের উচ্চারিত বাক্য নিজেই অনুধাবন করতে সক্ষম না হও।"'[৫৮]

'এ ঘোষণার পর কী হলো?'

'লোকেরা অ্যালকোহলের জন্যে সময় নির্দিষ্ট করে নিল। ফলে অ্যালকোহলের ক্ষতিকর প্রভাব রয়েই গেল। নেশাগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। তখন শেষ নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হলো। কোরআন ঘোষণা করল, "হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব তোমরা এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান চায়, মদ-জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে। আর আল্লাহর স্মরণ ও সালাত হতে বিরত রাখতে। সুতরাং তোমরা কি এখনো নিবৃত্ত হবে না?"[৫৯] জানিস, এ ঘোষণার পর কী হয়েছিল?'

'কী?'

---

[৫৭] সূরা বাকারাহ, (০২) : ২১৯ আয়াত।
[৫৮] সূরা নিসা, (০৪) : ৪৩ আয়াত।
[৫৯] সূরা মায়িদাহ, (০৫) : ৯০-৯১ আয়াত।

'এ কথা শোনার সাথে সাথে—অ্যালকোহলের পাত্রগুলো ভেঙে ফেলা হলো। অলিতে গলিতে অ্যালকোহলের বন্যা বয়ে গেল। এক ব্যক্তি অ্যালকোহল হাতে নিয়েছে মাত্র, এমন সময় নিষেধাজ্ঞার কথা শুনতে পেল। সাথে সাথে পেয়ালাটি ফেলে দিলো। বাড়িতে থাকা সব অ্যালকোহলের পাত্র ভেঙে ফেলল।'

'এরপর কি সে সমাজে অ্যালকোহল পান বন্ধ হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, হয়েছিল। চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়েছিল।'

'শুধু কোরআনের আয়াত শুনেই মানুষ অ্যালকোহল ছেড়ে দিলো? ভেরি স্ট্রেইঞ্জ।'

'একটা জিনিস খেয়াল কর! আমেরিকায় অ্যালকোহল থামানোর জন্যে কত কত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছিল। কোটি কোটি পৃষ্ঠার প্রচারপত্র ছাপানো হয়েছিল। হাজার হাজার জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু! কিন্তু তবুও অ্যালকোহলের নেশা থেকে সে সমাজ মুক্ত হয়নি। নেশার হার আরও বেড়েছে। একটা সময় তারা নেশাগ্রস্ত জনগণের কাছে পরাজিত হয়েছে।'

'তুই কি বলতে চাস, মুহাম্মদের সমাজ বিশ্বাসের চর্চা করেছে, সে জন্যেই এমনটা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমি এটাই বলতে চাই। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সাথিদের আগে বিশ্বাস শিখিয়েছেন। যারা বিশ্বাস কবুল করেছেন, তাঁদের কোরআনের হুকুমের সামনে নত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন, আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ কোনও নির্দেশ দিলে, তাতে দ্বিমত করার সুযোগ নেই।[৬০] যে করবে, তার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি শিখিয়েছেন বিশ্বাসী তাঁরাই, যারা বলেল—আমরা শুনলাম এবং মানলাম।[৬১] সাহাবারা নবীজির ﷺ এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। জীবনকে এই স্ট্যান্ডার্ডের আলোকে সাজিয়েছেন। নিজের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষাকে এই স্ট্যান্ডার্ডের সামনে বিলিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে কেবল হুকুম শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর তাঁরা তামিল করেছেন। এর জন্যে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করতে হয়নি। শত শত পুলিশ নিয়োগ দিতে হয়নি। কোটি কোটি পৃষ্ঠার গবেষণাপত্র ছাপাতে হয়নি।'

'শুধু বিশ্বাস শিখেই এমন পরিবর্তন হওয়া সম্ভব? তুই কি আমাকে স্বপ্ন দেখাচ্ছিস?'

'স্বপ্ন নয়, সত্যি। তোকে আমি আরেকটি উদাহরণ দিই। তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে ইনশাআল্লাহ।'

কথা বলার সময় ফারিস একবারও জুসের দিকে নজর দেয়নি। আমি ওকে ইশারা দিলাম। ফারিস তিন চুমুকে সবটা শেষ করে নিল। এরপর আবার বলতে শুরু করল,

[৬০] সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩৬ আয়াত।
[৬১] সূরা বাকারাহ, (০২) : ২৮৫ আয়াত।

'ধর, কোনও লোক এমন অপরাধ করেছে, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তার সুযোগ আছে নিজেকে লুকিয়ে রাখার। কিংবা কোথাও পালিয়ে যাওয়ার। যেখানে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। তা সত্ত্বেও সে অপরাধী কোথাও পালাল না, নিজেই এসে ধরা দিলো...'

খানিকটা হেসে নিয়ে অর্ক বলল, 'তোর কথা শুনে না হেসে পারলাম না। এমন সমাজ কোথায় পাওয়া যাবে, যেখানে অপরাধী এসে তার দোষ স্বীকার করবে?'

'খুঁজলেই পাওয়া যাবে।'

'না রে ভাই। এগুলো কেবল বাংলা সিনেমায় হওয়া সম্ভব।'

'আমি যদি বলি বাস্তবেও সম্ভব?'

'মৃত্যুদণ্ড জেনেও অপরাধী নিজে এসেই ধরা দেবে? এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে?'

ফারিস কিছু না বলে তাকে একটা প্রশ্ন করল, 'ইসলামে কিছু কিছু অপরাধের শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। জানিস তো?'

'কী কী যেন? ওহ! একটা মনে পড়েছে। কাউকে হত্যা করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, একদম ঠিক। বিবাহিত কোনও নারী বা পুরুষ যদি ব্যভিচার করে, তাহলেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মনে কর, কোনও বিবাহিত নারী ব্যভিচার করল। গোপনে পুরুষের সাথে মিলিত হলো। কেউ তাকে দেখতে পেল না। তবুও নারীটি এসে ধরা দিলো। আদালতে নিজের অপরাধ স্বীকার করল।... '

'দাঁড়া, দাঁড়া! সিনেমার কাহিনি বলছিস না তো?'

'না রে! সিনেমা নয়, বাস্তব। বাস্তব কাহিনি বলছি। ঘটনাটা আজ থেকে হাজার বছর আগের। যখন নবীজি ﷺ জীবিত ছিলেন। গামেদ গোত্রের এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল, আমি তো জিনা করেছি। এ কথা শুনে নবীজি ﷺ বললেন, তুমি ফিরে যাও। নবীজির ﷺ কথা শুনে মহিলাটি ফিরে গেল। মহিলাটি জানে, ফিরে এলে তার নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড হবে। সে কি ফিরে আসতে পারে?'

'ফিরে আসবে কী বলিস! মহিলাটি যে অপরাধের কথা স্বীকার করেছে, এতেই তো অবাক লাগছে! বেঁচে যাওয়ার সুযোগ পেয়েও—সে ফিরে আসবে?'

'আসবে। তার ঈমান তাকে ফিরিয়ে আনবে।'

'সত্যিই সে এসেছিল?'

'হ্যাঁ এসেছিল। পরদিন সে আবার এসেছিল। তার পেটে যে সন্তান চলে এসেছে, সে কথাও স্বীকার করেছিল। নবীজি ﷺ আবার তাকে ফিরিয়ে দেন।'

'এরপর নিশ্চয় সে আর আসেনি?'

'যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, সে ফিরে আসবে না? যে বিশ্বাস করে আল্লাহ ﷻ তাকে দেখছেন, সে গোনাহ্ স্বীকার করবে না? ওই মহিলা পরদিন আবার এসেছিল। তখন নবীজি ﷺ তাকে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন।'

'বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পরেও কি সে ফিরে এসেছিল?'

'হ্যাঁ, এসেছিল। বাচ্চা প্রসব করার পর সে আবার নবীজির ﷺ কাছে এসেছিল। কিন্তু নবীজি ﷺ আবারও তাকে ফিরিয়ে দেন। সন্তান দুধ না ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। তার সন্তান যখন দুধ ছেড়ে খাবার খেতে শুরু করল, মহিলাটি দ্রুত নবীজির ﷺ কাছে এল। এরপর নবীজি ﷺ তার ওপর শরীয়ার শাস্তি প্রয়োগ করলেন।'

হা করে ফারিসের কথা শুনতে শুনতে জুসের কথা ভুলেই গেছি। আসলে কিছু কথা এমন থাকে, যা হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ফারিসের কথাগুলোও তেমন। ও যখন কথা বলে, তখন একধ্যানে তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে।

ফারিস এবার অর্ককে বলল, 'মনে কর, আমেরিকান সেনাবাহিনীর সাথে কোনও দেশের যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে তারা ছোট্ট একটি আইন অমান্য করল। এরপর যুদ্ধে জয়ী হলো। আইন অমান্য করার জন্যে, তাদেরকে বিজিত দেশ ছেড়ে যেতে বলা হলো।'

'ছোট্ট ভুলের জন্যে কি কেউ বিজিত দেশ ছেড়ে দেবে?'

'দেবে, বিশ্বাসীরা অবশ্যই দেবে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ছোট্ট ভুলকেও—ভুল বলে মেনে নিতে শেখাবে।'

'এটা কি শুধু খাতা-কলমেই?'

'আমি তোকে এক টুকরো ইতিহাস শোনাই। ঘটনাটা উমার ইবনুল আব্দুল আজিজ রহ. এর সময়কার। তিনি তখন বিশ্বাসীদের খলিফা। যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন কুতাইবা ইবনে মুসলিম। কুতাইবা সমরকন্দ আক্রমণ করে বিজয় করেন। আক্রমণের পূর্বে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে ভুলে যান। যেহেতু সমরকন্দবাসী ইসলাম সম্পর্কে জানত না, তাই যুদ্ধ শুরুর পূর্বে দাওয়াত দেওয়া জরুরি ছিল। সমরকন্দবাসী খলীফার নিকট দূত পাঠাল। খলিফাকে বিস্তারিত সব খুলে বলল। সবকিছু শোনার পর উমার ইবনু আব্দুল আজিজ রহ. সমরকন্দবাসীদের থেকে বিচারক নির্ধারণ করলেন। বিচারকের নাম ছিল জুমাই বাজী। জুমাই বাজী উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনলেন। তারপর সিদ্ধান্ত

দিলেন, মুসলিম বাহিনী যেহেতু তাদের যুদ্ধের শর্ত পুরো করেনি, তাই তারা সমরকন্দ ছেড়ে চলে যাবে।'

'সে সিদ্ধান্ত কি মুসলিমরা মেনে নিয়েছিল?'

'অবশ্যই মেনে নিয়েছিল। মেনে নিয়ে সমরকন্দ ছেড়ে দিয়েছিল।'

ফারিসের মুখে কাহিনিটা শুনে আমি যতটা না অবাক হলাম, তারচেয়ে বেশি অবাক হলো অর্ক। ও মনে হয় নিজেকে বোঝাতে পারছে না। একটা দেশ বিজয় করার পর, তা ছেড়ে দেবে কেউ? তাও সামান্য ভুলের কারণে? এমনটা তো অর্ক সিনেমায় দেখেছে। বাস্তবে কখনো দেখেনি। কিন্তু বিশ্বাসীদের কাহিনি যে সিনেমাকেও হার মানায়, তা তো সে জানত না। তাই হয়তো অবাক হলো। একধ্যানে ফারিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছে যেন পিন-পতন-নীরবতা বিরাজ করছে। কোনও টুঁ শব্দ হচ্ছে না।

এভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর ফারিস বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে আমাদের ফিতরাত। যা আমরা জন্ম থেকেই লাভ করি।'

ফারিসের কথা শোনার পর অর্ক বলল, 'তুই যা বলছিস, সত্যি তো?'

'মিথ্যা বলব কেন ভাই? বিজ্ঞানীরাই এটা বলেছেন। অক্সফোর্ড-এর মনোবিজ্ঞানী ড. অলিভেরা প্যাট্রোভিচ এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তিনি চার থেকে ছ-বছর বয়সী জাপানী বাচ্চা এবং চার শ ব্রিটিশ বাচ্চার ওপর গবেষণা করেন। যাদের সবাই ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের। এরপর তিনি জানান, জাপানী শিশুরা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। যদিও জাপানের সংস্কৃতি বিশ্বাসকে মেনে চলে না।'

'তাঁর গবেষণা তো ভুলও হতে পারে।'

'অনেক বিজ্ঞানীই যে তাঁর দাবিকে সমর্থন করেছেন। তাঁরাও আলাদা আলাদাভাবে গবেষণা করেছেন।'

'তাদের গবেষণাতেও কি এ সত্যতা ধরা পড়েছে?'

'হ্যাঁ, পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্গারেট ইভান্স জানান, "দশ বছরের কমবয়সী শিশুরা জীবের উৎপত্তির পেছনে বিবর্তনবাদ নয়; বরং সৃষ্ট হওয়াকে প্রাধান্য দেয়। যদিও তাদের মাতাপিতা কিংবা শিক্ষকেরা বিবর্তনবাদ সমর্থন করে।" ড. ডেবোরাহ্ কেলেমেন জানান, "শিশুরা প্রকৃতিকে পরিকল্পিত সৃষ্টি মনে করে।" ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির সাইকোলজির অধ্যাপক নাস্তিক ব্রুস হুড জানান, "অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাস জন্ম থেকেই আমাদের ব্রেইনে সেটাপ করা আছে।"'

ফারিসের কথা শুনে অর্ক নীরব হয়ে গেল। অবশ্যি অর্কের আজকের নীরবতা

অন্যদিনের মতো নয়। অন্যরকম। একেবারেই অন্যরকম। এ নীরবতার পেছনে রহস্য আছে।

কেউ কিছু না বলে চুপ হয়ে থাকাটা—আমার কাছে বিদঘুটে লাগে। তাই ফারিসকে বললাম, 'God Module-এর ব্যাপারটা তুই আর ক্লিয়ার করলি না। একদিন বলা শুরু করলি, পরে থেমে গেলি।'

ফারিস বলল, 'জাজাকাল্লাহ্ দোস্ত! অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে করেছিস।'

আমার কথা শুনে ফারিস যতটা না খুশি হলো, তারচেয়ে বেশি হলাম আমি। যাক! একটা ভালো কথা মনে করেছি। ফারিস বলল, *'দ্যা সানডে টাইমস*-এর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়—বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কে God Module নামে একটি জায়গা খুঁজে পেয়েছেন। God Module মানুষের বিশ্বাস স্থাপনের পেছনে [illegible]া রাখে। মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবের ওপর একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে—যখন আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের কথা বলা হয়, তখন কট্টর ধার্মিক মানুষের ব্রেইনে একধরনের উদ্দীপনা পাওয়া যায়। এই প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর, অক্সফোর্ডের বিশপ রিচার্ড হ্যারিস থেকে জানানো হয়—"স্রষ্টা যদি আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্মগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেন, তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই।"'

ফারিসের কথায় জাদু আছে। সময় যে কোনদিক দিয়ে কেটে গেল, বুঝতেই পারলাম না। দূর থেকে মাগরিবের আজান ভেসে আসছে। ফারিস কথা বন্ধ করে দিলো। আজান শেষ হলে আমি বললাম, 'কই, আমার সারপ্রাইজ কই?'

আজানের দোয়া পড়ে ফারিস বলল, 'দেবো ভাই, দেবো। আগে তো সালাত পড়ি!'

আমি বললাম, 'এখানে কীভাবে পড়বি?'

'এত কথা না বলে ওজু করে আয় তো।'

ফারিসের ওজু ছিল, তাই ও আর ওজু করল না। আমি নদী থেকে ওজু করে এলাম। ফারিস বলল, 'জুতা খোল। খালি পা—ঘাসের ওপর রাখ।'

আমি জুতা খুললাম। ঘাসের ওপর পা রাখলাম। ফারিস বলল, 'এবার ইকামত দে।'

আমি ইকামত দিলাম। ফারিস সালাত শুরু করল। খালি পায়ে ঘাসের ওপর সালাত। লোকজন অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার কাছেও একটু অবাক লাগল। পরক্ষণেই রাসূলের ﷺ হাদীসের কথা মনে হলো। রাসূল ﷺ বলেছেন, পৃথিবীর সমস্ত স্থান হলো মসজিদ।[৬২]

---

[৬২] ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং : ৭৫৩।

আমি সালাত শুরু করলাম। মাথার ওপর আকাশ, পায়ের নিচে সবুজ ঘাস। অনুভূতিটা কেমন, তা হয়তো বলে বোঝাতে পারব না। এ এক অন্যরকম অনুভূতি। একদিকে ঝিরি ঝিরি বাতাস, আরেকদিকে সবুজ ঘাসের কার্পেটে সালাত। ফারিসের মিষ্টি তিলাওয়াত পরিবেশটা আরও রোমাঞ্চকর করে তুলেছে।

আমরা কেবল প্রথম রাকাত শেষ করেছি, এমন সময় অর্ক এল। আমার পাশে দাঁড়াল। আল্লাহু আকবার বলে সালাত শুরু করল। ফারিস সূরা ফাতিহা শেষ করে, সূরা যুমার পড়ছে।[৬৩] ফারিস পড়ছে,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [٣٥] وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ [٤٥] وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ [٥٥] أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ [٦٥] أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [٧٥] أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ [٨٥] بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ [٩٥]

অর্কের চোখ বেয়ে পানি পড়ছে ও ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বার বার চোখ মুছছে। সালাতের মধ্যে মানুষ যে এতটা কাঁদতে পারে, তা সরাসরি কখনো দেখিনি। আজ অর্কের কাছ থেকে দেখলাম।

তথ্যসূত্র :

♦ ১) ফারিস যে আয়াতগুলো সালাতে পড়েছে, সেগুলোর অনুবাদ : "হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হোয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করো, তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে। অতঃপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না। অনুসরণ করো তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ হয়েছে তার। তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার পূর্বে। যাতে কাউকেও না বলতে হয়—হায়! আল্লাহর প্রতি

[৬৩] সূরা যুমার, (৩৯) : ৫৩-৬৯ আয়াত। আয়াতগুলোর অনুবাদ তথ্যসূত্রে দেওয়া আছে।

আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্যে আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অথবা কেহ না বলে, আল্লাহ্ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা! যদি একবার আমার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন ঘটত, তাহলে আমি সৎকর্মশীল হতাম। প্রকৃত ব্যাপার তো এই য, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যে বলেছিলে এবং অহংকার করেছিলে। আর তুমি তো অবিশ্বাসীদের একজন।" [সূরা যুমার, (৩৯) : ৫৩-৬৯ আয়াত]

♦ ২) সূরা ফুরকান, (২৫) : ১২-১৪ আয়াত।
♦ ৩) সূরা ফুরকান, (২৫) : ২৭-২৮ আয়াত।
♦ ৪) সূরা বাকারাহ, (০২) : ২১৯ আয়াত।
♦ ৫) সূরা নিসা, (০৪) : ৪৩ আয়াত।
♦ ৬) সূরা মায়িদাহ, (০৫) : ৯০-৯১ আয়াত।
♦ ৭) সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩৬ আয়াত।
♦ ৮) বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ ﷻ বলেন, "তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং স্বীকার করলাম।" [সূরা বাকারাহ, (০২) : ২৮৫ আয়াত]
♦ ৯) তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, *আস-সুনান*, হাদীস নং : ১৪৪১
♦ ১১) আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আস'আশ, *আস-সুনান*, হাদীস নং : ৪৩৮৫
♦ ১২) নাসাঈ, আমহমাদ ইবনু শুয়াইব, *আস-সুনান*, হাদীস নং : ১৯৬১
♦ ১৩) ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং : ৭৫৩
♦ ১৪) মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, হাদীস নং : ৬০২০।
♦ ১৫) ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস, *স্রষ্টা-ধর্ম-জীবন*; (সিয়ান পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ, জুলাই, ২০১৩)।
♦ ১৬) *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব*, অনুবাদ : মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ, ১৯৭৬)
♦ ১৭) ড. আব্দুল্লাহ আযযাম, *তাফসীর ফি যিলাল* : সূরাতিত তাওবাহ; (নানূতবী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০১২)।
♦ ১৮) Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt, *Fundamentals of Biochemistry;* (John & Sons company, New York, 2nd ed., 2006).
♦ ১৯) Edward Staunton, Wilbert, Howards, John, *Text book of Biochemistry;* (Oxford & IBH company, New Delhi, India).
♦ ২০) Sir Isaac Newton, *Principia;* (Eerdmands publication com., 2nd ed., 1958).
♦ ২১) Raymond Chang, *Chemistry*, (Mc Graw-Hill company, New York, 7th ed.).
♦ ২২) Stephen Hawkins, *A Brief History of Time;* (Bantam Press, London, 1988).
♦ ২৩) Mohan Mia, Sarwar Akram, Nazmul Haque, *Introduction to Genetics*; (Crescent publishing house, january, 2002).
♦ ২৪) Harun Yahya, *If Darwin Had Know About DNA;* (Global Publishing, Istanbul, Turkey, 2008)

♦ ২৫) MN Chatterjea, Rana Shinde, *Text Book of Medical Biochemistry,* (Jaypee Brothers, New Delhi, India, 2002).

♦ ২৬) Francis Crick, *Life Itself : Its Origin and Nature,* (Simon & Schuster, New York, 1982).

♦ ২৭) Phillip E. Johnson, *Defeating Darwinism by Opening Minds,* (Inter Varsity Press, Illionis, 1997).

♦ ২৮) Harun Yahya, *The Miracle of Creation DNA*; (Godword Books, New Delhi, India, 2002)

♦ ২৯) Paul Davis, *Superforce : The Search for a Grand Unified Theory of Nature*; (New York, 1984).

♦ ৩০) *Scientific Indications in the Holy Quran,* Written by bord of researchers; (Islamic Foundation, Dhaka, 3rd ed., 2012).

♦ ৩১) Sizing up the Cosmos: An Astronomers Quest; (New York Times).

♦ ৩২) Interview of Richard Dawkins,

♦ ৩৩) https://www.youtube.com/watch?v=Pckg3Kud8_A

♦ ৩৪) http://blogs.theage.com.au/thereligiouswrite/archives//2008 07/in_the_beginnin.html

♦ 35) http://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Childre n-are-born-believers-in-God-academic-claims.html

♦ ৩৬) https://www.theguardian.com/science/2009/jan/21/charles-darwin-evolution-species-tree-life

♦ ৩৭) https://www.newscientist.com/article/mg-20126921.600why-darwin-was-wrong-about-the-tree-of-life/

♦ ৩৮) http://www.theatlantic.com/magazine/archive/12/2005/is-god-an-accident/304425/

♦ ৩৯) http://www.dailymail.co.uk/news/article1211511-/Why-born-believe-God-Its-wired-brain-says-psychologist.html